1962

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

১৩৬৯

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ

সম্পাদক
শ্রীগৌতম চক্রবর্তী

আশ্বিন ১৩৬৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা

অধ্যাপক শ্রীঅমল ভট্টাচার্য (সভাপতি)
" শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
" শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীগৌতম চক্রবর্তী (সম্পাদক)
শ্রীমিহিররঞ্জন ভট্টাচার্য (অস্থায়ী সম্পাদক)
শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্মসচিব)

ছবির ব্লক তৈয়ারী করেছেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Published by Dr. Sanat Kumar Basu, Principal, Presidency College, 86/1 College Street, Calcutta-12 and Printed by him from Navana Printing Works Private Ltd., 47 Ganesh Chunder Avenue, Calcutta-13

সূ চী প ত্র

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	মালিনী বসু	১
"ম্যাগনিফিসেণ্ট অবসেসন"	মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়	২
প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোম্যাণ্টিকতা	অশোক মুখোপাধ্যায়	৬
তিনটি কবিতা	সৌরভ রায়	১০
এখনো বইছে হাওয়া	প্রবাল ঘোষ	১১
স্মৃতি	নারায়ণ দাস	১২
একটি বিবিক্ত চিন্তা	রণজিৎকুমার সেনগুপ্ত	১৩
বিদেশের চিঠি	বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪
লারা	উৎপলকুমার দে	১৯
গরুর গাড়ি	অধ্যাপক নির্মলকান্তি মজুমদার	২৬
কয়েকটি কবিতা	লেখা চট্টোপাধ্যায়	৩১
পঞ্চমাঙ্ক	তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	৩৩
পঁচিশে বৈশাখ ও আমরা	পূরবী মুখোপাধ্যায়	৩৬
হে অতীত, কথা কও	সব্যসাচী সেনগুপ্ত	৪০
মনে মনে	অনুরাধা বসু	৪৫
অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা	শ্রীপ্রদীপকুমার সেনশর্মা	৪৭
বিবেকানন্দ স্মরণে	অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র	৫৮
একটি নির্জন সন্ধ্যা	রূপেন্দু মজুমদার	৫৯
ঈপ্সা ও শীত	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০
কোনও এক নির্বাসিতের জন্য	সুমিত্র মিত্র	৬২
এসপ্ল্যানেড্	পিনাকী গুপ্তভায়া	৬৩
রোমন্থন	সুভাষরঞ্জন বসু	৬৪
চলার পথে	নন্দিতা রায়	৭০
চিরসাথী	বিষ্ণুপদ উকীল	৭৩
স্মিতা সরকার	মলয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	৭৫
আধুনিক বাংলা কবিতা একটি প্রশ্ন	রামেশ্বর শ'	৭৯
স্বপ্নের জগৎ বাস্তব হ'তে বহুদূরে	অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮৪
দুটি কবিতা	মানস রায়	৮৭
কলেজ প্রসঙ্গ	...	৯১

Editorial		1
On Writing	Sukla Ray	5
To Our Critics	Ranu Guha	6
The British Impact on India	Rakhal Chandra Nath	8
Writing History: A Revaluation	Chittabrata Palit	11

Chopin: The Lonely Pilgrim	Uma Roy	14
Thoughts from Abroad	Ashis Gupta	18
African Music	Douglas Kadenhe	21
A Bus Journey	Sajni Kripalani	23
Insomnic Nights	Mihir Ranjan Bhattacharya	25
On "The Ode to a Nightingale"	Meenakshi Mitra	28
A Mere Interlude ?	Indu Roy	30
"A Fool Looks at Relativity"	Kalyan Mukherjea	34
Rabindranath Tagore: Explorations	Samik Bandyopadhyaya	37
A Jest With Life	Anuranjan Singh	43
"Alpha, Beta, Gamma, Delta ...."	Syed Tanweer Murshed	48
The Scientific Attitude	Siddhartha Sen	52
Destination — "Base-Camp"	Arun Chakrabarti	54
To Solitude	Protima Mitter	57
Obituary		58
Results and Prizes		59

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা
ভাদ্র ১৩৬৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

মালিনী বসু
চতুর্থ বর্ষ, ইংরাজী

সত্য, পণ করেছিলাম শেষরাতের অনুতাপের ঘোরে
পাপ-পেয়ালা ছোঁব না আর। কিন্তু সেই শপথও ছিল না কি
আরেক নেশা ? সত্য, আজ গোলাপ থেকে নির্যাসিত ভোরে
মদির মন দরিদ্র সে প্রতিজ্ঞার রাখেনি কিছু বাকী।

*

সোনালী যত ফসল যারা পেল দু'হাত ভ'রে
এবং যারা ছুটতে গিয়ে বুনো হাওয়ার পিছে
হারাল সব—সমান আজ তারা ধুলার নীচে।
কবর খুঁড়ে তাদের খুঁজে পাবে, কে আশা করে ?

*

অভিশাপের পেয়ালা এই নৈশাপুর অথবা ব্যাবিলনে
সুধা অথবা বিষের নেশা যখনি পায়, বিষাদ আসে মনে—
রক্ত যেন মদের মত ক্ষরিত হয় ফোঁটার পরে ফোঁটা,
গাঢ়রঙের মুহূর্ত ও গোলাপ ঝরে ধুলায় ক্ষণে ক্ষণে।

*

আমরা যাকে স্বর্গ বলি, উপুড়করা এই পেয়ালাটিকে—
তলায় যার আর্ত সব কীটের মত আমরা চাপা থাকি,
তুলো না হাত কাতরভাবে অবশ সেই অক্ষমের দিকে,
তুলো না হাত—এ নিয়তির নেশার মোহে সেও গড়ায় না কি ?

*

লোকে বলে সত্য আর অনৃতের মধ্যে ব্যবধান
একটি চুলের মাত্র, একাক্ষর রহস্যের চাবি।
একটি চুলের মাত্র—তারপর সব পেয়ে যাবি—
একবার,—একবার যদি পেতে পারিস সন্ধান!

*

আজ তো তুমি তুমিই আছ—তথাপি নিষ্ফল!
আকাশ আর মৃত্তিকার বধির দুই দ্বার
খোলে না তবু তোমার ডাকে। কি হবে, অবিকার
ধুলা যেদিন করবে গ্রাস আর্ত কোলাহল?

(Fitzgerald-এর অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে পুনরনূদিত)

"ম্যাগনিফিসেণ্ট অবসেসন"

মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়
চতুর্থ বর্ষ, অর্থনীতি

ইডা লুপিনোর ওপর আমি বিলক্ষণ চটে গিয়েছি। ইডা, সেই হলিউডের নামকরা চিত্রাভিনেত্রী হঠাৎ রূপালী পর্দা থেকে নেমে এসেছেন সাহিত্যের জমিতে। লিখেছেন এক প্রবন্ধ যার নাম দিয়েছেন : 'পুরুষরা কি মানুষ?' তাঁর বক্তব্য অতি সরল : পুরুষরা মোটেই মানুষ নয়। তারা আধা-দেবতা আর অতি উচ্চ শ্রেণীর জীব। তাই মেয়েরা এদের এ্যানালিসিস করতে পারে না। অর্থাৎ প্রায় সুপারম্যান বললেই চলে।

নিবন্ধটি লেখবার সময় ভদ্রমহিলার একটা কথা খেয়াল হয়নি। সেটা হল, যাদের নিয়ে লিখছেন তাদের কিরকম ধারণা যিনি লিখছেন তাঁর স্বজাতির সম্বন্ধে।

আমি কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স কষতে বসব না। সাবজেক্টিভ আইডিয়ালিজ্‌মের ভক্ত আমি মৃণালকান্তি, 'আমার চেতনার রঙে' যখন পান্না সবুজ চুনী রাঙা হতে পারে বলে বিশ্বাস করি, তখন সেই রঙে সমস্ত পুরুষজাতির প্রতিনিধিত্ব করতে বাধা কোথায়? সেজন্য যদি আমাকে কেউ 'ধৃষ্টশ্রী ১৯৬২' উপাধি ভূষিত করে সে ভি আচ্ছা! কাজেই সমগ্র পুরুষজাতির প্রতিভূস্বরূপ আমি ধৃষ্টশ্রী মৃণালকান্তি ১৯৬২ বিনা বাধায় বলতে পারি যে মেয়েরাই মানুষ নয়। তার কারণ মানুষ হতেই পারে না পুরুষদের মতে।

"ইউ আর মাই ম্যাগনিফিসেণ্ট অবসেসন"—একটি জনপ্রিয় বিলিতি গানের কলি। সঠিক বলতে গেলে একটু ঘুরিয়ে বলা উচিত 'ইন্‌কম্প্রিহেন্‌সিব্‌ল্‌ অবসেসন'। বিধাতার পেজোমির জন্যে এই মেয়েরা মশাই আমাদের সামগ্রিক বস্তুধারণাকে ব্যাপিত করে আছে, অথচ কি আশ্চর্য, এখনো কাণ্টের ভাষায় আননোওন, আননোওয়েবল্‌। এদের জন্যে আমরা ট্রয় পুড়িয়েছি, সাগর বেঁধেছি স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস করতে, এদের জন্যেই আমরা নিষিদ্ধ ফল খাবার ফল ভোগ করছি। তবু কোনো ফায়দা নেই। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার যে এতৎ-সত্ত্বেও এগুলো করাকে আমরা পুরোদস্তুর ক্রেডিট বলে মনে করে আসছি, এবং আসবও বলাই বাহুল্য।

সেইখানেই তো আসল ঝামেলার ব্যাপার।

একটি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় ব্ল্যাঙ্ক পেপার দিয়ে চলে আসবার আগে খাতার প্রথম পাতায় বড় বড় করে লিখে দিয়ে এসেছিল : "দুর্গা রে! তোর জন্যেই ডুবলাম!"

আমি পরীক্ষক হলে ওকে ফুল মার্ক দিতাম। এতবড় ফিলসফি এর আগে কেউ কখনো লিখেছে পরীক্ষায়? এটাকে সমগ্র পুরুষজাতির ন্যাশনাল এ্যান্থেম করে ফেললে কেমন হয়? তা নিয়ে গোটা কয়েক গবেষণা কমিটি নিয়োগ করা উচিত।

সবচেয়ে ঝামেলার কাণ্ড হচ্ছে এইটাই। এই দুর্গাদের জন্য আমরা বেফায়দা ডুবছি, ডুবেছি, আবার বীরদর্পে ডুবব ভবিষ্যতে। 'টুকরো করে কাছি।' এবং এই বেফায়দা লিপিং ইন দি ডার্ক-ই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে মেয়েরা মানুষ হতে পারে না। কিছুতে পারে না। মানুষের জন্য মানুষে কখনো এরকমটা করে? রামচন্দ্র! আপনি আমার জন্য করবেন? আমি আপনার জন্য? আরে আমরা ত দূরের কথা, এমনকি নেহরুর জন্যেও কেউ এমন ডুবতে চাইবে না এ আমি বলে রাখলাম, সে আপনি রাগই করুন আর যা-ই করুন।

তার কারণ আমরা মানুষ তো। মানুষে মানুষের জন্য এমন কাণ্ড কদাপি করে না। সত্যি করে না।

যাযাবরের চারুদত্ত আধারকার কান্নাকাটি করেছে যে মেয়েরা কোনদিন ছেলেদের ভালোবেসে কোন ত্যাগ স্বীকার করেনি, আসৃষ্টি বর্তমান পর্যন্ত ছেলেরাই খালি যাকে বলে স্যাক্রিফাইস করে চলেছে মেয়েদের জন্য। এতো অতি সোজা এবং সরল কথা। টাইগার হিলের সূর্যোদয় দেখতে, উত্তর মেরুতে অরোরা দেখতে বা তাজের গায়ে চাঁদের আলো দেখতে মানুষকে যথেষ্ট খাটা-খাটনি করতে হয়, তা বলে টাইগার হিল বা অরোরা বা তাজও আমাদের জন্য পরিশ্রম করবে,—যাঃ, এরকম ভাবাটাই অন্যায়। এই অপার্থিব জীব বা অজীবদের জন্য তাই আমাদের অসাধ্য সাধন। আমাদের প্রতিভার বিকাশ। আমাদের বীরত্ব। সর্বোপরি আমাদের শিভ্যালরি যার দিন কোনমতেই গত হবার নয়। বার্ক যাই বলুন না কেন।

শিভ্যালরি জিনিসটার মূলে এই ইনহিউম্যান জীবদের জন্য কিছু একটা করবার

বাসনা। এ বাসনাটা প্রিমিটিভ। প্রিমিটিভ তার সাক্ষ্য এই দুর্গাদের জন্য আমরা একদিন নিষিদ্ধ ফল পর্যন্ত খাবার স্পর্ধা করেছি। এভারেস্টের চুড়ো, যে স্থানটা মানুষের দুরধিগম্য, সেখানে যেতে পুরুষদের প্রচণ্ড বাসনা। সেটাও, জানবেন, একরকমের শিভ্যালরি। অথবা এর বিপরীতভাবে বললে, শিভ্যালরি এমনিই একটা প্রচণ্ড বাসনা। আইভ্যান হো বেচারা তো মরতে মরতেই বেঁচে গেল শিভ্যালরি দেখাবার চেষ্টায়, যেমন অনেক অভিযাত্রীদল হিমালয়ের কোলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওই এভারেস্ট শৃঙ্গের কাছে শিভ্যালরি দেখাতে গিয়ে। এভারেস্টের চুড়োটা যদি হত সজীব, আর আরূঢ় তেনজিং নোরগেকে কটাক্ষে কালিদাসের কালের আমেজ এনে একটা সহাস্য নড করতে পারত, তার ফলে যে অনির্বচনীয় আনন্দ হত তেনজিং-এর মনে, সমগ্র দেশের সব পুরুষেরা এই অপার্থিব জীবদের কাছে শিভ্যালরির প্রত্যুত্তরে ঠিক এমনি একটা মাত্র নডের প্রত্যাশা করে এসেছে তেমনি আনন্দলাভের আশায়।

কিন্তু প্রত্যাশা এক কথা আর সেটা সফল হওয়া আর। শিভ্যালরি বা আর যা কিছু, তার সব সময় যোগ্য প্রতিদান আপনি প্রত্যাশা করতে পারেন না। নড পেতেও পারেন আবার নাও পেতে পারেন। যিনি পেলেন তিনি ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষায় 'কদরদান মেহেরবান জোলাজুলুল্লা হায়, দুনিয়া কা পর্দাদার হ্যায়।' আর যিনি পেলেন না তিনি জুলিয়েটের মত 'পাস্ট হোপ, পাস্ট কিওর, পাস্ট হেল্‌প্‌।' এই অপার্থিব জীবদের কাছে প্রাণকে পণ করতে পারো, কিন্তু বি কেয়ারফুল : মা ফলেষু! বঙ্কিম বোকার মত বলেছেন, 'হায় রমণীর রূপলাবণ্য, ইহসংসারে তোমাকেই ধিক।' কোনো মানে হয়! এভারেস্টে উঠতে না পেরে জাপানী অভিযাত্রীদল যদি বলে বসত, 'হায় এভারেস্টের শৃঙ্গলাবণ্য, ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্' তবে আর সবাই কি বলত?

আসল কথা, ফ্রয়েড যা-ই বলুন, পুরুষরা আজীবন সৌন্দর্যের পূজারী। এরা বরবোদুর, কম্বোজ, মিশর, ব্যাবিলনে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে আর, সবটা নয়, অর্ধেক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে এই অপার্থিব জীবদের মাঝে, যাদের নাম নারী। শতকরা ৯৫ জন পুরুষের মনে আছে একটা বনলতা সেনের বাসনা। তার অর্ধেকটা প্রকৃতিদত্ত অপর অর্ধেকটা পুরুষদের সৃষ্টি। বনলতা সেন কি আর রেডিমেড কিনতে পাওয়া যায়! যায় না, কারণ ও জিনিসটা পুরো মানুষ নয়। মেয়েদের মধ্যে যে বিশ্ববিখ্যাত কোনো চিত্রশিল্পী বা কবি নেই এইটা তার একটা মূল কারণ। মেয়েরা আবার কবিতা লিখবে কি, মেয়েদের দিয়েই ত কবিতা লেখা হয়। টাইগার হিলের সূর্যোদয় কি জানে তাকে কেন এত সুন্দর দেখতে? তার কি বাসনা আছে অমনি সৌন্দর্য সৃষ্টি করার? হতেই পারে না। বনলতা সেন যে কেন বনলতা সেন তা বনলতা সেন জানতে পারেন না, জানেন জীবনানন্দ দাশ।

আমরা তা জেনেও রেখেছি। জেনে রেখেছি যে কোনকালে কেউ কখনো 'বনস্পতি সেন' নামে কোনো কবিতা দেখবে না। দেখবার আশা করবে না। আমরাই বনলতা

সেন লিখব। বিচিত্ররূপিণী লিখব। লিখব কঙ্কাবতী, শেষ আরতি। যাঁদের জন্য লিখব তারা যদি মানুষ হতেন তবে ত পড়তেন, এ্যাপ্রিসিয়েট করতেন, উপলব্ধি করতেন আমাদের অবস্থা। এই অতীন্দ্রিয় জীবেরা কিন্তু নির্বিকার। তাজমহলের মত, অরোরার মত, শুকতারা, মাধবী পূর্ণিমার মত, 'কুন্দাবদাতা কলহংসমালা'র মত, এঁরা যেন জেনে বসে আছেন যে এঁদের দিয়েও শতলক্ষ কাব্যগাথা রচিত হবে। এটা যেন মৌলিক অধিকার। এরকম একটা জীবকে, বলুন ত, মানুষ বলে কখনো অপমান করা যায়?

মানুষ নয় বলেই এরা আমাদের ম্যাগনিফিসেণ্ট অবসেসন। সাবজেক্টিভ আইডিয়া-লিজ্‌মের চরম ফলশ্রুতি। এই সৌন্দর্যকল্প জীবদের তাই সর্বত্র প্রাধান্য, সর্বত্র অগ্রাধিকার। লেডিস্ ফার্স্ট আর লেডিস সীট ত আছেই, অপরদিকে পুলিশের ব্যাটনের গুঁতোয় ধরাশায়ী হলেও আমাদের কেউ পাত্তা দেয় না, আর 'নারীর উপর পুলিসী অত্যাচার' দেখলেই হুলস্থূল পড়ে যায়। গাড়ি চাপা দিয়ে নিস্তার পেয়েছে কোন ড্রাইভার এ তো অসম্ভব, কিন্তু একটি মহিলা ড্রাইভ করে দুজন লোককে হাফ ডেড করে ফেলে এমনই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে তাঁকেই পথচারীরা শুশ্রূষা করছে এ ত আমি নিজে দেখেছি। এদের সব কিছুই ক্ষমার্হ, সব কিছুই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য আর আলোচিতব্য। এদের গমনভঙ্গিমা শুধু আমরা দেখি না, কবিরা সালঙ্কারে তার ব্যাখ্যা করেন, এদের চুড়ির শব্দ, এমনকি শাড়ির খসখস বৈয়াকরণিকের ঘর্মোদ্গম করে সুষ্ঠু বর্ণনার তাগিদে।

কিন্তু বলেছি তো সব বেফায়দা। তবু আমরা কদাপি চটে যাই না। ক্ষুণ্ণ হই না কদাচন। হব কেন। যদি মানুষ হত, তবে দু ঘা দিতাম তিন ঘা খেতাম বদলে। কিন্তু এরা তো এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যকল্প জীব। বিদ্যুৎ চমকালো না বলে তো তার ওপর রাগ করা যায় না।

তাই এই দুর্গাদের জন্য আমরা 'টুকরো করে কাছি' আজন্মকাল 'ডুবতে রাজী আছি।' আলাপ করা সিনেমা দেখা থেকে আরম্ভ করে সাত পাক ঘোরা অবধি সর্বত্রই আমাদেরই ইনিশিয়েটিভ নিতে হয়। আর তার জন্যে কী ঝামেলা পোয়াতে হয় সে তো গল্পে, কবিতায় এবং কঠিন বাস্তবে হরদম দেখা যাচ্ছে। তবু আমরা সকলেই, এমনকি আমরা যারা প্রচণ্ড নীতিবাগীশ তারা পর্যন্ত, এই সৌন্দর্যকল্প জীবদের দ্বারা ম্যাগনিফিসেণ্টলি অবসেস্‌ড্ হয়ে বসে আছি। আসৃষ্টি বর্তমান কাল পর্যন্ত। আমরা থাকতেই চাই। আমরা থাকবও।

এবং আমাদের এই আদি কিন্তু অনন্ত প্রচেষ্টাই কি অমোঘ যুক্তি নয় এটা প্রমাণ করতে যে মেয়েরা কিছুতেই মানুষ হতে পারে না, অন্ততঃ পুরুষদের মতে? আমরা ঠকেছি, আমরা হেরেছি, আমরা বিফল হয়েছি, তবু আমাদের প্রচেষ্টার বিরাম নেই যার আরম্ভ হয়েছে সেই আদমের চরম দুঃসাহস থেকে। কৈশোরাতিক্রম এবং বিনাশ এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী জীবনকাল, আমাদের প্রেসিডেন্সিতে পড়া আর আই. এ. এস. দেওয়া, বা আর

যা কিছু সমস্ত এই সৌন্দর্যকল্প জীবদের কেন্দ্র করে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সের মত ঘুরছে। আর ঘুরছে। আর ঘুরছে।

তাই এদের মানুষ বলবেন না। বলুন প্রডিজি। এদের এই প্রডিজিত্বই এদের সৌন্দর্যকল্প জীবে পরিণত করেছে। আর তাই সমস্ত পুরুষজাতির কাছে এরা কদাপি মানুষ নয়। এরা ম্যাগনিফিসেণ্ট অবসেসন পার্সোনিফায়েড।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোম্যাণ্টিকতা

অশোক মুখোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ, ইংরাজী

সাম্প্রতিক সমালোচনার আসরে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে সৎ আগ্রহের অভাব উল্লেখনীয়। গত প্রায় চার দশক ধরে বাংলা কবিতার আন্দোলনে এই কবির প্রভাব সতত ক্রিয়াশীল; নিরলস ও নিয়ত সাধনায় এবং, যদিচ অনর্গল নয়, তথাপি দীপ্তিময় সিদ্ধিতে ইনি স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের সুতীব্র সম্মোহনে আচ্ছন্ন বাংলা কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং তাঁর সমসাময়িকেরা প্রথম সচেতনভাবে বন্ধনমুক্তির এবং অন্য দিগন্ত অন্বেষার সুর আনলেন। বাংলা কবিতার পালা-বদলের ইতিহাস এঁদের স্বীকৃতি জানাবে নিঃসংশয়ে। কিন্তু ইতিহাসের মূল্যায়নের মতই যা তাৎপর্যপূর্ণ, সেই যুগ-রুচির ওপরে এঁদের প্রভাব, উপস্থিতি, এঁদের সম্পর্কে পাঠক-সমাজের সচেতনতা এবং সহানুভূতি, তার প্রকাশে সমালোচকের দায়িত্ব অশেষ। এবং এ কথায় বাঙ্গালী কাব্য-পাঠকের ন্যায্য এবং প্রত্যাশিত আক্ষেপই প্রকাশিত হবে যে সাম্প্রতিক সমালোচনা এই দায়িত্ব পালনে অতৎপর।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত কবি-চেতনা উত্তরকালের কাব্য-সৃষ্টিতে অসামান্যরূপে প্রভাবশীল। কম-বেশী সমস্ত আধুনিক কবি তাঁদের কবিতার শরীর-রচনায়, বুদ্ধিগত ভাবনায়, শব্দ-চয়নে, ছন্দে এবং সুরে তাঁর কাছে ঋণী। কিন্তু যে নিটোল প্রসন্নতা, জীবনের সৌন্দর্য সম্পর্কে যে দীপ্ত সচেতনতা, মানবতার যে সুগভীর সাবেগ প্রত্যয় এবং যে নিবিড় রোম্যাণ্টিকতা রবীন্দ্র-কাব্যের অনন্য মেজাজ তৈরীতে তাৎপর্যময় ভূমিকা নিয়েছে, তাঁর কনিষ্ঠ কবি-সমাজে এই সমস্ত গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ উত্তর-সাধক প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোম্যাণ্টিকতার বিশ্লেষণ তাঁর সমগ্র কাব্য-সৃষ্টিরই চরিত্র ব্যাখায় ব্যাপক সাহায্য করে। পরিসরের স্বল্পতা যেহেতু তাঁর সৃষ্টির সম্পূর্ণ তাৎপর্য বিচারের প্রতিকূল, এবং যেহেতু কোন জীবিত এবং

সক্রিয় কবি-শক্তির চূড়ান্ত কোন মূল্যায়ন সম্ভব নয়, সেহেতু তাঁর কবি-চরিত্রের মৌল বিশিষ্টতায় আমরা এই আলোচনাকে কেন্দ্রায়িত করতে চাই। রোম্যান্টিকতাকে বৃত্তে রেখেই, তাই, তাঁর কাব্য-বলয়ের এই পরিধি-চারণা।

অপরিহার্য ভাবে রোম্যান্টিকতার স্বরূপ এবং লক্ষণ নির্দেশ নিয়ে এখানে প্রশ্ন উঠবে, এবং এ প্রসঙ্গে তত্ত্ব-আলোচনার চোরাবালিতে পা না দেওয়াই শ্রেয়। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে অপার সুস্থ বিস্ময় এবং কৌতূহল রোম্যান্টিকতার উৎসমূল। কবি-কল্পনার দূরবীক্ষণে প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যের অন্তরালে বৃহত্তর এবং স্থায়ীতর সত্যের আবিষ্কারে রোম্যান্টিকতার পরিণতি। অসংখ্য দেশী এবং বিদেশী মনীষী কবি সাহিত্যিক সমালোচকের এ প্রসঙ্গে অগণ্য মন্তব্য এবং চিন্তার জটিল জট খোলার চেষ্টা না করেও বোধ হয় উপরিউক্ত সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় আসা যায়।

এ কথা বোধ হয় আবার বিস্তৃত করে না বললেও চলবে যে রোম্যান্টিকতা বাস্তব-বিমুখ নয়। যুগের এবং জীবনের যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে, প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের সব রক্তক্ষয়ী টানা-পোড়েনের হাত ছাড়িয়ে, স্মৃতি, অন্ধকার, গোলাপ, প্রেম ইত্যাদি ধূসর সান্ত্বনার হাত ধরে পালানো নিশ্চয়ই রোম্যান্টিকতার বিপরীত কোটির ব্যাপার। শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিকতা সব সময়েই বাস্তবের উৎসমুখ থেকে শুরু করে তার মহত্তর সত্যের অন্বেষা। তাই একটা কোকিল, কিছু ডেইজি ফুলের হলুদ বিস্তার, কোন ধান-কাটা মেয়ের নির্জন একাকিত্বের বেদনা—ওঅর্ডসওঅর্থের মহৎ রসদৃষ্টির ছোঁওয়ায় এক অমলিন মহিমা পায়। তাই রবীন্দ্রনাথের 'অসীম' বারে বারেই সীমার বাঁধনকে স্বীকার করেও তাকে অতিক্রমের আকুল আন্তরিকতায় চিরকালীন কাব্যের সম্পদ হয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রও এই মহৎ অর্থেই রোম্যান্টিক। এই শতাব্দীর অন্ধকার এবং সংশয়, বিভ্রান্তি, নেতি, আদর্শচ্যুতি এবং অনৈতিকতা, সমাজ-জীবনের দ্রুত রূপান্তর, ব্যক্তি-চেতনায় তার তীব্র উপলব্ধি, প্রাথমিক মূল্যবোধের বিপর্যয়—এ সমস্তের সঙ্গেই তিনি গভীরভাবে পরিচিত। তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতি, ব্যাপক অভিজ্ঞতা, স্থির এবং অটল বস্তুতান্ত্রিক জীবন-বীক্ষা এবং অনন্য বিশ্লেষণধর্মিতা তাঁর ছোটগল্পগুলিকে অবিস্মরণীয় করেছে। তাঁর অসংখ্য কবিতাতেও এই সময়-চেতনা উপস্থিত। মানুষের মনের আলো-আঁধারের খেলা কি ভয়ঙ্কর, প্রাণের জৈব ক্ষুধা কি দুরন্ত, মৃত্যু কি অসহনীয় তীব্র—তাঁর কবিতার পটে তিনি এসব বিধৃত করতে কখনও শিথিল নন।

কিন্তু যে আশ্চর্য উচ্চারণ, যে গভীর প্রত্যয়, যে অতন্দ্র মানবিকতা তাঁকে রোম্যান্টিক করেছে তা উত্তরণধর্মী। প্রথম তারুণ্যের আবেগে যখন তিনি বলে ওঠেন—

'আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।' (হঠাৎ যদি)

তখন বোঝা যায় জীবনের সুগভীর দায়িত্ব এই রোম্যান্টিক কিশোর সত্তায় এখনও থাবা

বসায়নি। শিশুর মত তাই সে উচ্ছ্বসিত, চিন্তাহীন, অকপট। ক্রমশঃ কালের রেখা পড়ে কবিতার ললাটে। কবি সচেতন হতে শুরু করেন পরিবেশ সম্পর্কে,—তাঁর জীবন-বোধ পরিবর্তিত হয়। তবু এই প্রাথমিক রোম্যান্টিকতা কখনও বিভ্রম এবং সংশয়ের অতলান্ত নেতিতে হারিয়ে যায় না। অবক্ষয়-চেতনা, অসহায়তাবোধ, আদর্শের মৃত্যু যখন প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমসাময়িকদের কবিতায় অভ্রান্ত নখর রাখছে, তখনও কি এক আশ্চর্য জাদুতে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিশ্বাসী, সাহসী, জীবন-নিবিষ্ট। যখন শ্বাসরোধকারী বাস্তবের বৃত্ত থেকে মুক্তির আকুলতা কবিতার প্রধান উপজীব্য, তখন এই বিশ্বাসী কবি-তরুণ আবার ফিরে আসার স্বপ্ন দেখেন এই সংগ্রামী প্রাত্যহিকতায় :

'ফের যদি ফিরে আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে,
বুকে আরো প্রেম যেন আনি,
পৃথিবীকে আরো যেন ভাল লাগে।' (যদি ফিরে আসি)

এই রোম্যান্টিক আশাবাদিতা এবং জীবন সম্পর্কে এই সুগভীর মমত্ববোধ প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন-বোধকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে। কখনও কখনও তিনি নজরুলী কায়দায় গণ-জীবনকে কাব্য-নেতৃত্ব দেওয়ার সংকল্প নিয়েছেন। কখনও বা 'যন্ত্রের জটিল পথে বিকলাঙ্গ জীবনের শুধু ব্যঙ্গ-সমারোহই' তাঁকেও পীড়িত করেছে। কখনও বা 'জীবন-শিয়রে বসি যে স্বপ্ন-সুন্দরী' দোলা দেয় তাঁকেই দিয়েছেন কবিতার অর্ঘ্য। তবু তাঁর মৌল জীবন-নিষ্ঠা প্রায় সতত এবং অন্তহীনভাবে প্রোজ্জ্বল। নগর-জীবনের কোলাহলে যে প্রেমিকের সত্তা অসাড়, ভীত, যে প্রেমিকাকে আকুল আর্তি জানায় 'ছাদে যেওনাকো', সেই প্রেমিকই আবার উজ্জীবিত বিশ্বাসের কোন গাঢ় মুহূর্তে বলে,

'তোমার নয়ন হতে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায় ;

মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়।' (নীল দিন)

তাঁর এই রোম্যান্টিকতা সম্পূর্ণ হয় যখন দূরান্তের ডাক এসে পৌঁছয় তাঁর কবিতায়। 'সুদূরের আহ্বানে' সাড়া দেন কবি।

'উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর।' (ভৌগোলিক)

তাঁকে 'শুধু গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া তরণীর', শুধু 'পরিতৃপ্ত জীবনের ধনবোদ্ দিয়ে' তিনি ফেরাতে চান না। তাই তাঁর জন্মভূমির 'আরো এক মৃত্যুদীপ্ত মানে' খোঁজেন। তাই তপতী কুমারী মরু আর অজানা নদীর উৎসের ডাকে তিনি বার বার বিবাগী হতে চান।

উনিশ শতকীয় ইংল্যাণ্ডের রোম্যান্টিক আন্দোলনের প্রভাব যদি এই দূরান্তের আহ্বানে সাড়া দেওয়ায় কেউ লক্ষ্য করেন, যদি তাঁর অচল আশাবাদিতায় কেউ ব্রাউনিঙ্‌কে উপস্থিত মনে করেন, তবে হয়ত 'নীলকণ্ঠ' প্রমুখ কবিতায় যন্ত্র-সভ্যতার ক্লিন্ন সর্বগ্রাসিতার বিরুদ্ধে তাঁর দৃপ্ত বেদনায় কেউ কেউ লরেন্সীয় জীবনবাদ খুঁজে পাবেন। কিন্তু বিভিন্ন যুগের এই সমস্ত সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাব যদি প্রেমেন্দ্র মিত্রে থেকে থাকে তবে তো এই কথাই প্রমাণ হয় যে, তিনি জীবন এবং সাহিত্য-ঐতিহ্য বিশ্লিষ্ট নন। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বকীয়তা, যা যে কোন বড় কবিরই বৈশিষ্ট্য হতে বাধ্য, এই প্রভাবের সাঙ্গীকরণে। তাই বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের মহত্তম ঐতিহ্যের মিছিলে শরীক হয়েও রোমান্টিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আলাদা ক'রে চেনা যায়।

দীর্ঘস্থায়ী এবং এখনও নিয়ত-সৃষ্টিশীল তাঁর কবি-জীবনে প্রেমেন্দ্র মিত্র বহুধা-বিস্তৃত জীবনকেই তাঁর কাব্যের বিষয় করেছেন। বিভিন্ন সুরে, মেজাজে, আঙ্গিকে, তিনি জীবনকে কবিতার বৃন্তে বিধৃত করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্য-বৃন্তের পরিধিতে রোম্যান্টিকতার স্নিগ্ধ আলোক-বলয় নিরন্তর উজ্জ্বল। আজও তিনি 'পরমা যন্ত্রণা'কে তাঁর প্রাণেশ্বরী ক'রে কেশবতী কন্যার খোঁজে কাগজের নৌকো ভাসান—কবিতার নৌকো। যদিও কখনও কখনও মনে হয়—

'কেশবতী কেউ নেই, নেই কোন কাকচক্ষু নদী,
জলে যার সারাক্ষণ শুধু এক স্থির ছায়া কাঁপে।
কবে পাহাড়ের ঢল সব নদী ক'রে গেছে ঘোলা,
মেঘের মতন চুল কবে শাদা শন হয়ে গেছে।' (কাগজের নৌকো)

তবু তাঁর দীপ্ত অন্বেষা আজও ক্ষান্তিহীন :

'তবু কাগজের নৌকো আজো ভাসে নালায় ডোবায়,
নর্দমাতে ডুবী হয়ে ঝাঁঝরিতে বাড়ায় জঞ্জাল।
শুধু তার দুঃসাহস কিছুতেই মানবে না'ক হার।
সে জানে এ বর্তমানই দুঃস্বপ্নের মিথ্যা রূপকথা।' (কাগজের নৌকো)

যে পলাতক পরাজিত সৈনিক রোম্যান্টিকতার দুর্গে আশ্রয় নিয়ে পৃথিবীর দিকে পিঠ ফেরায় তাকে শ্রদ্ধা করা অসম্ভব। কিন্তু জীবনের সব দেনা, অন্ধকারের সব ঋণ, যন্ত্রণার সব পাওনা শোধ করেও যে কবির হাতে আলোর, মানবতার, বিশ্বাসের অসামান্য উদ্বৃত্ত তাঁর রোম্যান্টিকতাকে সম্মান না জানালে আমরা সার্থকভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণাকেই অস্বীকার করব।

তিনটি কবিতা

সৌরভ রায়

প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়

অভিনয়

মিথ্যা অভিনয়টা থাক্ পড়ে
অবহেলার তুচ্ছ আঁস্তাকুড়ে ;
ক্ষণটুকু তার হয়েছে আজি শেষ,
জীর্ণ আবর্জনার ভগ্ন অবশেষ।
হারানো-মায়া, অর্থশূন্য—
জীবনপথে অতি নগণ্য।
তবু যে সেথা সত্য বাজে জানি
রেশটুকু তার আজিও চিত্তে শুনি
হৃদয়ে আজি বাজিছে মধুর রাগে
মিথ্যা যে তাই সত্য হয়ে জাগে।

খেয়ালী

আমি একটা পাগল খেয়ালী।
ভালটাকে দিই গালাগালি
ভুলটাকে তার দেখি খালি—
কেবল তাকে বেশী করে ভালবাসার জন্য।

আমি একটা পাগল সন্ধানী।
মন্দটাকে কাছে টানি,
খুঁজে দেখি ভাল কতখানি—
শুধু ভালবাসার পথটাকে তৈরী করার জন্য।

প্রত্যাশী

আমি তাকে চিনি!
অবহেলার চরম আঘাত

সইতে পারে নি,
নেমে গেছে তাই অনেক নীচে পঙ্কিলে।

তবু তাকে জানি!
ভালবাসার চরম আঘাতখানি
ফিরিয়ে দিতে পারবে না সে অবহেলে॥

এখনো বইছে হাওয়া

প্রবাল ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

তারচেয়ে ভাল এই সবুজ মেঘের মত বন
পুলকে আকুল এই পাইন ও দেওদার শাখা।
জনতার লোনা স্বাদ (সমুদ্রের লোনা ঢেউ শুধু),
এখানে তাকিয়ে ছাখো, আকাশে খুশির চাঁদ বাঁকা।

কী প্রশান্ত নির্বিশেষ আকাশের চন্দ্রাতপ নীল
পায়রামেঘের দল, বুঝি পিনাকীর পুঞ্জহাসি
শহরে মৃত্যুই শুধু (বিকৃতের সুন্দর ছলনা),
এখানে শালের বনে শোনো,—আনন্দের পুলকিত বাঁশি।

বিস্তীর্ণ মাঠের গান, উচ্ছল হলুদ প্রজাপতি,
ভালো এই, রোদ্দুরের হাসিমাখা মরশুমী ফুল।
প্রাসাদে সূর্যের আলো মৃত্যুরই ছায়াতে পাণ্ডুর
এখানে সবুজ মন প্রদোষের সৌরভে আকুল।

উদ্দাম প্রাণের সুর, চেতনার আদিম আস্বাদে,
এখনো বইছে হাওয়া জীবনের স্বচ্ছ অতিবাদে।

স্মৃতি

নারায়ণ দাস

তৃতীয় বর্ষ, রসায়ন

ভুলিতে না পারি সেই মুখখানি
বিদায় দিয়েছি যারে,
দুখের সিন্ধু উথলিছে মোর
অন্তরে বারে বারে।
মনে মনে জ্বলি অহরহ আমি
পারি না ভুলিতে তাহারে,
দীপ-নেভা আলো জ্বলিবে না কভু
আমার জীবন আঁধারে।

ফুটিবে না ফুল আমার কাননে
এ জীবনে কভু আর,
গানের পাপিয়া ফিরিবে কাঁদিয়া
বিফল জনম তার।
সুরের মূর্ছনায় তোমারে ডাকিয়া
কাঁদিয়া কাটাব রাত,
তোমারে ভাবিয়া তোমারে ধ্যানিয়া
করিব জীবন পাত।

জাগর স্বপনে আঁখির মাঝারে
কেন তুমি আস বল,
আমার পরানে এমন করিয়া
হুতাশন কেন জ্বাল॥

একটি বিবিক্ত চিন্তা

রণজিৎকুমার সেনগুপ্ত

দ্বিতীয় বর্ষ, ইতিহাস

গাঢ় ছায়া নেমে এলো 'হাসরাঙা' নদীটির জলে,
পশ্চিমের পলাতক আলো,
উধাও হল উদাসী বায়ুর রথে,
রাত্রির জোয়ারে নিঃশেষিত হৈমন্তিক দিন
ম্লান চেতনায় আনে শ্রান্তির আবেশ
নিশাক্রান্ত বলাকা বুঝি ফিরে গেছে একা
দিনান্তের শ্রান্ত অবসরে,
অদেখা নদীটি দূরে রিমিঝিমি সুরে
গেয়ে চলে চিরন্তন বিষাদের গান ;
পরিতৃপ্ত প্রেমাবেশে ডানা মেলে রাত্রিচর পাখি :
তাদের অনুলাপে নৈঃশব্দ্য অস্থির,
শমশমে হাওয়া, মর্মরিত ঝাউবন
ছেড়ে ফেলে দিনান্তের বিশীর্ণ নির্মোক।
বিশ্রান্ত জোনাকির ঝিকিমিকি আলো
আকাশ-দর্পণে খুঁজে পেল তারই প্রতিরূপ।

উদাসী সময়ের স্রোত, মাটিতে নিলীন আঁধার,
রাত্রির শীর্ণ সম্মোহে
পেয়েছে সে খুঁজে
আয়াসবিহীন, মুক্তি-অঙ্গীকার।

বিদেশের চিঠি

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ বর্ষ, অর্থনীতি

"……চিঠি জিনিসটা স্বভাবতঃই দ্বিবচনের ব্যাপার। তাকে বহুবচনের ব্যবহারে আনলে ব্যাকরণদুষ্টি ঘটে। চিঠি চাঁদনী রাতে দুটিমাত্র প্রাণীর গঙ্গাবিহরণের ছোট্ট পানসিটি। কুসুমগঞ্জের হাটের পথে বহুজনের নদী পারাপারের জন্য পাঁচমাল্লার খেয়া নৌকো নয়। ……

"পত্রগুলি যাকে লেখা, তার করযুগলের মধ্যে কৈবল্য লাভ করলেই তাদের মোক্ষ। তারা যে ভবিষ্যতে কম্পোজিটরের স্থূল হস্তাবলেপনের দ্বারা সর্বাঙ্গ ছাপাখানার মসীলিপ্ত হয়ে সাহিত্যের বিচারশালায় দেখা দেবে তা কল্পনাও করা হয়নি।"

[যাযাবর : জনান্তিক, ১৩৫৯]

(১)

১৩ই জানুয়ারী, ১৯৬০

ভাই বিশ্বনাথ,

আমার পত্র পেয়ে চমকে ওঠা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। তোমার দেশে গিয়েছিলুম সাংস্কৃতিক মিশনের ছাত্র সভ্য হিসেবে। কোন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। আমার মনে পড়ে তোমাদের কয়েকজনের আগ্রহভরা দৃষ্টি। তোমরা এসেছিলে অটোগ্রাফ নেবার জন্য। বোধহয় ভাবতে পারনি আমার পক্ষে তোমাদের কাছে অযাচিতভাবে পত্র দেবার অর্থ কি হ'তে পারে।

স্কুলে পড়েছি তোমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা। সত্যি বলতে কি, তোমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এমন কিছু নয়। আমি কাশ্মীরে গিয়েছি। শুধু বরফ আর চেরীগাছ ছাড়া আর কি আছে? বাংলার শ্যামল প্রকৃতির কথা শুনেছি। কিন্তু সত্যি ভাই, তোমাদের কলকাতা শহরে—যা ঘুরে দেখবার সুযোগ হয়েছিল—এমন কি সৌন্দর্য আছে? তবে তোমাদের দেশের মানুষগুলি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। সত্যি আমার ভাবতে বড় ভাল লাগে ওদের কথা। কী আন্তরিকতা! কি আগ্রহ! আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম ভারতের মানুষ দেখে। দারিদ্র্যের নির্মমতা কত মানুষকে অমানুষিক জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে। তবু তাদের লক্ষ ভবিষ্যতের দিকে।……আমার মনে পড়ে তোমাদের একটি ছোট্ট ছেলের কথা। আমি নাম জিজ্ঞাসা করতে বল্লে 'শোভন'। চমৎকার নামটি। আমি যখন জানতে চাইলুম সে বাড়ীতে

কি করে, সে জানালে তারা চার ভাই স্কুলে পড়ে, আবার সকালে বিকেলে বাবাকে কাজে সাহায্য করে। আমি মুগ্ধ হলুম।·· ···একটি ছোট্ট মেয়ে আটোগ্রাফ নিতে এসেছিল। তাকে বল্লুম সে আমার সাথে এদেশে আসতে চায় কিনা। সে বল্লে "না"। সে বল্লে, তার দেশ ভারতবর্ষ কত সুন্দর! এ দেশ ছেড়ে বিদেশে সে যাবে কেমন করে? আমি আশ্চর্য হলুম। আমাদের অধ্যাপক সেদিন 'ডেমোগ্রাফি'র ক্লাসে বল্লেন, অনাদৃত ও ক্ষুধাতুর শিশুর সংখ্যা নাকি ভারতেই বেশী। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। যেসব ছেলে-মেয়ে আমি তোমাদের দেশে দেখেছি তারা কত সুন্দর, কত প্রাণচঞ্চল।

আমাকে তোমাদের দেশের কথা, শহরের কথা জানিও। কয়েকদিনের মধ্যে কতটুকুই বা দেখেছি। আরও অনেক জানার ইচ্ছে হয়। জানিও কিন্তু। প্রীতি নিও।

তোমার

(অনূদিত)

---

(২)

৩০শে মার্চ, ১৯৬০

ভাই বিশ্বনাথ,

তোমার পত্র পেয়ে কত না আনন্দ পেয়েছি। তুমি যে এমনভাবে আমার ডাকে সাড়া দেবে তা ভাবতে পারিনি। আমি বিশেষ করে অভিভূত হয়েছি তোমার আন্তরিকতায়। আর কত বড় চিঠি লিখেছ! বাংলাদেশের একটা ম্যাপও সঙ্গে পাঠাতে ভুল করনি! তোমার পত্রের শেষ ছত্রদুটি আমার মনে থাকবে। তুমি লিখেছ,

"যা আমি পাইনি তার জন্য বেদনা নেই
কিন্তু যা পেয়েছি তা আমার হোক।"

আমি ভাই এ কথাটা মেনে নিতে পারলুম না। আমরা মনে করি জীবনে যা পেয়েছি তা সত্যই আমার যোগ্য কিনা তা দেখা দরকার। যা পাইনি তা আমার পাওয়া উচিত কিনা তাও দেখা দরকার। তারপরে আসে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব করার সময়। সে যা হোক, তুমি আমাদের এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। আমাদের এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত, অবশ্য শিক্ষা অর্থে শুধুমাত্র পুঁথির শিক্ষা নয়। জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও স্বাধীনভাবে গড়ে তুলবার জন্য যেসব জিনিস মানুষের একান্তভাবে জানা দরকার তাই শিক্ষার অঙ্গীভূত। ছোটবেলায় সাত বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেককেই গ্রামের নার্সারী স্কুলে যেতে হয়। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিশুদের বইয়ের শুক্‌নো বিদ্যা না শিখিয়ে তাদের মধ্যের নতুন নতুন সম্ভাবনাগুলিকে আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হন। এর পর প্রত্যেক ছেলেকেই উচ্চ বিদ্যালয়ে

যেতে হয়। এখানেই তাদের ভবিষ্যৎ জীবন কোন্ খাতে বইবে তা ঠিক হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়—যেমন আমি। কিন্তু অধিকাংশই কারিগরী ও শিল্পবিদ্যায় আগ্রহ দেখায়। কিছু-সংখ্যক আবার সমাজসেবায় এবং সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। কিন্তু কারিগরী বিদ্যার চাহিদাই বেশী। এর কারণ, এ পথে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল। জানই তো আমাদের দেশ শিল্পোন্নয়নের জন্য কত সচেষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পদ্ধতি অতি আধুনিক। ভেবে অবাক হতে হয়, আমাদের শিক্ষা যাতে সুসম্পূর্ণ হয় তার জন্য আমাদের সরকার কত আগ্রহান্বিত। আর এখানে শিক্ষার জন্য দাম দিতে হয় না। শুনেছি তোমাদের দেশে অনেকে দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কেন এমন হয় বলতে পার? আমি অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারিনি। কারণ শিক্ষা তো আলো, হাওয়া আর জলের মত মানুষের জন্মগত অধিকার। তাও আবার মূল্য দিয়ে কিনতে হবে?

আমাদের এখানে বইপত্র, ল্যাবরেটারীর খরচ সবই সরকার দেয়। আবার যেসব শিক্ষামূলক ভ্রমণে আমরা বের হই তাও বিনা খরচায়। এসব ভ্রমণে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করব তা একটা খাতায় লিখে অধ্যাপককে দেখাতে হবে। এমনিভাবে বাস্তবকে বুঝতে হবে এবং জীবনকে তার উপযোগী করে তুলতে হবে।

পত্রের আশায় রইলুম।

তোমার

(অনূদিত)

---

(৩)

১লা জুন, ১৯৬০

ভাই বিশ্বনাথ,

এবারের চিঠিতে তুমি খুব মজার কথা লিখেছ। তুমি জানতে চেয়েছ আমাদের রাজধানীটা কেমন। এর মানুষেরাই বা কি রকম? তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও জানতে আগ্রহ দেখিয়েছ। আমি ছাত্র—যেমন তুমিও, দুজনেই বয়সে নবীন। জীবনকে কতটুকু দেখেছি? এ শহর এত বড় আর তার মানুষগুলো এমন চমৎকার যা আমি লিখে বোঝাতে পারব না। তবে এসব জানার একটা খুব মজার পথ আছে। আমি সে পথের সন্ধান তোমায় দিচ্ছি। আমি বলি তুমি বরং এখানে চলে এস। ভয় পেয়ো না। কাজটা এমন কিছু শক্ত নয়। তুমি বোধ হয় জান সেপ্টেম্বরে এখানে একটা ছাত্র সম্মেলন হচ্ছে। ভারতের হয়ে এখানে এস না কেন? আমাদের জানার এমন সুযোগ হারাবে? আমি আশায় রইলুম তুমি আসবে।

তোমার চিঠিতে তুমি ভারতের ইতিহাসের কয়েকটি অবদানের কথা উল্লেখ করেছ। আমি ভেবে কত আনন্দ পাই, দেশকে তোমরা কত ভালবাস। গুপ্তযুগের গৌরবময় অবদানের কথা তুমি লিখেছ। আবার বৈদিক যুগের শ্রেষ্ঠতার কথা উল্লেখ করতেও ভোলনি। তবে ইংরেজের যুগটাকে তোমরা পছন্দ কর না। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে ভারতের ইতিহাস আমিও পড়েছি—খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে। অবশ্য ভারত ইতিহাসের ব্যাখ্যায় সব স্থানে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারব না। তুমি বলেছ বৈদিক যুগে সমাজের যে কাঠামো তৈরী হয় তা হাজার বছর অতিক্রম করে আজও অক্ষয়। আমার মনে হয় বৈদিক যুগে সমাজের যে গঠন ছিল তা ক্রমে বিকৃত হয়ে তোমাদের সমাজের এখনকার চেহারাটা খাড়া হয়েছে। বৈদিক যুগে সমাজ গ্রামকেন্দ্রিক ছিল। রাজ্যগুলি ছিল ক্ষুদ্র আয়তনের। আর রাজা ছিলেন রাজ্যের জনমণ্ডলীর প্রতিনিধি। যে 'সভা' আর 'সমিতি' রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করত তাদের গ্রীকদের Boule এবং Agord'র সঙ্গে তুলনা করা যায়। বর্ণভেদ-প্রথা ছিল—কিন্তু বর্ণবৈষম্য ছিল না, বর্ণভেদের মূলকথা ছিল পেশার বিভিন্নতা—অথবা শ্রমবিভাগ? এবং জন্মগত অধিকার বলে কারও বর্ণ নির্দিষ্ট হত না। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষে এবং পৌরাণিক যুগে সমাজের এ সহজ কাঠামোকে কৃত্রিম একটা ছাঁচে ফেলা হল। এ সময় দেখি অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর সার্বভৌমত্ব করছেন মহাপরাক্রমশালী সম্রাট্ বা রাজচক্রবর্তী। অস্ত্রবলে তিনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছেন। কাজেই জনমণ্ডলীর কাছে তাঁর কোন দায়িত্ব নেই। সভা ও সমিতি তাদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। এদের স্থান নিয়েছেন ধুরন্ধর সমাজপতি। জাতিভেদ পাকাপাকিভাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে রাজনীতির অঙ্গ হয়েছে। এবং এ সময় হতেই জন্মগত অধিকার বলে বর্ণ নির্দিষ্ট করার প্রথা চালু হয়েছে। বৈদিক যুগে ধর্মের অর্থ ছিল যজ্ঞ আর নিষ্ঠা পালন কিন্তু এখন ধর্ম অর্থে ব্রাহ্মণগণ এক জটিল ক্রিয়াপদ্ধতিকে চালাতে লাগলেন। দেবদেবীর সংখ্যা প্রায় জ্যামিতিক নিয়মে বেড়ে যেতে লাগল। কারণ তাঁদের সংখ্যা যত বেশী হবে পূজোপার্বণ, ভোজ আর রাজার 'ভেট' এর পরিমাণও বেড়ে যেতে থাকবে। এবং এই সুযোগে জন-মণ্ডলীর উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভারের এক বৃহৎ উদ্বৃত্ত অংশ অলস মানুষের বিলাসের উপকরণ হিসেবে পাচার হতে থাকবে।

বৈদিক যুগে নারী আর পুরুষের সমান অধিকার ছিল এবং সমান সামাজিক মূল্য ছিল। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণরা নতুন করে শেখালেন 'পর্দা' প্রথার মহত্ত্ব। নারীর জীবনের মূল কথা নাকি পুরুষের অধীন হয়ে থাকা, অর্থাৎ ঘুচে গেল তাদের সামাজিক মূল্য আর চিন্তার স্বাধীনতা। একটা কৃত্রিম ছকে ফেলে নারীর জীবনকে পুরুষের ভোগের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল, আর সতীত্বের আদর্শের যাঁরা প্রধান প্রচারক ছিলেন তাঁরা ধর্মের সঙ্গে সমাজের কৃত্রিম কাঠামোর একটি অক্ষয় যোগসূত্র আবিষ্কার করেন। সুতরাং নারী যদি স্বাধীন হতে চায় তবে তা ধর্মের বিরুদ্ধে তার জেহাদ ঘোষণা করা হবে।

এভাবেই সমাজের কৃত্রিম গঠন মানুষকে তার মহৎ গুণগুলির প্রতি অবজ্ঞা করতে শিখিয়েছিল। অন্তত আমার তাই মনে হয়।

যাক, অনেক কথা বলা হল। এবারের মত এখানেই থাক।

তোমার

(অনূদিত)

(৪)

২রা আগস্ট, ১৯৬০

ভাই বিশ্বনাথ,

গত কয়েকদিন থেকে শয্যাশায়ী আছি। অসুস্থ অবস্থায় তোমার চিঠি পেয়েছি। সত্যই দূরের বন্ধুর কাছ থেকে এমন আন্তরিকতা ক'জন পায়? তোমার চিঠি পেয়ে খুবই উৎফুল্ল হয়েছি। পিয়াসাঁ তোমার চিঠি পড়েছে। ওঃ, পিয়াসাঁকে বোধ হয় চিনতে পারলে না? ওর পরিচয় দিচ্ছি।.....আমার অসুস্থ অবস্থায় ও আমায় যথেষ্ট সাহায্য করছে। তোমার চিঠি পড়ে বল্লে, ভারতীয়রা নাকি খুব বেশী সেন্টিমেণ্টাল। আমি বল্লুম "কেন?" উত্তরে তোমার চিঠির শেষ দুটি ছত্রের প্রতি ইঙ্গিত করলে।

এবারের পত্রে তুমি আমার ঐতিহাসিক জ্ঞানের সমালোচনা করেছ। আমার গত চিঠিতে পৌরাণিক যুগের সমাজ সম্বন্ধে যে দু'চার কথা বলেছি তা তোমার মতের সঙ্গে হয়ত মেলেনি। আমার মনে হয় ইতিহাসকে তুমি যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখ আমার থেকে তা পৃথক। দেশকে অবশ্য সকলেই ভালবাসে। তাই বলে দেশপ্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। সত্যকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা দরকার। ঠিক নয় কি?

তুমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছ আগামী ১৫ই আগস্ট তোমাদের স্বাধীনতা উৎসব। এ উৎসব এখানে আমরা উদ্‌যাপন করব কিনা এবং কিভাবে করব তা জানতে চেয়েছ। আমি তো ভাই অসুস্থ। কাজেই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ হয়ত আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকব বলেও মনে হয় না।

আমাদের এখানে প্রতি বছরই ১৫ই আগস্ট পালন করা হয়। তোমাদের দূতাবাসে এ উপলক্ষে বিরাট আয়োজন করা হয়। এবারেও নিশ্চয়ই হবে। এ দেশের নাগরিকদের নিমন্ত্রণ করা হয়। তারাও সাড়া দেয়। ভারতে বড় বড় নেতাদের লেখা গ্রন্থ আমাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া গতানুগতিক অন্যান্য অনুষ্ঠান তো আছেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা সানন্দে এ উৎসবে যোগ দেন। আমরা যারা ছাত্র তারাও বাদ যাই না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করি। আমাদের এখানে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র আছেন। তারা

তো সবকিছুর পুরোভাগে থাকেন। এবারের উৎসবও সর্বাঙ্গসুন্দর হবে না এমন মনে করার হেতু নেই। আমি যোগ দিতে পারব না হয়ত। তবে ইতিমধ্যেই ছাত্রমহলে যে সাড়া পড়ে গেছে তা বেশ বুঝতে পারছি।

তোমরা এ দিনটি কিভাবে পালন কর তা জানার ইচ্ছে রইল। তোমাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেই আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলনের কথা। যেটা সেপ্টেম্বরে হচ্ছে। আসতে ভুল না, কেমন ?

তোমারই

(অনূদিত)

লারা

উৎপলকুমার দে

দ্বিতীয় বর্ষ, পদার্থবিদ্যা

দিনের বেলায় শুধু মানুষের স্রোত, শুধু চলেছে আর চলেছে। ট্রামের ঘর্‌ঘর্‌, বাস-লরীর ভ্যাঁপো, ফিরিওয়ালার চিৎকার।

সূর্য ডোবে সাদা বরফে-ঢাকা ঐ পাহাড়টার পেছনে, পাতলা অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হয়। শহরের কলকারখানার 'সিটি' বেজে ওঠে, যেন এক যাদুকরীর মায়ার ইঙ্গিত! কাজ থামে, স্রোত মন্থর হয়ে আসে—পথের কাফেতে আর রেস্তোরাঁয় আবর্তের সৃষ্টি করতে থাকে।

আরও রাত বাড়ে, পশ্চিমের পাহাড় থেকে তুহিন বাতাস নেমে আসে, জানালার সার্সিতে ঝাপ্‌টা মারে।

দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে যায়, ঘরে-ঘরে শীতের আগুন জ্বলে ওঠে। দেখতে দেখতে কাফেও ফাঁকা হয়। সাপের মত আঁকা-বাঁকা পথগুলো বরফে ঢেকে যায়—সাদা হয়ে ওঠে, চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে। আহা! মায়াবীর কণ্ঠে যেন মুক্তোর হার!

এবার শীতে এই পাহাড়ী শহরটায় বেড়াতে এসেছি। রাত্রে এ শহরটা ঘুরে বেড়াতে ভারী আমোদ লাগে। চাঁদনী রাতে, সেও কথার অপেক্ষাই রাখে না!

* * *

সেদিনটায় যেন শীত একটু বেশীই ছিল। সেদিনটা ?—হ্যাঁ, এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে বই কি! সেদিনটাকে ভুললে, এই ছোট্ট শহরটিকে ঘিরে সযত্নে গড়ে-ওঠা একমাসের স্মৃতিকে অবশ্যই প্রতারণা করা হয়!

হাতের wrist-watchএ দেখলাম, রাত বারটা। ঘুরে ঘুরে বেশ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, তাই মাদ্রিনা পার্কের রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালাম।

চাঁদ পাতলা মেঘের স্তরে ঢাকা। মৃদু আবছায়ায় ঢাকা রূপোলি আলোর হরির-লুঠ চলেছে!

শহরটার দিকে তাকিয়ে, ভারী অদ্ভুত মনে হতে লাগল—যেন এক অদৃশ্য মায়াবীর খেলা শুরু হয়েছে! খেলার সরঞ্জাম—প্রকৃতির পটভূমিকা, চাঁদের আলো, শীতের আবেশ আর নিশাচর মানুষ।

পার্কের ধূসর ঘাস রূপালি সাজ পরেছে, কালো পিচের রাস্তায় পাতলা বরফের আলগা স্তর আলো ঠিকরে দেয়, আকাশের সুদূরতায়, আলো-ছায়ায় শুধু একটি কথা মেশানো—'কি অদ্ভুত! কি অপরূপ !!'

নিশাচর মানুষের দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। একদিকে আশ্চর্য, আরেক দিকে রূপাস্বাদন! মায়াবীর মায়ার ফাঁদে আরও সে জড়িয়ে যায়, একটা মোহ যেন তাকে পেয়ে বসে।

নিশাচর মানুষের এ মোহ, শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরের লেপের-তলার-মানুষ কি করে উপলব্ধি করবে!

হঠাৎ চোখে পড়ল, অদূরে lamp-postএর কাছে একটি ছায়া কাঁপছে। ছায়াটি ক্রমশঃ মানুষের রূপ নিল।

দেখলাম, একটি নারী।

কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে দেখলাম—মনে হল, মেয়েটি ভীষণভাবে কাঁপছে। একটা অপ্রতিভ ভাব, পরনেও কোন গরম কাপড় নেই।

ভাবলাম, হয়ত কোন বিপদে পড়ে থাকবে, একবার দেখা দরকার!

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম।...

মেয়েটির বয়স, আঠারো কি উনিশ। পোশাক মলিন। শীতে চোখ-মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম, "আপনি কি কোন বিপদে পড়েছেন?" মেয়েটি একবার দু'চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ভারী করুণ মুখখানি। টানা-টানা নীল-দু'টো চোখের অসহায় চাহনি, আমার প্রাণে গভীর স্নেহের এক আবেষ্টনী রচনা করতে লাগল।

আমি মৃদুকণ্ঠে বললাম, "বলুন, কি হয়েছে আপনার।"

মেয়েটি শীতে দ্বিগুণভাবে কাঁপতে লাগল। গায়ের রোমগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে!

আমি স্পষ্ট দেখলাম—কেন জানি না, মুক্তোর মত দু'ফোঁটা অশ্রু ওর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল।

ধরা গলায় জবাব দিল—"আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

আমি মৃদু হেসে জবাব দিলাম—"তাতে কি হয়েছে! আপনি শীতের দাপটে একেবারে 'কাবু' হয়ে পড়েছেন। এখন চলুন আমার ফ্লাটে, একটু গরম হয়ে নেবেন। তারপর আপনার বাড়ি খুঁজে বার করা যাবে!"

মেয়েটি কোন জবাব দিল না। আগের মতই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ওভার-কোটটা খুলে, ওর গায়ে দিয়ে দিলাম। মেয়েটি তীব্র আপত্তি জানাল।

আমি খুব হেসে জবাব দিলাম—"দেখুন, আমার ছোট বোন বয়সে ঠিক আপনারই মত। সেই সূত্রেই আপনি আমার ছোট বোন। আমার বোন শীতে কাঁপবে আর আমি দিব্যি আরাম করব, তা ত হয় না!"

কোন সাড়া পেলাম না। ও আর কোন আপত্তিও জানাল না!

আমি বললাম—"যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে এখন থেকে তুমি বলেই ডাকব।"

আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"—আচ্ছা, তোমার নাম কি?"

"—লারা।"

আমি লারাকে বললাম, "চল আমার ফ্লাটে।"

দেখলাম, ও নিঃসংকোচে আমায় অনুসরণ করতে লাগল।

* * *

আমার ফ্লাটের গরম-চুল্লী লারাকে অনেকখানি সতেজ করে তুলেছে। এখন লারার অপ্রতিভ এবং সসংকোচ ভাবও অনেকটা কেটে গিয়েছে।

আমি স্টোভে কফি তৈরি করতে করতে প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা লারা, এত রাত্তিরে একজন অপরিচিতের সঙ্গে আসতে তোমার ভয় কিংবা দ্বিধা হচ্ছিল না!"

লারা কপাল কুঁচকে অবাক হয়ে বলল—"কেন!"

যেন আমার প্রশ্নটা পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের একটি! আমি হেসে বললাম—"বাঃ! আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত, আবার বিদেশী। আমি কি ধরনের লোক—সেটা অনুসন্ধান না করেই, তুমি আমার সঙ্গে যাবার আগ্রহ পেলে কি করে?"

হঠাৎ উদাস হয়ে এক কথায় উত্তর দিল—"পে—লাম!"

এই দারুণ শীতে ভবঘুরে সঙ্গীহারা এই মানুষটি হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে অনভিপ্রেত একটি অতিথিকে পেয়ে, গরম কফি সহযোগে কেক খেতে খেতে সরস আলাপ জমাবার

স্বাভাবিক এক অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। কিন্তু আলাপ জমল না, আলাপের অপ্রশস্ত তটিনীতে পরিচয়-পর্ব সাঙ্গ হবার পরই ভাটা দেখা দিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। চাঁদের আলো জানালার পথ থেকে অদৃশ্য হল। সারা ঘরটা অন্ধকারে ঢাকা, শুধু এক কোণে চুল্লীর অস্তময় রক্তিমাভা। Wall-clockটা 'টিক্' 'টিক্' শব্দে সুরহারা, গুমরে-ওঠা এই নিরীহ ভদ্রলোকের হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যথা করুণ সুরে প্রকাশ করতে লাগল।

লারা কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ধরেই লারাকে লক্ষ্য করছিলাম —সব সময়ই যেন একটা কিছু ভাবছে!

চিন্তাচ্ছন্ন ভাবেই আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল—"আপনি বিদেশী, কিন্তু কোন্ দেশীয়, তা ত বলেন নি?"

"—ইণ্ডিয়ান।"

"—ইণ্ডিয়ান!"

মনে হল, শুনে লারা ভারী খুশী হয়েছে।

ভাবলাম—যাক্, এবার হয়ত আলাপ করতে আগ্রহ দেখাবে! কিন্তু লারা আর সেরকম কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করল না। মাথা নীচু কোরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

জানি না এভাবে কতক্ষণ কেটে গেল।···

চুল্লীর ঈষৎ রক্তিমাভা লারার মুখে এসে পড়েছিল।

দারুণ শীতে জমে-ওঠা লারা আর এ লারা, মনে হল যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন! লারার সদ্য-ফোটা রূপ দেখে, নারীর স্নেহ-স্পর্শ-বিহীন ছন্নছাড়া এই হতভাগা পুরুষ সত্যই মুগ্ধ হল। হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে নিভৃতে যে একটি বীণা রয়েছে আনন্দাবেগের সুরে ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, মনে হল তাতে অপূর্ব এক সুর উত্থিত হল। সুরের অনুরণন হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল—'এ যেন এক অপরূপ ম্যাডোনা-মূর্তি'!

আমার মন অনির্বচনীয় এক আনন্দে ভরে উঠল।···হঠাৎ মনে হল, লারা যেন কিছু একটা বলতে চায়। কিন্তু বলবে বলবে করেও বলতে পারছে না।

আমি বললাম—"লারা, কিছু বলতে চাও?"

ও ধীরে ধীরে বলল—"একটা অনুরোধ করব, আপনি রাখবেন বলুন!"

"বল কি তোমার অনুরোধ!"

"আমি এক হতভাগিনী"—হঠাৎ লারা ঝরঝর কোরে কেঁদে ফেলল—"আমি আপনার বাড়ির 'মেড' হয়ে থাকব, আপনি শুধু দু'বেলা আমায় খেতে দেবেন, আমি আর কিছুই চাই না।"

অসহায় সুন্দরী লারার চোখের জল আমায় অভিভূত করে ফেলল; কিন্তু লারার করুণ আবেদন আমায় যেন বজ্রাঘাত করল। আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

আমি এক অবিবাহিত ভবঘুরে যুবক। বিদেশে আমি একাই থাকি। লারাও সুন্দরী। দেখেও ভদ্রবাড়ির সন্তান বলেই মনে হয়। কিন্তু লারার এরকম অনুরোধের কারণ আমার কাছে অস্পষ্ট!

এখানে আমার কোন আত্মীয় নেই, সত্যি। কিন্তু আশেপাশেই দাদার কয়েকজন বন্ধু আছেন এবং ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ জমে-ওঠা কয়েকজন এ-দেশীয় বন্ধুও আছেন। তাঁরা প্রায়ই আমার ফ্লাটে আসেন। সুতরাং আসল অসুবিধেটা যে কোথায়, সেটা বোধকরি অভিজ্ঞ মাত্রেই বুঝতে পারবেন।

লারা দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সোনালি চুলের গুচ্ছ চোখের জলে ভিজে উঠল।

আমি সমস্ত আবেগ চেপে রেখে সহসা বললাম—"তা কি করে সম্ভব!"—অনুরোধটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বললাম—"তাছাড়া, আমি ত এখানে আর মাত্র একমাস আছি, সুতরাং—"

লারা হঠাৎ আমার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল—"আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, আপনি আমায় একমাসের জন্যে আপনার বাড়িতে স্থান দিন। তারপর আমি আমার পথ দেখে নেব।"

আমার কি যে করা উচিত, তা আমার মাথায় এল না। একদিকে আত্মীয়-স্বজনের ভ্রূকুটি, বন্ধুবান্ধবের ঘৃণা আর টিটকারী; এবং অন্যদিকে এক অসহায় সুন্দরী নারীর করুণ আবেদন, চোখের জল। একবার ভাবলাম, থাক্ পেছনে পড়ে আমার সমাজ; আমি মানুষ, প্রকৃত মানুষের কর্তব্যই পালন করব।

কিন্তু সহসা ভারী মুহ্যমান হয়ে পড়লাম, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবহীন হয়ে যে মানুষ জগতে বাস করে, তার মত হতভাগ্য কি এ জগতে আর কেউ আছে!

অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। কোন উত্তর দিতে পারি নি। দেখলাম, লারার কান্না থেমে গিয়েছে, মাথা নীচু করে বসে রয়েছে।

আমি সস্নেহে বললাম—"লারা, এরকম পাগলামি করো না। বল, কি হয়েছে তোমার?"

লারা কোন উত্তর দিল না।

"—বল, কোথায় তোমার বাড়ি? আমি তোমাকে বাড়িতে রেখে আসব। আমার সাধ্যমত আমি তোমার উপকার করব।"

লারা গম্ভীরভাবে বলল—"আর কোন প্রয়োজন নেই।"

বুঝলাম, লারা যে সরল চিন্তাধারা নিয়ে, যে অমায়িক মন নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, সেখানে আঘাত লেগেছে। লারার চোখের জল এতক্ষণ অনেক কষ্টেও সহ্য করেছি; কিন্তু আমি যে একজন মানুষকে হঠাৎ আঘাত হেনেছি—এটা সহ্য করতে পারলাম না; দুঃখে, অনুতাপে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

চাঁদ ডুবে গেল। আকাশ আস্তে আস্তে সাদা হতে লাগল। ভোরের এক ঝলক হাওয়া পুবের জানালা দিয়ে ঢুকে ঘরের মধ্যে মাতামাতি শুরু করে দিল।

আমি বললাম—"লারা, তুমি বস। আমি ভেতর থেকে আসছি। Breakfast-এর পর তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেব।"

আমি চলে গেলাম।···

প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে যখন বাইরের ঘরে এলাম—দেখলাম, সেখানে লারা নেই। ভাবলাম, হয়ত আমার লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে থাকবে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, বাইরের দরজা খোলা। বুঝলাম, লারা চলে গিয়েছে। অপ্রত্যাশিতভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে রাতের অন্ধকারে এসেছিল, আবার তেমনিভাবেই ভোরের আলো ভালভাবে ঘোচবার আগেই চলে গেল।

হঠাৎ এক গভীর দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে এল। জীবনটা ভারী অদ্ভুত মনে হতে লাগল—মানুষ যা চায়, সাধ্য থাকলেও সব-কিছুই কি করা সম্ভব! মানুষের কত উন্নত, প্রশস্ত চিন্তাধারা সমাজের সঙ্কীর্ণ পথে ঘুরপাক খেয়ে মরে, পথ খুঁজে পায় না।

দেখলাম, আমার টেবিলে লারা একটি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে। সম্বোধনহীন এক করুণ চিঠি। এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা শেষ করলাম।

'আমি এক হতভাগিনী। বাবা মদ খেয়ে এসে আমার ওপর অত্যাচার করেন; বাড়ি থেকে বার করে দিতে চান। যতদিন মা ছিলেন, মা-এর ওপরও এরকম অত্যাচার করতে দেখেছি। আজ ছয় মাস হল মা মারা গিয়েছেন। এখন বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করতে চান, আমিই সে-পথে একমাত্র বাধা। আপনি হয়ত ভাবছেন, আমি law-এর সাহায্য নিই না কেন! কিন্তু বাবা যতই অত্যাচার করুন, তবুও তিনি আমার 'বাবা'। ছেলেবেলার বহুস্মৃতি আজও স্পষ্টভাবে মনে পড়ে। যে বাবাকে একদিন 'বাবা' বলে কত আনন্দে জড়িয়ে ধরতাম, তাঁর নামে আমি কি করে কলঙ্ক রটিয়ে দেব! আর বাবার কলঙ্ক ত আমারই কলঙ্ক।

ইদানীং বাবার বাড়ি আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই গত পরশু রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসি—নিজের ভাগ্যান্বেষণে। সারাদিন কাটে অনাহারে। অপটু, সলজ্জ এই হতভাগিনীটি চাকরীর খোঁজে হোটেল-রেস্তোরাঁয় আর অফিসের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কোন চাকরী পেলাম না। তারপর রাত প্রায় বারটায় আপনার সঙ্গে দেখা। তখন আমার অবস্থা—শীতে প্রায় অর্ধমৃত। আপনি আমায় বাঁচালেন। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই আপনি জানেন।

আমি জানতাম, ইণ্ডিয়ানরা খুবই উদার-স্বভাবের এবং দয়ালু হন। তাই যখন জানলাম আপনি ইণ্ডিয়ান, আর সেই যে আপনি বলেছিলেন—আমি আপনার ছোট

বোন, তাই সস্নেহে ওভার-কোট খুলে দিয়েছিলেন—সেই স্নেহের দাবীতেই, আমি আপনার বাড়িতে স্থান চেয়েছিলাম। আমি আপনার বোনের মতই থাকতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু মনে হয়, সমাজের তীব্র ভ্রূকুটিকে আপনি পরাজয় মানাতে পারেন নি। তাই এখানেও আমার স্থান হল না।

শেষকালে, শুধু আর একটা কথা বলতে চাই। সেটা আমার মনের এক সত্য কথা। একথা কাউকেই বলবার মত নয় ; কিন্তু কি জানি। আজ যদি না একথা প্রকাশ করি—সারা জীবন হয়ত নারীজীবনের দুঃসহ ব্যথা নিয়ে গুমরে মরতে পারি। তাই বললাম—আমি আপনাকে কয়েক ঘণ্টাতেই খুব ভালবেসেছিলাম। মনে হয়, এত গভীরভাবে কাউকে আমি কোনদিন ভালবাসি নি, কোন দিন হয়ত পারবও না।

মনের এতবড় সত্য কথাটা প্রকাশ করতে, আমার দুই গণ্ডদেশ চোখের জলে ভিজে উঠেছে।···

হয়ত আর কোনদিন দেখা হবে না। ইতি হতভাগিনী
লারা।'

"ছিঃ! ছিঃ! একি করলাম আমি"—নিজের অগোচরেই দুঃখে চেঁচিয়ে উঠলাম—
—"লারা, লারা"—প্রশস্ত ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে কথা দু'টো বারে বারে ফিরে আসতে লাগল, সমস্ত ঘর মর্মাহত এক পুরুষের করুণ আর্তনাদে ভরে উঠল। সে আর্তনাদ ভোরের নির্মল হাওয়ায় ভর করে, মেঘলোকের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ল। স্বচ্ছ নীল মেঘেরও ওপারে, কোনও এক 'লোকে' যদি কেউ সমস্ত মানুষের মনের করুণ ইতিহাসের খবর রাখেন—তাহলে হয়ত তাঁর কাছে আমার এ করুণ আর্তনাদ গিয়ে পৌঁছবে। তিনি হয়ত আমার দুঃখ উপলব্ধি করতে পারবেন।

তখুনি বেরিয়ে পড়লাম, যদি লারাকে পথে পাই—ফিরিয়ে আনব।···

কিন্তু কোথাও পেলাম না লারাকে। তারপর থেকে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু ওর আর দেখা পাই নি।

আজও যখন একা বসে থাকি, লারার কথা মনে পড়ে। লারাকে কতভাবে কল্পনা করি। ভাবি, তখন কেন ওভাবে '—কথাটা' বললাম, '—ভাবে' বললেই ভাল হত!

কল্পনায় ভুলে যাই, লারা আর কোনদিন আসবে না ; মনে হয়, লারা আবার এসেছে, ওর সঙ্গে কত গল্প করছি!

আমার স্মৃতি ছবি আঁকে—যে চলে গেছে, তাকে সুন্দর করে মনের অন্তঃপুরের কল্পনার রঙীন দেওয়ালে সযত্নে সাজিয়ে রাখে। আমি লারার ছবির দিকে তাকাই আর মুগ্ধ হই, অনির্বচনীয় এক আনন্দ পাই।

লারা আমার কাছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা এসে, ছন্নছাড়া এই জীবনের মলিন চাদরটায় জরির পাড় বসিয়ে গেছে।

গরুর গাড়ি

অধ্যাপক নির্মলকান্তি মজুমদার

কলেজের ছুটির পর বিকেলের দিকে রাস্তার মোড়ে বেশ ভিড় জমে। ট্রাম বাস আসে যেন কাঁঠাল বোঝাই হয়ে। নামা-ওঠার রীতিমতো হুড়োহুড়ি। দুধারেই সমান মত্ততা। বিকট বিহ্বল চিৎকার—'আগে নামতে দেন মশাই।' ঠেলাঠেলি ক'রে কোন রকমে ট্রামে বাসে উঠি। গাড়ির ভিতর মানুষের নিশ্ছিদ্র দেয়াল—আকাশ দেখা যায় না একটুও। অনুভব করি অসহ উষ্ণ আবহাওয়া। অবস্থা চরমে ওঠে যখন খাকি পোশাক বা বুশ সার্ট পরা গলায় ব্যাগ ঝোলানো কণ্ডাক্টরের সঙ্গে আপিস-ফেরত কর্মক্লান্ত প্যাসেঞ্জারের নয়া পয়সা নিয়ে বকাবকি রাগারাগি হাতাহাতিতে পরিণত হয়। ট্রাম বাস থেকে নেমে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। শ্রান্ত দেহে বাড়ি ফিরবার সময় মনে পড়ে শান্ত পল্লীপথে মন্থর গরুর গাড়িতে যাতায়াতের কথা। আর মনে পড়ে নিরাভরণ নিরীহ নিরক্ষর গ্রাম্য গাড়োয়ানকে—কোমরে যার গামছা, বিনয়ে যার মাথা নিচু, যে 'রাম'কে বলে 'আম' আর 'আস্ত'কে বলে 'রাস্ত'।

মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে। প্রকৃতির সাধারণ সম্পদগুলো অপরূপ হয়ে ওঠে চোখে। সবুজ ঝোপের মধ্যে লাল টুকটুকে তেলাকুচো। বর্ণ-বৈসাদৃশ্যে চমক লাগে। আকাশে নিঃসঙ্গ শঙ্খচিল। কখনও নিচে নামে, কখনও ওপরে ওঠে, কিন্তু চলে আমার সঙ্গে। হয়তো আলাপ করতে চায়। শেয়াল আগে আগে যায়—একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, পিছন ফিরে চায় আবার হাঁটতে শুরু করে। দৃষ্টি সন্দিগ্ধ—বিদেশীর আগমন বুঝি পছন্দ করছে না। ঐ দূরে খড়ো ঘরের চালে অনেকগুলো সাদা সাদা কুমড়ো নজরে পড়ে—যেন গরিব মায়ের মাদুরে শুয়ে আছে পিঠোপিঠি ভাই। দীঘির পাড়ে তালগাছ গর্বভরে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে—মহাকালের প্রান্তরে তন্দ্রাবিহীন প্রহরী। মাঠময় খেজুর গাছ। বছরের পর বছর রস দান ক'রে দেহ বিদীর্ণ বিশীর্ণ। কী মহান্ আত্মত্যাগ! এই উদারতার খানিকটাও যদি মানুষের থাকত তাহলে ব্লাড ব্যাঙ্কের জন্য এত আবেদন নিবেদন করতে হত না, এমন অভিযান চালাতে হত না।

হাটের ভিতর দিয়ে গাড়ি চলে। রাস্তার দুধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে বসেছে দোকানের পর দোকান। চাল ডাল, মুড়ি মুড়কি, দই ক্ষীর, কুলো ডালা, আলু পটল, গরু, মেষ, ছাগল ভেড়া—হরেক রকম জিনিস জড় হয়েছে। ময়রার দোকানে মিষ্টি সাজানোর কী বাহার! জামা কাপড়ের দোকানে ছোট বড় বস্তা—মিলের ও তাঁতের ধুতি শাড়ি, রঙবেরঙের ছিট, মোটা মিহি গামছা। খেলনার দেকানে মাটির ঘোড়া ও কাঠের পুতুল, ন্যাকড়ার বল ও টিনের নৌকো, জাপানী রেলগাড়ি ও জার্মান লাট্টু। বইয়ের দোকানে

প্রথমভাগ, ধারাপাত, বালির কাগজ, কালির বড়ি, শ্লেট, পেনসিল, জলছবি। বাঁধানো গাছতলায় কলের গান হচ্ছে। অবাক হয়ে শুনছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। জন-সমাবেশ, কর্মচঞ্চলতা, আঞ্চলিক শিল্পের সমারোহ, আমদানী দ্রব্যের প্রসার। দূর দূরান্তর থেকে হাজির হয়েছে মানুষ বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে। কোন্ সকালে এসেছে জিনিস কাঁধে মাথায়, গাড়িতে। বেচা কেনা সেরে সবাই ঘরে ফিরে যাবে বেলাবেলি। অনেকক্ষণ অবধি কানে আসে কলরব, অনেক দূর অবধি চোখে পড়ে পসারী পসারিনীর মিছিল।

বনের পথে গাড়ি চলে। আলো-ছায়ায় লুকোচুরি খেলা। মৌমাছির মৃদু গুঞ্জন। শুকনো পাতার খস্ খস শব্দ। পাকা বঁইচির গন্ধে বাতাস ভরপুর। গাড়ির চালের ওপর কচি ডালের খড় খড় আওয়াজ। একটা গোসাপ উঁকি মারে—রাস্তা পার হবার আগে সভয়ে তাকায় এদিক ওদিক। নধর দেহ, শান্ত স্বভাব। কুড়ুল হাতে কাঠুরেরা কাঠ কাটতে এসেছে। বটের ছায়ায় বসে তামাক খাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরিশ্রম করার পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সংসার চালাতে হয়। সামান্য উপজীবিকা সংগ্রহে কত ক্লান্তি! তবু আনন্দের অভাব নেই। ভগবান যে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন সেটা হাসিমুখে করাই উচিত।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে গাড়ি যায়। পাঠশালার আটচালায় ছেয়েমেয়েরা নামতা মুখস্থ করে। চাটাইয়ের ওপর পণ্ডিত মশাই বসে আছেন—হাতে বেত, চোখে ঘুমের ঘোর। যারা ইস্কুলে যায় না তারা দাওয়ার একধারে দশ পঁচিশ খেলে। গামছা কাঁধে পুরুত মশাই ফেরেন এ বাড়ি ও বাড়ি পুজো সেরে—মুখে ক্লান্তির ছাপ, গলায় পইতে ঘামে ভিজে। আঁকা-বাঁকা সংকীর্ণ পথে কখনও গোলাবাড়ি বাঁয়ে ফেলে, কখনও গোয়ালঘর ডাইনে ফেলে গাড়ি এগোয়। পানাপুকুরের কোল ঘেঁষে যেতে যেতে নজরে পড়ে কামার বউ বাসন মাজছে, বাগদি বউ মাছধরা জাল শুকতে দিচ্ছে। ময়রার দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, মুদীর দোকানের কর্তা দিবানিদ্রার আয়োজনে অন্যমনস্ক। ভাঙা মন্দিরের আঙিনায় হনুমানেরা পরস্পরের উকুন বাছাবাছিতে ব্যস্ত। কৈবর্তদের খড়ের গাদা থেকে আঁটি টেনে নিয়ে চিবোচ্ছে নির্বিকার ধর্মের ষাঁড়। নির্ভয়ে কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে নিষ্কর্মার দল—বিশ্বাস ধর্মের ষাঁড় তাদের গুঁতবে না। কোথাও জানলায় বসে রোদে চুল এলিয়ে দিয়ে সুর ক'রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ছে তরুণী মেয়ে। কোথাও মাটির ঘরের নিরালায় নীরবে কাঁথা সেলাই করছেন বর্ষীয়সী বিধবা। বামুনপাড়ার বাতাস শিথিল বকুলের গন্ধে আকুল।

বিলের ধারে ধারে গাড়ি চলে। মাছরাঙা আর কাদাখোঁচা পাখিরা জটলা করে। চাঁড়ালরা খেপলা জাল ফেলে মাছ ধরে। জেলা বোর্ডের পুলের পাশে গাব গাছের নিচে ছিপ ফেলে জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে রয়েছে একজন। হয়তো কাছাকাছি কোন গ্রামের বাবুদের ছেলে—মাছ ধরার শখ আছে। ডিঙির পাটাতনের ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে তন্ময় হয়ে ভাটিয়ালি গাইছে মাঝি। দূরে মাল-বোঝাই গাড়ি দেখা যায়। আস্তে

আস্তে এগিয়ে এসে গাড়িখানা রাস্তা থেকে নেমে কাত হয়ে দাঁড়ায়। সোয়ারী গাড়িকে পথ ছেড়ে দিতে হয় মালগাড়িকে। এখানে ট্র্যাফিক পুলিস নেই, আছে প্রচলিত অলিখিত নিয়ম ; লাল পাগড়ির লাঠি নেই, আছে সামাজিক শাসনের কঠোরতা।

বেলাশেষের অবসান। পশ্চিম দিগন্তে। অস্তরাগ ঘরে-ফেরা গরু ভেড়ার পায়ের ধুলো। ভিজে কাপড়ে ঘাট থেকে জল নিয়ে যায় গ্রামের বধূ। মেঠো পথে জলের আলপনা কত সুন্দর! দুই গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় ডাক্তারখানা। রোয়াকে বৃদ্ধদের মজলিস। একজন জিজ্ঞাসা করেন—গাড়ি কোন্ গাঁয়ের গো ?

গাড়োয়ান উত্তর দেয়—আজ্ঞে, হলুদগাঁয়ের।

—হলুদগাঁয়ের! তাই বলো।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসে।

প্রথম—হ্যাঁ ভাই, তোমাদের রামনবমীর মেলা কেমন জমেছে ?

দ্বিতীয়—ও ভাই, ঘোষাল মশাই পুকুর কাটাচ্ছেন কবে ?

তৃতীয়—আচ্ছা, শিবু স্বর্ণকার সেরে উঠেছে তো ?

প্রশ্নের পর আসে অনুরোধ।

প্রথম—মানু ঠাকরুনকে বলো আমার বড়ি ও আমচুরের দরকার।

দ্বিতীয়—পদ্ম গয়লানীকে বলবে কাল সন্ধ্যায় আমার আধসের ছানা চাই।

তৃতীয়—সনাতন সদ্দারকে কষ্ট ক'রে জানাতে হবে আমি তার হাতে একখানা চিঠি দেব সামনের হপ্তায় মৌরপুরের মাধব গোঁসাইকে।

এইসব প্রশ্ন ও অনুরোধের পিছনে কী আন্তরিকতা, কী আত্মীয়তা! কত দাবি, কত জোর! ফরাসডাঙার ধুতি আর শান্তিপুরের শাড়ির মতো হলুদগাঁয়ের গাড়িরও একটা স্থানীয় পরিচয় আছে। মাদ্রাজ মেলের বা পাটনা প্যাসেঞ্জারের, টালিগঞ্জের ট্রামের বা বেহালার বাসের এ-ধরনের পরিচয় আছে কি ?

গরুর গাড়িতে পথ চলার কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা! পথ অনেক সময় পথহীন—দশ হাত নিচে নামতে হবে আবার বারো হাত ওপরে উঠতে হবে। নদী সরে গিয়েছে—নদীগর্ভে বালি আর বালি। সেই বালি ভেঙে অপর পাড়ে উঠতে হবে। উঠছি তো উঠছিই। ক্লান্ত বলদ চড়াইয়ের পথে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। সম্মুখে তাকিয়ে মনে হয় আর বুঝি পথ নেই, শুধু আকাশ। তারপর সতর্ক ক'রে দেয় গাড়োয়ান—"বাবু, হুঁশিয়ার। এইবার 'হড়-গড়া' (গড়ানে রাস্তা), ছইয়ের দুদিক খুব শক্ত ক'রে ধরে বসুন। নইলে পিঠে ঝাঁকুনি লাগবে নয়তো পাঁজরে ব্যথা পাবেন।" ধাক্কা খেতে খেতে ঘেমে উঠি। কিছুক্ষণ বাদে সমতলের সহজ গতিতে শরীর স্নিগ্ধ হয়। সামনের দিকে বেশী এগিয়ে বসলে গাড়োয়ান বলে 'দাবা' হচ্ছে অর্থাৎ গরুর কাঁধে চাপ পড়ছে। পেছনের দিকে বেশী পেছিয়ে বসলে শুনি 'ওলা' হচ্ছে অর্থাৎ গরুর গলার দড়িতে টান পড়ছে। অদ্ভুত

গাড়োয়ানের ভাষা। শুধু তাই নয়। সে গরুকে বোঝে, গরুও বোঝে তাকে। গায়ে আস্তে আস্তে হাত বোলানো, ন্যাজ মলা, পা দিয়ে পেটে খোঁচা দেওয়া, পাঁজরে পাঁচনের গুঁতো মারা, শিঙে পাঁচনের আঘাত করা, মুখে নানারকম শব্দ করা—এ-সব আচরণের অর্থ অনুযায়ী অবিকল কাজ করে মূক ভারবাহী জীব। গাড়োয়ান গরুর বন্ধু—আত্মীয়—সুখদুঃখের অভিভাবক। গরু গাড়োয়ানের নির্ভরযোগ্য অনুচর—অনলস আদেশপালক। সেই তো তারিফ করে গাড়োয়ানের দেহতত্ত্বের গান সকলের চেয়ে বেশী।

ঝমঝম শব্দে রানার ছুটে যায় গাড়ির পাশ দিয়ে। গাড়োয়ান হেঁকে বলে—"হরকরা মশাই, একটু দাঁড়ান, একটা বিড়ি খেয়ে যান।" হরকরা যে সে লোক নয়—ভারত সরকারের চাকুরি করে। তার যথেষ্ট সম্মান আছে গ্রামাঞ্চলে। গাড়োয়ানের ডাক সম্ভ্রমপূর্ণ। রানার দাঁড়ায়, হাসিমুখে কথা বলে। বিড়িতে টান দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করে —"কিছু বলবার আছে?" গাড়োয়ান সংকুচিতভাবে বলে—"মা ঠাকরুনকে বলবেন আমরা ছাড়ি গঙ্গা পেরিয়ে এসেছি, আলোয় আলোয় ঘরে পৌঁছব।" রানার বলে —"তোমাকেও একটা কাজ করতে হবে, ভাই। মাস্টারবাবুর জন্যে দুগণ্ডা হাঁসের ডিম কিনে নিও বাবুয়ডাঙার বাগদিপাড়া থেকে। নবীন নগরের হাটে কিনতে ভুলে গিয়েছি।"

রানার অদৃশ্য হয় পদচিহ্নহীন প্রান্তরে। শীঘ্রই নতুন অবস্থার সম্মুখীন হই। গাড়োয়ান মুখে খাপছাড়া শব্দ করে—'চু' 'চু' 'চু'। অমনি গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। যে মাঠে এতদিন গাড়ির 'নিক' (মাটির ওপর চাকার দাগ) ছিল সেখানে সরষে বোনা হয়েছে। গাড়ি ঘোরাতে হবে। আধ-ঘণ্টা ঘোরার পর আবার বিপদ। সামনে বাবলা কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা মুলোর ক্ষেত। ক্ষেতের মালিক মাথা হেঁট ক'রে বলে—"কি করব ভাই, একদম নিরুপায়। দিনকাল বড় খারাপ। পেট তো চালাতে হবে।" না ফিরে গত্যন্তর নেই। নিছক সময় নষ্ট। হয়তো খানিকটা মেজাজও নষ্ট। ভগবান জানেন কখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছব! কিন্তু গরুর গাড়িতে চলার নাটকীয় দিকটা একবার ভেবে দেখুন তো। ছমাস অন্তর না হয় বছর অন্তর পথ বদলায়। অভাবনীয় বার বার তার রহস্যদ্বার খুলে অভিনন্দন জানায়।

গরুর গাড়িতে যেতে যেতে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সংসারের জীবনযাত্রা যেমন দেখতে পাওয়া যায় রেলে মোটরে যেতে যেতে তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। দ্রুতগামী যান থেকে মনে হয় গাছপালা ঘরবাড়ি মানুষজন গারুবাছুর—সব যেন উল্টো দিকে ছুটছে, পালাচ্ছে, লুকোতে চাইছে দৃষ্টির অন্তরালে। দ্রষ্টার মানসপটে তাদের আংশিক অস্পষ্ট রূপের ছাপ পড়ে। ধীরগামী যান থেকে ধরা পড়ে তাদের স্পষ্ট সমগ্র রূপ। তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে কাছে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় দূর দিগন্তে। চকিতে পরের বউকে দেখা আর নিভৃতে ঘরের বউকে দেখা—পার্থক্য অনেকখানি বই কি। স্ন্যাপসট-বিলাসীরা রেলে মোটরে বেড়িয়ে তৃপ্ত হন কিন্তু চিত্র-বিলাসীরা গরুর গাড়িই ভালোবাসেন। রেল-মোটর-প্লেন-যাত্রীর কাছে গন্তব্য স্থান মুখ্য, গন্তব্য পথ গৌণ। যিনি ভ্রমণ করেন

গরুর গাড়িতে তাঁর কাছে পথই প্রধান, পথের শেষ নয়। রেল-মোটর-প্লেন-যাত্রীর চোখে ভাসে ভিল্লাই বা রৌরকেল্লা, মাইথন বা ম্যাসাঞ্জোর; তিনি স্বপ্ন দেখেন তাজমহলের, অজন্তা-ইলোরার, নর্মদার মর্মর শৈলের। গরুর গাড়ির যাত্রী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে যেতে দেখেন শিশিরে কেমন স্নান করছে আকন্দ, রৌদ্রে কেমন ঝলমল করছে অশ্বত্থের রেশমী পাতা, পলাশ কেমন বসন্তের জয় ঘোষণা করছে দিক্‌মণ্ডলে রঙ ছড়িয়ে দিয়ে; তিনি শোনেন দোয়েলের শিস, কোকিলের কুহু কুহু, পাপিয়ার পিউ পিউ; অনুভব করেন কবির কথার সার্থকতা :

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়।
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

গরুর গাড়ির সঙ্গে আমার জীবনের কত স্মৃতিই না জড়িত! গরুর গাড়িতে চড়ে মিত্তিরদের মেয়ে কঙ্কাবতী কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়েছিল। জমিদারদের ছেলে বিলাসচন্দ্র গলায় মালা পরে কপালে চন্দনের ফোঁটা নিয়ে হাসিমুখে বরের গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল শোভাযাত্রার পুরোভাগে। ঠাকুরমার শেষ অসুখের সময় ডাক্তার এসেছিলেন সুধাকরপুর থেকে গরুর গাড়িতে ওষুধের বাক্স নিয়ে। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ি ক'রে আমাদের ইস্কুল দেখতে আসতেন ইন্সপেক্টার হিমাদ্রি মুখুজ্যে। জগদ্ধাত্রী পূজার আগে গাড়িতে দু-সারি বড় বড় পেতলের ঘড়ায় গঙ্গাজল ভর্তি ক'রে মুখে থোড়ের ছিপি এঁটে নিয়ে আসত খোসালপুরের ঘাট থেকে আমাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য বেহারী। পাঁচ সাত খানা গাড়িতে সাজ-সজ্জা মাল-পত্তর নিয়ে নামকরা 'নহুষ উদ্ধার' পালা অভিনয় করতে এসেছে পাটুলির বলরাম দাসের যাত্রার দল। আমাদের গ্রামের 'মেবার পতন' অভিনয় দেখতে এসেছেন গরুর গাড়ি ক'রে ঘোড়াইক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকেরা।

গরুর গাড়িতে যেতে যেতে নজরে পড়েছে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী, 'পোস্ট মাস্টার,-এর রতন, 'পল্লীসমাজ'-এর বনমালী পাড়ুই, 'পথের পাঁচালী'-র ইন্দির ঠাকরুন, 'রাই কমল'-এর কমল—কথা-সাহিত্যের আরও কত নায়ক-নায়িকা। সন্দেহজনক-ভাবে গাড়ির অনুসরণ করেছে 'ইছামতী'-র হলা পেকে-র মতো মানুষ। কখনও কখনও সাপুড়ে ও বহুরূপীর পাল্লায় পড়েছি। গহন বনে ভাঙা বাড়ি দেখে মনে পড়েছে বাংলার অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবী বীরদের যাঁরা গেয়েন্দার দৃষ্টি এড়িয়ে আত্মগোপন ক'রে দিন কাটিয়ে-ছিলেন এই রকম নির্দয় নির্জনে। কোন কোন শুভ মুহূর্তে অসীমকে উপলব্ধি করেছি, অজানার বীণা শুনেছি। আভাস পেয়েছি সৃষ্টির গূঢ় রহস্যের। গাছকে মনে হয়েছে কবিতা, নদীকে গান, মাঠকে গল্প, আকাশকে উপন্যাস।

নতুন যুগের শঙ্খ বেজেছে। ট্রেন চলছে, মোটর ছুটছে, প্লেন উড়ছে। গরুর গাড়ির আমল চলে গেল চিরদিনের মতো! সেই সঙ্গে বাংলা দেশকে দেখবার একটি বিশিষ্ট বাতায়নও বন্ধ হয়ে গেল !!

কয়েকটি কবিতা

লেখা চট্টোপাধ্যায়
চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

তুমি এলে

মাঝে মাঝে পৃথিবীর রঙ্ মুছে যায়
মেঘ-ডাকা কালো ঝড়ে ধুয়ে যায় আকাশের আলো—
তবু তুমি কোথা হ'তে আনো রঙ্, আনো ভালোবাসা,
কোথা থেকে আলো সুধা ঢালো ?

পৃথিবী দু'হাত ভ'রে মুঠো মুঠো সোনা শুধু ঢালে
ডালে ডালে, নরম মাটিতে,
সবুজের ডানা মেলে উড়ে যায় টিয়ে হরিয়াল,
চড়ুই উৎসবে মাতে গোলাঘরে, ধানের আঁটিতে।

এই মনে বড়ো ভীড় ; নোট খাতা বই ও কলম—
নানারকমের দাবী নানাভাবে ভ'রে রাখে মন
তবু রঙ্ জাগে বুকে—রামধনু ! বৃষ্টির আকাশ !
সব ভীড় দূরে ঠেলে তুমি এসে দাঁড়াও যখন।

স্বপ্ন

সারাদিন বেশ কাটে, হাসি গানে কথায় কথায়,
তারপর রাত্রি হ'লে থামি। মনে হয় মূঢ় বেদনায়
কী যেন কী হারিয়েছি—যাকে আর ফিরে পাওয়া ভার :
সারা রাত তাই ভেবে কাটে। তোমার আমার
সকলের সব কথা থেমে গেলে হেঁটে আসে যারা,
ছায়ার মতন যারা, গানের মতন যার সুরেলা ইশারা
তারা আসে, জানালায় হাওয়া খেলে,
হাওয়া খেলে একা বিছানায়—
চোখ খুলি, দেখি তারা মিলাল কোথায়।

বেদনার জন্ম

কেন যে বেদনা বেড়ে যায়।
আমার আকাশ ভরে বেদনার মেঘ জমে,
পালে লাগে অশান্তির হাওয়া—
অন্ধকার থমথমে,
মেঘ জমে
আমার ঘরেও,
হাওয়া পেয়ে হঠাৎ সে ঘর
মেঘ হ'য়ে উড়ে যায় দূরে—
চোখের পাতায় ভ'রে জল আনে
মনে মনে সুর বাজে আশ্চর্য নূপুরে।

কেন ওরা বেদনা বাড়ায়?
নীলফুল ছায়া ফেলে দেয়ালের গায়—
জানি আমি, ওরা চমকায়
নীলের নেশায়,
সারা গায়
নীল ছায়া মেখে নিয়ে আমার দেয়ালও
কোথায় হারিয়ে যাবে—
দূর পাহাড়ের গানে
কেঁপে কেঁপে হৃদয় মেশাবে।

তোমরা যে হাসো কাঁদো, ভালোবাসো
তারি ছায়া মেঘে মেঘে ভাসে—
আনন্দিত বেদনার মেঘ দেখে
আমার যে চোখে জল আসে।

আমরা যা চাইছি

থাক থাক আর কিছু চাই না—
এ মনের সমুদ্র শান্ত।
যা দেখেছি সব-কিছু বলো না
বলো বলো বলো—সব ভ্রান্ত।

যন্ত্রণা যত দিলে নিষ্ঠুর—
আমাদের পৃথিবী তা সইল,
সব কথা মুছে গিয়ে একথাই
চুপি চুপি মনে জ্বলে রইল ?

এবার দাও না তবে ক্ষান্ত
আর কিছু দয়া সে তো চায় না—
যা দিয়েছ সবি নাও ফিরিয়ে
হিংসার ঈর্ষার হায়না।

পঞ্চমাঙ্ক

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ বর্ষ, ইংরাজী

প্রতি বছর একইভাবে দিনগুলো ফিরে আসে। কালবৈশাখীর কথা যখন স্মৃতি হয়ে যায়, দিনের পর শুকনো দিন যখন শহরের সমস্ত রূপ শুষে নিয়ে তাকে এঁটো আর অশুচি করে রেখে দেয়, তখন সব নাগরিক উন্মুখ হয়ে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করে। বর্ষাকাল যে তার আনুষঙ্গিক দুর্দশা বাদ দিয়ে আসবে না, তাও ভুলে যেতে ভালো লাগে।

শুধু যে আষাঢ় মাস কিছুটা এগিয়েছে তাই নয়, আবহাওয়া বিভাগের নির্দিষ্ট তারিখও অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও শহরের কপালে ছিটেফোঁটাও জোটে নি। দুঃসহ রোদ্দুরের মধ্যে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে একটি দোকানের বৈকালিক কার্যারম্ভ দেখছিলো সুহাস। দোকানের মালিক শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভটা বুলিয়ে নিয়ে আকাশের কোণগুলো ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। আর তারপর যেন সেখানে আশাপ্রদ কিছু না পেয়ে একটা ছোট বালতি থেকে জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন ফুটপাথে। জলের ঠাণ্ডা স্পর্শ উত্তাপকে পুরোপুরি তাড়াবার আগেই সুহাস মনে মনে বললো, ওই যে আমার বাস আসছে ; জানলার ধারে জায়গা পাবো কি ?

জানলার ধারে এই সীট্‌টায় কি রোদ্দুর ! ঘামে আস্বস্তি, গলায় তেষ্টা। আজ কি করবো আমরা ? গিয়েই নমিতার কাছে জল চাইবো এক গেলাস। আজ কি সেই নীল শাড়িটা

পরেছে ও? কি করবো, কি করবো আমরা? জানি এ প্রশ্ন নিরর্থক; কিছুই শক্ত হবে না সময় কাটানো। যখন সময় পেরিয়ে যাবে, জানবোও না কিভাবে গেলো কোথা দিয়ে। প্রতীক্ষিত বৃষ্টি হয়তো নামবে আজই বিকেলে। তাহলে কি তাকিয়ে থাকবো সিক্ত পথের দিকে, দেখবো আকাশে তাকিয়ে ঘনঘটা? নমিতা কি আজ গান গাইবে,—রবীন্দ্রসঙ্গীত? কিংবা এসব কিছু ঘটবার নয়। গত সপ্তাহ নিরাশায় গেছে, কে বললো আজই বর্ষণ হবে, সকলের আশা পূরবে, শহর ঠাণ্ডা হবে, শান্ত হবে? শহর যদি বাইরে পচে ক্লেদমুক্তির ব্যর্থ আশায়, তাতেই বা কি? প্রাচীর তুলবো বন্ধ খড়খড়ির, স্বল্পালোকিত ছায়াচ্ছন্ন দু-তলার ঘরে। সূর্য ডুববে, জানলা খুলবে, হাওয়া বইবে, কি গুমোট থাকবে। এ-কথা ও-কথা সে-কথার পরে চুপ করবো, নমিতা থামবে। চুপচাপ বসে বাইরে তাকাবো। তবুও শান্তি নামবে, অন্য শান্তি—অবসাদে যে-শান্তি থাকে, সেই।

আজ এই মেঘলা দিনে নমিতার সঙ্গে বসে থাকতে থাকতে তাদের দুজনের অতীতকে একটা সুসংবদ্ধ, স্তরীভূত ইতিহাসের মতো দেখতে পেলো সুহাস। যখনই নমিতার বা নিজের কোন সাহসিক পদক্ষেপে তাদের প্রেমের এক অধ্যায় শেষ হয়ে আর একটার সূচনা হয়েছে, তখনই অতীতের আপাতবিচ্ছিন্ন অণুপুঞ্জের মধ্যে এই বিন্যাস, এই ক্রমান্বয় তার চোখে পড়েছে। হারিয়ে-যাওয়া আবেগেরা চেনা পথে ফিরে এসেছে আবার: এবারে আর সেই প্রথম বারের চমক নেই অবশ্য, নেই সেই অবশ-করে-দেওয়া উচ্ছ্বাস; বরং অনেক সংযত, সংহত, সচেতন চিন্তায় জারিত, সেই কারণে কিছুটা যেন রচিত, আরোপিত; কিন্তু আরও ইঙ্গিতবহ, আরও প্রতিশ্রুতিময়, আরও ফলপ্রসূ।

প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই এই। প্রথমে অবিশ্বাস, শুধুই অবিশ্বাস, প্রতিরোধ, কেবল প্রতিরোধ। তারপর মোহের ইন্দ্রজাল, কামনার শিহরন। তারপর সে-জোয়ার সরে গেলো নতুন এক মৃত্তিকার জন্ম দিয়ে: নরম বটে, কিন্তু নরম বলেই উর্বর। এইভাবে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের পাতা উল্‌টে গেলো সুহাস, একটা উপন্যাসের মতো পড়ে গেলো নিজের জীবনকাহিনী। নিজের আর আরেকজনের। কেননা যতোই এগোতে লাগলো কাহিনী, ততোই তারা পরস্পরের সহায়তা বেশি করে পেতে লাগলো। একজনের মনে আবেগ আর চিন্তার সংমিশ্রণ যেই একটা সংস্থিতি আনলো, অমনি সে বুঝলো, অন্যের মনেও সেই একই রূপান্তরের খেলা চলছে। সুহাস নমিতাকে বললো, সে বুঝেছে। নমিতা সুহাসকে বললো, সে বুঝেছে। তখন আর মুখরতাকে প্রগল্‌ভতা মনে হলো না, উচ্ছ্বাসকে ফাঁকা ঠেকলো না, নিস্তব্ধতাকে বিড়ম্বনা বলে বোধ করলো না কেউ। পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে তারা আবার সচেতন হলো, কিন্তু এবার আর অসহ্য লাগলো না। কেন-না, তখন তারা সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে, যেখানে কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, সুহাস ভাবলো। আমি বুঝেছিলাম। আমি জানতাম যে এইখানে শেষ নয়। সেই তীব্র সংরাগ আবার ফিরে আসবে তার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত

শিহরন নিয়ে। আর তাকেও আমরা বরণ করে নেবো যেমন করে পরিপার্শ্বকে বরণ করে নিয়েছি। আমি জানতাম। কিছু কখনো ভাবি নি যে, সে-মুহূর্ত যখন আসবে তখন আমি প্রস্তুত থাকবো না। আজ যদি মেঘ না জমতো শহরের ওপরে। মনটা যদি হাতের বাইরে চলে না যেতো। অপেক্ষিত মুহূর্ত আজই এলো কেন?

নমিতা ভাবলো, সুহাস প্রস্তুতির কথা বলছে। কিন্তু আমি তো সে-কথা কখনো ভেবে দেখি নি। সেদিন বুঝি নি; আজও না বুঝেই ওকে আহ্বান জানিয়েছি। ও সাড়া দিতে পারছে না। আর কিছু করবার নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।

কাজেই সুহাস নমিতাকে বোঝাতে পারলো না। নমিতা খুব মনোযোগ দিয়ে সুহাসের কথা শুনলো। বুঝবার চেষ্টাও হয়তো করেছিলো। অন্তত সুহাস স্পষ্ট অনুভব করেছিলো, সে তার পুরোনো প্রেমিকের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে চাইছে। অবিকল দৃষ্টিভঙ্গীতে সুহাসের মতামত বিচার করে নিখুঁত রায় দিতে চাইছে। সুহাস বুঝছিলো সবই। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও তার মনে আসছিলো যে নমিতার সব প্রয়াস বিফলে যাবে। সুহাস ভাবলো, ও বৃথাই নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছে; ও তালা ভেঙে ফেলতে পারে, কিন্তু যে-মসৃণতা সমস্ত যান্ত্রিক কৌশলকে ব্যর্থ করে আমাদের প্রার্থিততম দরজা খুলে স্মৃতি-বিস্মৃতিকে এক জায়গায় মেলায়, তা আর কি করে ফিরে পাবে? অথচ দেখো, রোজকার মতোই আমার সামনে সেই পরিচিত আড়ষ্ট ভঙ্গীতে বসে আছে। মুখ নীচু করে আমার কথা শুনছে, যেমন শোনে। আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর কাল্পনিক নকশা তৈরী করছে, যেমন করে। বিনুনি দোলায় নি আজ, উঁচু করে খোঁপা বেঁধেছে। ভীষণ ইচ্ছে করছে ওর অনাবৃত শুভ্র ঘাড়টা দেখতে। যদি পাশাপাশি বসতাম আমরা, তাহলে হয়তো সেই ঋজু প্রত্যঙ্গের ভাস্বরতা আমাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারতো। হয়তো ওকে বোঝাতে পারতাম। পারতাম না? বোধহীন অনিশ্চয়তা প্রতি পলে কবর দিচ্ছে আমাদের। বৃথাই আমরা মৃত্তিকার শ্বাসরোধী শত্রুতাকে ঠেলে ফেলতে চাইছি। আমরা কেন ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান আছেই, সারাক্ষণই ছিলো? না ভুললে কি এতো উগ্র হতো আজকের প্রতিরোধ? আমরা শুধু মুখোমুখি বসে ধীরে ধীরে নিজেদের যন্ত্রে রূপান্তরিত হতে দেখছি। আমি যদি হাসি, কোন অদৃশ্য হাত চাকা ঘোরাবে, ওর মুখে হাসি ফুটবে। ও যদি কাঁদে, কোন অদৃশ্য কাঁটার স্থানাঙ্ক-পরিবর্তনে আমার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পাবে।

ফলে পনেরো মিনিট পরে সুহাস নিজেকে এক অসহায় অবস্থায় আবিষ্কার করলো। নমিতার উষ্ণ আলিঙ্গনের প্রত্যুত্তর দিতে পারলো না সে, শুধু দু-হাতে তাকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘরে আলোর প্রয়োজন। পশ্চিমের মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আধখানা সূর্য জানলায় শার্সিতে রক্তিম আলো ফেললো, ঘরের অন্ধকারকে তরল করলো। সুহাস ভাবলো, এইভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে কি নমিতা বুঝবে যে ওই অপার্থিব আলো আমাদের শবাধারকে রাঙিয়ে দিচ্ছে?

সেদিন রাত্রে রাস্তায় লোকচলাচল কমে যাবার পর বৃষ্টি নামলো কলকাতায়। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টির শব্দ শুনবার পর সুহাস ঘুমিয়ে পড়লো। অনেক রাতে একটা স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে গেলো। অন্ধকারে চোখ মেলে ঘড়ির নিঃসঙ্গ, একঘেয়ে ধ্বনিটা শুনলো কিছুক্ষণ। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলো। হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে জানলাটা খুলে দিতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার মুখে আঘাত করলো। অনেক দূরে একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেলো।

স্বপ্নের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য গান শুনেছিলো সুহাস। কথাগুলো বোঝে নি। শুধু অশরীরী সুরটা তার চারপাশে ঘুরছিলো। ক্রমে সেটাও অস্পষ্ট হয়ে এলো। শুধু মিলিয়ে যাবার আগে তার রেশ অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে লাগলো ঠাণ্ডা বাতাসে।

পঁচিশে বৈশাখ ও আমরা

পূরবী মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান

"চির নূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ"—পঁচিশে বৈশাখ আমাদের নিয়ে চলেছে নিত্য নতুন পথের পানে, জীবনের ডালি ভরে উঠছে পঁচিশে বৈশাখে নব নব প্রজ্ঞার আলোকে। পঁচিশে বৈশাখ মানবমনের পূর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথ মহান পুরুষ, অসীম তাঁর মনের ব্যাপ্তি, তল পাওয়া যায়না বুঝি সে গভীরতার। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ আমাদের খুব কাছের মানুষ, এত নিকটে আসতে পারে না বুঝি একান্ত প্রিয়জনও। তাই প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ আমাদের কাছে আসে নতুন রূপে, কবিকে প্রত্যক্ষ করি আবার নতুন ভাবে, নতুন আলোকে। জীবনের প্রতি স্তরেই কবি আমাদের প্রাণে 'নব নব রূপে, গন্ধে বরণে ছন্দে" ধরা দেন।

* * * *

যখন ছিলাম শিশু, মন চলে যেত 'সকল উদ্দেশহারা, সকল ভূগোলছাড়া', অপরূপ অসম্ভবের দেশে, যখন ভাঙ্গা কাঠের খেলনা আর মাটির ঢেলা ছিল পরম সম্পদ, সেই সময় সেই রূপকথার দেশের শিশুর মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা, একান্তই মনের কথাটি এত দরদ ভরে ব্যক্ত করেছেন সে কোন্ কবি? সেদিনের পঁচিশে বৈশাখে কে যেন খোকার একান্তই মনের প্রশ্নটি মা'কে শুধায়—

"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমাকে ?"

কিন্তু পরক্ষণেই শিশু ভোলানাথের মন চলে যায় অন্য জগতে—

"তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়—
একেবারে উড়ে যায়, কোথা পাবে পাখা সে।"

পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে শৈশব এগিয়ে চলে কৈশোরের পানে।

জগতের সব কিশোরের মনের কথা একটি মানুষ তাঁর মনোবীণার তারে তুললেন বাজিয়ে—

"মনে করো যেন বিদেশে ঘুরে,
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে—

* * *

এমন সময়, 'হা রে-রে-রে'
ঐ কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে",

নবীন কিশোরের এই যে 'বীরপুরুষের' কল্পনা, তাকে এমন সুন্দর রূপ দিয়েছেন আর কে ?

কিশোর বালক নিজের মনের জগতে আপন মনেই করে বিচরণ, মনের কোন তার ভরে উঠে 'খেয়াল খুশীর, সত্য মিথ্যার' কল্পনায়—তাই কবির কিশোর মন বলে,—

"পৃথিবীটি কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে, তারাও দুপুর বেলা একলা জানলার ধারে বসে ওই ডাক শুনতে পায়। পণ্ডিতেরা বুঝি সে ডাক শুনতে পায় না ?"

কিশোর শিশু 'ফুলের গন্ধের অদৃশ্য পথের ইসারা বেয়ে' এসে পৌঁছায় যৌবনের পুষ্পাচ্ছাদিত রাজপথে। জীবন ভরে উঠে সজীবতায়, উদ্দামতায়। যৌবনের উদ্দাম বেগে জীবনসমুদ্রে বিপুল তরঙ্গরাশির খেলা চলে, এই বিশালতার কূলে থৈ পায় না তরুণ মনের স্বপ্ন। মনের রুদ্ধ ভাবাবেগ মনের মাঝে প্রকাশের পথ পায় না বুঝি খুঁজে। সেই সময় আর এক পঁচিশে বৈশাখের প্রাতে 'ছায়াবীথি তলে' কবির বীণায় বেজে ওঠে তাদের 'না বলা বাণী', আর—

"সেই গান শুনি,
কুসুমিত তরুতলে তরুণ-তরুণী
তুলিল অশোক—
মোর হাতে হাত দিয়ে তারা কহিল,
'এ আমাদেরি লোক'।"

উদ্দাম যৌবনের ভাবাবেগে কবির তরুণ মনে জেগে উঠে,—

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
* * *
ডানা মেলে দেওয়া মুক্তি প্রিয়ের কূজনে দুজনে তৃপ্ত
আমরা চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত॥"

জীবনের স্বর্ণক্ষেত্র যৌবন, নিত্য নব কর্মপ্রেরণায় সাড়া দেয় মানুষ, 'জীবনের রণক্ষেত্রে' প্রস্তুত হয়, অলক্ষ্যে ভেসে আসে প্রেরণার বাণী, দিকে দিকে চলে 'সবুজের অভিযান'। কবির বিপুল প্রাণাবেগের তরঙ্গ, চিরন্তন কর্মপ্রেরণা ছুটে চলে বাধাবিঘ্নহীন পথে। কবির উদাত্ত কণ্ঠস্বর মানবহৃদয়ে নিয়তই ধ্বনিত হয়—

"ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ কারা, আঘাতে আঘাত কর
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান, জগতে তখন কিসের ডর?"

তাই তরুণ মনে পঁচিশে বৈশাখ এনে দেয় এক স্বর্গীয় আলোক, জীবন চলে পরিপূর্ণতার পানে।

নবযুগের কবি কালের গতির সঙ্গে সমান বেগে চলেছেন। জীর্ণসংস্কারমুক্ত কবি, উদারচেতা কবি নবযুগের তরুণীমনের বাণীটিকে ব্যক্ত করেন—

"হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর বাজে রুদ্র বীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে,
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে কণ্ঠ হতে—
নির্বারিত স্রোতে॥"

'জন্মদিনের ধারা বেয়ে চলে মৃত্যুদিনের দিকে', 'পঁচিশে বৈশাখ তারপর দেখা দিল আর এক কালান্তরে।' যৌবনের পথ এসে মেশে জীবনের সায়াহ্নের পথে। মানুষ বাস্তব জীবনের লেনা দেনা মিটিয়ে অসীমের পানে দৃষ্টিপাত করে। জীবননদীতে খেয়া তরী বেয়ে এগিয়ে চলে মানুষ অনন্তের সন্ধানে। জীবনের এই শেষের দিনে মানুষ অনুভব করতে চায় আপনার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ, কবি বলেন তাদেরই মনের কথা—

"ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি,
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, এই তো সবই সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে, জীবন আমার ভরে উঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি, হাতের কাছে সকল পুঁজি॥"

তাই মানুষ যখন শেষ প্রহরের ঘণ্টা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব, তখনও তার কাছে পঁচিশে বৈশাখ চিরনূতন। জীবনের হিসাব-নিকাশ, লাভক্ষতির কিনারা পায় না এই যাবার দিনে, তখন তার

একান্তই অবলম্বন জগৎপিতার করুণাঘন মূর্তি, অসীমের সঙ্গে সীমার যোগসূত্র ঘটিয়ে কবি গান—

"সারা পথের ক্লান্তি আমার, সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাবো যে খুঁজে না পাই দিশা।
* * *
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে
ধরবো তারে, ভরবো তারে, রাখবো তারে সাথে।
একলা পথের চলা আমার করবো রমণীয়॥"

এমনি করে সকল কালে, সকল মানুষের মনের কথাটি চিরনতুন হয়ে ব্যক্ত হয় পঁচিশে বৈশাখের পুণ্যপ্রাতে। কবিপ্রাণ মিশে যায় সবার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। আমরা আমাদের আপন মনেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই কবির গানে, কবির কাব্যে। জীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার সঙ্গে মিশিয়ে নিই কবিমনকে। আপামর সাধারণ কবিমনের দুয়ারের পথ বেয়ে নিজেকে প্রত্যক্ষ করে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বেজে উঠে নব নব রাগিণী, মানুষ পূর্ণতার সন্ধান পায়, সাফল্যের পানে এগিয়ে যায়। তাই তো পঁচিশে বৈশাখ 'চিরনূতন' আমাদের কাছে, পঁচিশে বৈশাখ একান্তই আমাদের। আমাদের ভালবাসা আর শ্রদ্ধার সঙ্গে মেশে কবির মহান ভালবাসা—যে ভালবাসা মানুষকে নিয়ে যায় অনন্ত আলোকের পানে। তাই চিরনবীন কবি আমাদের সুরে সুর মেলান, হৃদয়বীণার তারে সুর বেঁধে গেয়ে যান—

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরি লোক—
আর কিছু নয়
এই হোক শেষ পরিচয়।"

হে অতীত, কথা কও

সব্যসাচী সেনগুপ্ত

তৃতীয় বর্ষ, ইংরাজী

অতীত, তুমি রহস্যময়ী। তোমার করাল গহ্বরে তুমি গ্রাস করে ফেলেছ একাধিককে। যাদের নাম ছিল একদিন দিকে দিকে প্রচারিত, তারা আজ তোমার অন্ধকারায় বন্দী। মানুষ ভুলে গেছে তাদের নাম। ইতিহাস মুছে ফেলেছে তাদের স্মৃতি। মহাকাল গ্রাস করে ফেলেছে তাদের কীর্তি। গৌরবসূর্য হয়েছে অস্তমিত; পূর্ণশশাঙ্ক হয়েছে স্তিমিত। অয়ি রহস্যময়ি, অবগুণ্ঠন মোচন কর, তুলে ধর তাদের যারা আজ স্মৃতি থেকে নির্বাসিত।

কেন তোমার এই আচরণ? কই সবাইকে তুমি তো মুছে ফেল নি! যারা শঠতা করে, ছলনা করে, প্রতারণা করে ক্ষমতার উত্তুঙ্গে উঠেছিল, তাদের তো তুমি শাস্তি দাও নি! মানুষের মনে তারা আজও রাজত্ব করছে সগৌরবে। মহাকালের শাসন তারা হেলায় উপেক্ষা করেছে। অতীত, তোমার গতি সেখানে রুদ্ধ কেন? কেন তুমি তাদের প্রতিষ্ঠা করেছ?—তোমার ছলনা দুর্বোধ্য, তোমার আচরণ দুর্জ্ঞেয়, সত্যই তুমি রহস্যময়ী।

ওগো ছলনাময়ি, মিনতি রাখ; একবার, শুধু একবার তুলে ধর তোমার গুণ্ঠন। দেখতে দাও বাংলার প্রাচীন গৌরব, নয়ন করি সার্থক। সপ্তম শতকের গৌড়ের সেই গৌরবময় ইতিহাস। শত্রুর রাজ্যবর্ধক সম্প্রসারিত হাতকে পরাস্ত করে, ঈর্ষান্বিত প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করে, হর্ষবর্ধনের হতাশাবর্ধন গৌড়ের পতাকা সগৌরবে উড্ডীন। আর্যাবর্ত তখন একটি শক্তির কাছে প্রতিহত। নামে শশাঙ্ক হলেও সেই শক্তি দিবাকরের দীপ্তিতে ভাস্বর। কিংবা ভারতের আকাশে তখন পূর্ণচন্দ্রের গরিমা।

মগধের গুপ্তবংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী শশাঙ্কগুপ্ত জ্ঞাতিভাই মালবাধিপতি দেবগুপ্তের সঙ্গে প্রবল পরাক্রমে কনৌজ আক্রমণ করলেন। সেই সম্মিলিত আক্রমণের সামনে কনৌজরাজ গ্রহবর্মন ভেসে গেলেন। এই কাহিনী সকলেরই সুবিদিত। গ্রহবর্মন নিহত হলেন। থানেশ্বরের রাজকন্যা, কনৌজের রানী রাজ্যশ্রী হলেন শত্রুহস্তে বন্দিনী। হিউয়েন সাঙ্ বলেছেন, অত্যাচারী, অমিতাচারী, পরধর্মদ্বেষী নৃপতি শশাঙ্কের কবল থেকে কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যশ্রী পলায়ন করলেন।

হে অতীত, আর নীরব থেকো না, কথা বলো। সত্যকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হতে দাও। বলো চৈনিক পর্যটক ভ্রান্ত কাহিনীর অবতারণা করেছেন। রাজ্যশ্রী পলায়ন করেন নি।

অন্ধকার কারাগারের এক কোণে দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন হতশ্রী রাজ্যশ্রী। মলিন বসন, সারা অঙ্গে কালিমা, গৌরতনু বিষাদাক্রান্ত। ভাগ্যের আকস্মিক বিপর্যয়ে বিমূঢ়া পরাক্রমশালী রাজা প্রভাকরবর্ধনের দুহিতা।—হঠাৎ কারাশৃঙ্খলের ঝনঝন আওয়াজ। নতুন কোন বিপদাশঙ্কা করে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন রাজ্যশ্রী।

এ কি? কারাদ্বারে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কে এই জ্যোতির্ময় পুরুষ—লাবণ্যময়, তরুণকান্তি, সুকুমার! মুকুট শিরোমণি রাজপোশাকে সজ্জিত; দুই চোখে চাঁদের স্নিগ্ধতা, মুখ করুণ, বিষণ্ণ।

—দেবি!

উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হল একটি স্বর। অনুরণিত হয়ে উঠল সমগ্র কারাকক্ষ। একি কোন দেবদূত—রাজ্যশ্রীর কষ্ট অপনোদন করতে নিয়ে যেতে এসেছেন তাঁকে স্বর্গলোকে? মুগ্ধ বিস্ময়ে, বিস্ফারিতলোচনে চেয়ে রইলেন রাজ্যশ্রী।

পরমুহূর্তেই প্রবল ঘৃণায় দারুণ ক্রোধে ভরে গেল তাঁর মন।

—দেবি, আমি শশাঙ্ক!

এই সেই শত্রু, যে হরণ করে নিয়েছে তাঁর সুখ-শান্তি ঐশ্বর্য-সম্পদ সব কিছু! ঠেলে দিয়েছে তাঁকে অন্ধকারায়! তাঁর চরম অমর্যাদার কারণ!

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও পারলেন না রাজ্যশ্রী। এও কি সম্ভব? এমন সুকান্তি, বরতনু যাঁর, যাঁর মুখে নেই সূর্যকিরণের প্রখরতা, আছে শুধু চাঁদিমার দীপ্তি, তিনি হবেন পরস্বাপহরণকারী, পররাজ্য আক্রমণকারী, পরপীড়ক? না না, এ যে অকল্পনীয়।

—দেবি, আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

—ক্ষমা? কিসের ক্ষমা?

—জয়োল্লাসের উন্মাদনায় দেবগুপ্ত ভুলে গেছে তার বিবেক, ভুলে গেছে নারীর মর্যাদা। তার হয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

ধীরে ধীরে রাজ্যশ্রী উচ্চারণ করলেন:

—ক্ষমা করার আমি কে রাজা? আমার কি আছে?

ক্ষোভে, অনুশোচনায়, লজ্জায় শশাঙ্ক মাটিতে মিশে যেতে চাইলেন।

—দেবগুপ্তের অপরাধ গুরু। তাই তার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত আমিই করতে চাই। আপনি এখন মুক্ত। বলুন দেবি, আপনি কোথায় যেতে চান। আমিই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। আপনার নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব আমার।

—রাজা, আমার মত হতভাগিনীর প্রতি আপনি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন, তাতেই আমি কৃতার্থ। আমি আর কিছু চাই না। দেখি ভূ-ভারতে কোথাও আমার দাঁড়াবার জায়গা আছে কিনা।

কারাগৃহ থেকে বেরিয়ে রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কনৌজের রাজরানী রাজ্যশ্রী। শশাঙ্ক হতবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পরদিন থানেশ্বরের প্রবল বাহিনী এসে কনৌজ আক্রমণ করল। স্রোতোমুখে তৃণখণ্ডের মত দেবগুপ্ত ভেসে গেলেন। যুদ্ধে তিনি হলেন পরাজিত ও নিহত। থানেশ্বরাধিপতি রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে কনৌজে প্রবেশ করলেন। ছুটলেন তিনি কারাগারের দিকে। তাঁর আদরের বোন রাজ্যশ্রী সেখানে বন্দিনী। তিনি জীবিত কিনা তা তাঁর অজ্ঞাত। কে জানে শত্রুরা হয়তো সরিয়ে দিয়েছে তাঁকে পৃথিবী থেকে, চরিতার্থ করেছে তাদের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি।

থামলেন এসে রাজ্যবর্ধন কারাগারের সামনে। খুলে গেল লৌহদ্বার। ছুটে গেলেন তিনি ভিতরে। কিন্তু ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কারাকক্ষে কোথাও কেউ নেই। খাঁ খাঁ করছে শূন্য কক্ষ। তবে কি ?—সুপ্ত সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজ্যবর্ধন বেরিয়ে এলেন। উঠে বসলেন ঘোড়ায়। বেগবান অশ্ব ছুটে চলল গৌড়ের দিকে। পেছন পেছন থানেশ্বরের বিরাট বাহিনী।

কিন্তু শশাঙ্ক নির্ভীক, স্থির, অটল। তাঁর সৈন্যদল নিয়ে প্রতীক্ষায় রইলেন রাজ্যবর্ধনের।

এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উভয় সৈন্যদল মিলিত হল। রাজ্যবর্ধনের মনে তখন প্রতিহিংসার আগুন জাজ্বল্যমান। স্বহস্তে তিনি শত্রুকে সমুচিত শাস্তি দেবেন।

রাজ্যবর্ধন শশাঙ্ককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। বিনা প্রতিবাদে শশাঙ্ক রাজী হলেন।

শুরু হল যুদ্ধ। দু'পাশে দুই সৈন্যদল আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। মাঝখানে দুই যোদ্ধা লড়াইয়ে মত্ত। শুধু শোনা যায় অসির ঝঞ্ঝনা। শূন্যে দুই তরবারিতে বিদ্যুৎ-ঝলক। দুই পক্ষের সুযোগসন্ধানী অস্ত্র এক-একবার এগিয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে আবার ফিরে আসে। যুদ্ধ চলে অবিরাম গতিতে।

হঠাৎ—

শশাঙ্কের তীক্ষ্ণধার অসি সজোরে বিদ্ধ করল প্রতিপক্ষের বক্ষ। রাজ্যবর্ধন বাধাদানের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন আক্রমণের আকস্মিকতায়। লুটিয়ে পড়লেন তিনি মাটিতে। উত্তপ্ত রক্তে সিক্ত হয়ে উঠল মাটি। একবার নিজ সৈন্যদলের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন রাজ্যবর্ধন। তারপর তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

থানেশ্বরে খবর পৌঁছল যথাসময়ে। হর্ষবর্ধন গৌড়জয়ের প্রতিজ্ঞা করলেন। শুভক্ষণে তিনি কনৌজ আর থানেশ্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। তারপরই তাঁর প্রধান কাজ হলো প্রতিজ্ঞাপালন।

হিউয়েন সাঙ্ বলেছেন, প্রয়াগের মেলায় হর্ষবর্ধন তাঁর সর্বস্ব এমন কি রাজপোশাক পর্যন্ত দান করে দিয়ে ছিন্ন বসন পরিধান করতেন।

হে অতীত, কথা কও। বলো, একথা কি সত্য নয় যে, হর্ষবর্ধন পররাজ্য জয় করতে চেয়েছিলেন!

থানেশ্বরের প্রবল বাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হানলো গৌড়ে। সুদৃঢ় প্রাচীরে প্রতিহত হল সেই আক্রমণ। শশাঙ্ক হিমাদ্রির মত অটল। গৌড় আপন গৌরবে গৌর।

হর্ষবর্ধন বুঝলেন সহজ পথে শশাঙ্ককে জয় করা অসম্ভব। তিনি কূটনীতির আশ্রয় নিলেন।

কামরূপে তখন রাজা ছিলেন ভাস্করবর্মন। হর্ষ তাঁর সঙ্গে মিতালী পাতালেন। উদ্দেশ্য উভয় দিক থেকে আক্রমণে শশাঙ্ককে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। ভাস্করবর্মনের সঙ্গে শশাঙ্কের সদ্ভাব ছিল না বিশেষ। তিনিও রাজী হলেন সহজেই।

কিন্তু শশাঙ্ক দমলেন না আদৌ। চর জানাল তাঁকে ভাস্করবর্মনের কথা।

শুনে শশাঙ্ক অট্টহাস্য করলেন—

—কে? কামরূপের কাপুরুষ ভাস্করবর্মন? সে হাত মিলিয়েছে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে! কি হাস্যকর! বেশ, আমি প্রস্তুত।

ভাস্করবর্মন কখনও শশাঙ্কের সম্মুখীন হতে সাহস করেন নি এর আগে। হর্ষবর্ধনের সাহায্য পেলেও তিনি আক্রমণে ব্রতী হতে ভরসা পেলেন না।

কিন্তু শশাঙ্কের প্রথম আক্রমণেই ভাস্করবর্মন শৃগালের মত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন, পলায়ন করলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে। হর্ষের কূটকৌশল হল ব্যর্থ।

চৈনিক পরিব্রাজক বলেছেন হর্ষবর্ধন ছিলেন পরম ধার্মিক, ভগবান তথাগতের একনিষ্ঠ উপাসক।

সেই একনিষ্ঠ উপাসক এবার আরম্ভ করলেন দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। কৌশল এবারও কূট, তবে আরও গভীর, আরও ঘৃণ্য।

নাটকের এবার শেষ দৃশ্য।

দ্বারে আগত বিশাল সৈন্যবাহিনী। বিভিন্ন যুদ্ধের ক্ষত বিষাক্ত হয়ে ওঠায় শশাঙ্ক অসুস্থ। কিন্তু দেশের স্বাধীনতারক্ষার্থে এবারও তিনি অমিততেজ, সিংহবিক্রম।

কিন্তু মাধবগুপ্ত কোথায়? তাঁর সহচর, সহোদর, একান্ত প্রিয়পাত্র, অকৃতদার নৃপতির উত্তরাধিকারী। শশাঙ্ক চারপাশে তাকালেন। কোথাও দেখা যায় না মাধবকে। উচ্চৈঃস্বরে তিনি ডাকলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহলে ডুবে গেল তাঁর কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ—

ও কে? মাধব না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ তো মাধব। অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে আসছে তাঁর দিকে। আকুলভাবে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন শশাঙ্ক।

কিন্তু ও কি?

পরমুহূর্তে মাধবগুপ্তের হস্তনিক্ষিপ্ত বর্শা শশাঙ্কের বক্ষ বিদ্ধ করল।

—মাধব !

শশাঙ্ক অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গেলেন।

সেদিন রাত্রে—শিবিরে শুয়ে আছেন শশাঙ্ক। চারপাশে তাঁর বন্ধু ও পারিষদবর্গ। গম্ভীরমুখে রাজবৈদ্য এগিয়ে এলেন তাঁকে পরীক্ষা করতে।

—না না, থাক।—সেই কণ্ঠস্বর। কিন্তু নেই তাতে সেই দৃপ্ততা, সেই তেজ। কণ্ঠ আজ ম্রিয়মাণ।—

—না, থাক। আর পরীক্ষ র কোন প্রয়োজন নেই। সবই বৃথা।

—ও কথা বলবেন না, মহারাজ। আঘাত সামান্যমাত্র। কিছুদিনের মধ্যেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

—না না, বন্ধু। এ আঘাত সারবার নয়। এ আঘাত তোমরা সারাতে পারবে না। আমার সময় নিকট। বেশী কথা বলতে পারব না। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারলুম না। তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো। বিক্রম !

—মহারাজ।

—তুমি আমার চিরকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রলোভনের বশে মাধব যা করেছে, তার জন্য তার ওপর আমার কোন রাগ নেই। ওর ভার আমি তোমার হাতেই তুলে দিলাম। মহাক্ষণ উপস্থিত। আমি চললুম। বিদায়—

সবাই ঝুঁকে পড়লেন তাঁদের রাজার দিকে। শশাঙ্ক একবার কি যেন বলতে চাইলেন, বলতে পারলেন না, শুধু রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হলো। পূর্ণচন্দ্র অস্তমিত হলো।

সিংহাসনে তারপর আরোহণ করলেন ভ্রাতৃহন্তা, বিশ্বাসঘাতক মাধবগুপ্ত। কিন্তু দেশ তখন আর স্বাধীন নেই, থানেশ্বরের পদানত হয়ে গেছে।

কি নিদারুণ ! না না, আর যে সইতে পারি না। হে অতীত, ফেলে দাও তোমার কৃষ্ণ যবনিকা এই দৃশ্যের ওপর। হর্ষবর্ধনের নাম থাকুক উজ্জ্বল হয়ে নক্ষত্রের মতো। শশাঙ্ক হোক নিষ্প্রভ।

মনে মনে

অনুরাধা বসু

ষষ্ঠ বর্ষ, ইংরাজী

মোনালিসা,

দোহাই আপনার, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবেন না—একটু ভাবুন, কপালের চুলগুলো সরাতে সরাতে একটু ভাবুন—কি—? চিনতে পারছেন না? জানি—পারবেন না।

বাইরে বৃষ্টি এল—কোণের টেবিলে বসে আপনাকে চিঠি লিখছি। রাত অনেক হল, কিন্তু বড় ভাল লাগছে আপনাকে চিঠি লিখতে—ঝড় উঠেছে; আমার মনেও বৃষ্টি নামছে আস্তে আস্তে—বড় আরাম; আজ অন্ততঃ আমার কথাগুলো শুনুন আপনি। আমাকে বলতে দিন।

বাড়িটা আমার কেশব সেন স্ট্রীটে, আপনার চৌরঙ্গী থেকে দু'নম্বর বাসে আসতে লাগে বড় জোর আধ ঘণ্টা—তার বেশী নয়। সমীর—মানে আপনার স্বামী—প্রায়ই আসতেন এখানে। অবশ্য তিনি মাস দুই হল আর আসছেন না—আসবেনই না বোধ হয়। কেন?—বলছি—আচ্ছা? আপনিই তো শেষ এসেছিলেন ওর সঙ্গে; মনে পড়ছে? হয়তো বুঝতে পেরেছেন, বুঝুন, তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু দোহাই আপনার চিঠিটা ছিঁড়বেন না।

সেদিনও এমন বর্ষা নেমেছিল—মনটা আমার—যাক্, বলে দরকার নেই—কিন্তু বলব নাই-বা কেন?—আমার মনেও মেঘ ঘনিয়েছিল—জীবনে কখনও প্রাণ ভরে বৃষ্টিতে স্নান করি নি—আমি—আমি আপনাদের ভাষায় 'ইনভ্যালিড'—কিন্তু মনটা আমার—মো না লি সা?—সেটা তো 'ইনভ্যালিড' নয়! বসে থাকি জানলার ধারে চেয়ারে, ছবি আঁকি—ছবি—ই—আঁকি—সমুদ্রের ঢেউয়ে নীল রঙ ঢালি—প্রুসিয়ান ব্লুর সঙ্গে মিশিয়ে নিই অবচেতন মনের কামনাটা। আকাশের সাদা বকের পাখায় পাখায় উড়ে যায় কত সাধ, রোদের আগুনে জ্বালিয়ে দিই আমার শুকনো জীবন, আগুনের রঙ বড় সুন্দর—লাল—ভালবাসার রঙ—অথচ কত জ্বালা—সেই জ্বালায় আমি পুড়ে মরি, মো—না—লি—সা। নানা রঙের জামা পরি—হলুদটা বেশী, বন্ধুরা ঠাট্টা করে ডাকে 'ভ্যানগগ্'—আমি কি সত্যিই ভ্যানগগ্?—সূর্যের মাঝে হারিয়ে গেছে আমার সূর্যমুখী! আরও একটা প্রিয় জামা আছে আমার।—সেটায় চাওয়ার লাল দাগের সীমা থমকে গেছে না-পাওয়ার কালো লাইনের সামনে—লালেতে—কালোতে—ছকটানা দিনগুলো আমার অসহ্য—। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম—আমার মনেও সেদিন বর্ষা নেমেছিল।

সেদিনই সমীর এল আপনাকে নিয়ে। সঙ্গে ছিল অজয়রা—মানে অজয় মিত্রের কথা বলছি। আপনাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম। আপনি প্রথমে অত লক্ষ্য

করেন নি—শেষে একটু অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল আপনার চোখে-মুখে। আমি বললাম বিন্ধ্যাচলের মন্দিরের কথা, জয়পুরের হাওয়া-মহলের কথা, আপনি চেয়ে রইলেন অবাক হয়ে। অথচ আমি যখন বললাম আপনাকে ফিকে হলুদ শাড়ীতে দেখেছি, সমীর চমকে উঠল। আপনার গত জন্মদিনে আপনি ফুল কিনেছিলেন নিউ মার্কেট থেকে,—তাও বললাম। বন্ধুদের মধ্যে তখন মৃদু গুনগুন শোনা যাচ্ছে—আপনি তো আগাগোড়াই সব অস্বীকার করলেন—কিন্তু, আমি আড়চোখে দেখলাম সমীরের চোখদুটো জ্বলছে। আমি তখন শিকারী ; আপনার অসহায় ভাব ভোলা যায় না—কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি একটুও বিরক্ত করতে চাইনি আপনাকে ; অসম্ভব চেনা লাগছিলো আপনার মুখটা—বিশেষ করে আপনার মাথাটা একটু বাঁ দিকে হেলিয়ে হাসিটা। কোথায় যেন দেখেছি, কি যেন কথা হয়েছিল দুজনের মধ্যে ; আপনার কথাগুলো পরিষ্কার মনে পড়ছে, অথচ নিজেরটা খুঁজে পাচ্ছি না, কেন এমন হয় বলতে পারেন ? প্রাণপণে চেষ্টা করছি সকলের সামনে নিজেকে তুলে ধরবার জন্য, অথচ আপনার চোখের কালোতে সম্মতির কোন লক্ষণই নেই। একটা থমথমে ভাব সারা ঘর জুড়ে। কেন স্বীকার করলেন না যে আপনি আমার চেনা ?

আপনারা চলে যাবার পর প্রথম বুঝলাম আমি আপনাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু, কবে—, কোথায়—, অত কথা মনে নেই। সারারাত জেগে কাটল—সারাদিন ভাবনায়। সন্ধ্যেবেলায় আপনাকে ফোন করতে আপনি প্রথমে বুঝতে পারেন নি, কিন্তু পরিচয় দিতেই কোন কথা না বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। তার প্রায় একমাস পরে আবার ফোন করেছিলাম—এবার আপনি কথা বললেন, "আমি আপনার কি করেছি ? কেন আমাদের দুজনের মধ্যে অশান্তি আনছেন ? জানেন এর জন্য সমীর ক'দিন হল আমার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলছে না ? বন্ধুরা হাসছে—" গলাটা শেষে কান্নায় ধরে এল আপনার—

কিন্তু এ আমি কি করলাম ? এত কষ্ট আপনার আমার জন্য ?—তারপর কত রাত গেল। সমীর শুনলাম এই নিয়ে ব্যাপারটাকে অনেকদূর টেনে নিয়ে গেছে—কিন্তু তখন আমি খুবই ব্যস্ত, তন্ন-তন্ন করে খুঁজেই চলেছি আমার মনের কানাগলিটা—আনাচে-কানাচে কিছুই বাদ দিই নি ; কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না যে ঠিক কোথায় আপনাকে দেখেছি। হাজার-সুতোর-পাকে-বাঁধা মন আমার, কিন্তু সেই হারানো প্রান্তটা খোঁজার জন্য করতে হল চরম পরিশ্রম।

—শেষে মনে পড়ল, যা-ও বা একটু সুখ পেয়েছিলাম জীবনে, সেটাও গেল। আমি একজনকে ভালবাসি—এই কথাটা মনে করতেই ভাল লাগত—নিজের মনেই বিভোর হয়েছিলাম ক'দিন ; কিন্তু আজ সব শেষ। আপনি ঠিকই বলেছিলেন সেদিন—আমি আপনাকে দেখি নি কখনও। আমি আজ হেরে গেছি—তোমার কাছে ('তুমি' বললাম, কিছু মনে করলে ? আমি যে আর পারছি না—)! বিয়ের আগে সমীর আসত আমার কাছে, তোমার কথা বলত অনর্গল। কোথায় দেখা হল, তুমি কি পরেছিলে,

কি বলেছিলে, আরও কত কথা। আমার লোভী মনটা নিজেকে কখন নিজেরই অজান্তে মিশিয়ে ছিল সমীরের সাথে—সে দেখেছিল আমি যুগ-যুগ ধরে একই কথা তোমাকে বলবার জন্য ব্যাকুল। মনের অন্ধকারে তোমার সাথে হেঁটে চলেছে আমার ছায়া—আমার সমস্ত চেতনার স্রোতে ভেসে চলেছিল তোমার কত কথা—মোনালিসা—কেন মনটা আমাকে এমন ঠকাল? আমার ভালবাসাটা যেন একটা কস্তূরীমৃগ। নিজেই নিজের গন্ধে আকুল—কিন্তু আমার মনটা? কেন সে নিজেকে এমন ঠকাল? সারা জীবন ছবিই আঁকল সে! পেল না মনের মানুষকে!

এত বড় ছলনা সহ্য হয় না! মোনালিসা—তুমি—তুমি আমাকে পার তো ক্ষমা করো—কিন্তু একবার বলতে দাও তোমাকে ভালবেসেছিলাম—মনে-মনে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা

শ্রীপ্রদীপকুমার সেনশর্মা
চতুর্থ বর্ষ, দর্শন

"তবু এক শ্রেণী আছে, তারা অসাধারণ—
কোনো গুণ তাদের নেই, গুণের ভানও নেই তাদের ;
সাদাসিধে ভাল মানুষ তারা, তারা শুধু জানে
কুঁচে মাছ সে কুঁচে মাছই—
কখনো ভাবে না ছাল ছাড়াতে লাগে কেমন,
শুধু জেনেই সন্তুষ্ট যে কুঁচে মাছের জন্ম
তার ছাল ছাড়িয়ে নেবার জন্যেই,
এবং আত্মদান করাই ভারতবাসীদের বিধিলিপি···
আর তাই যখন তারা মাথা উঁচু ক'রে বড় হয়ে ওঠে,
তখন তাদের ঘৃণা হয় সবচেয়ে বেশী এই ভেবে—
কেন এই রকম?"

আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম পাদে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্ন করার দিন এসেছে কেন এই রকম হয়েছিল। বৃটিশ আমলে ভারতের যে সমস্ত ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার কোনটাই বৃটিশ শাসনের সত্য রূপটি পুরোপুরি উদ্ঘাটনে সমর্থ হয় নি। কারণ

তৎকালে সরকারী চাপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যকে গোপন রাখা হয়েছে। ইংলণ্ডের ইতিহাস সম্পর্কে ডিজ্‌রেলী বলেছিলেন, "সাধারণতঃ বড় বড় ঘটনাকেই বিকৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। প্রকৃত জরুরী কারণগুলির অধিকাংশই গোপন রাখা হইয়াছে। কতক কতক প্রধান চরিত্র একেবারেই আমাদের সামনে আসে না। যাহারা আসে তাহাদেরও এত ভুলভাবে দেখানো হয় যে, ফল সমস্ত জিনিসটাই একটা প্রহেলিকার মত হইয়া উঠে।" সুতরাং বৃটিশ আমলে যে-সব ইতিহাস লেখা হয়েছে তাতে যে সত্যরূপ প্রকাশ পাবে না এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ যারা নিজের দেশের আসল ইতিহাস গোপন করেছে, তারা যে-দেশে শুধু লুণ্ঠন আর দস্যুতাই করেছে, সেই দেশের আসল ও সত্য ইতিহাস রচিত হতে দিতে পারে না। কিন্তু আজ সময় এসেছে ভারতের ইতিহাসকে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার এবং অত্যন্ত গৌরবের কথা যে ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে সেই প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা অর্থাৎ সেই সময়ের বাংলার প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো। কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পর্যালোচন না করলে তৎকালীন ভাবধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি কোনটার সম্বন্ধেই বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গঠন করা যাবে না। মার্কস বলেছেন, "মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তাহার চৈতন্য বা চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।" এর বিশ্লেষণে স্তালিন বলেছেন, "সমাজের অধ্যাত্মজীবনের গঠনের উৎস, সামাজিক ধারণা ও মতবাদ রাজনীতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানের মূল উৎস সন্ধান করিতে হইবে ঐসব ধারণা, মতবাদ, অভিমত ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নয়, বরং সন্ধান করিতে হইবে সমাজের বাস্তব জীবনব্যবস্থায়, সমাজসত্তার মধ্যে, যে জীবনব্যবস্থা ও সমাজসত্তার প্রতিচ্ছবি হইল ঐসব ধারণা, মতবাদ, অভিমত, ইত্যাদি।"

এর জন্য চাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ এই বস্তুজগৎ পরস্পর সম্পর্কহীন বা বিচ্ছিন্ন এবং আকস্মিক কতগুলি ঘটনার সমাবেশ নয়। বরঞ্চ ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ পদ্ধতি অনুসারে, "অবিচ্ছিন্ন ও সমগ্রভাবে সুসংহত এবং ইহার প্রতিটি বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে অন্যের প্রকৃতিগত যোগ আছে, তাহারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।" সুতরাং কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান তখনই বিজ্ঞানসম্মত হবে যখন সেই বস্তু বা ঘটনাকে পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন না ক'রে বিচার করা হবে। "কোন বস্তুকে বোঝা যাইবে ও তাহার ব্যাখাও সহজ হইবে যদি পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তাহার অপরিহার্য সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার বিচার করি।" কেন তখন ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল, ব্রিটেনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধ্বংস হলেও, কেন ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণুভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও তা ধ্বংস হল না, কেন ভারতবর্ষে, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে, যে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি ব্রিটেনে হয়েছিল, তা বাধাপ্রাপ্ত হল প্রতি প্রশ্ন ভূপরিষ্কার হবে যদি আমরা সেইসব ঘটনা বিচার করি যেগুলোর

সঙ্গে এই সমাজব্যবস্থা বা রূপান্তরের অপরিহার্য সম্পর্ক আছে। একমাত্র এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের সত্যের মণিকোঠায় পৌঁছে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক ; কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালাগাঁথা।" কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসারে আমরা উল্‌টিয়ে বলব, "তাকে দেখে মনে হয় আকস্মিকের মালাগাঁথা ; কিন্তু আসলে সে ধারাবাহিক।" কাজেই প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখনকার সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো।

মধ্যযুগীয় বাংলা ছিল সামন্ততান্ত্রিক বাংলা। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামগুলির উপর নির্ভরশীল। গ্রামগুলি যা উৎপাদন করত তা শুধু ভোগের জন্য, বিনিময়ের জন্য নয়। যদিও দুই একটি বড় শহরের সৃষ্টি হয়েছিল, তবুও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সেগুলির গুরুত্ব খুব বেশী নয়। শহরগুলোতে কিছু কিছু পণ্য উৎপাদন করা হতো বাইরে চালান দেবার জন্য। কাজেই শহরগুলো উৎপাদন করত বিনিময়ের জন্য। কিন্তু মুখ্য ভূমিকা ছিল গ্রামগুলির। এই সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সভ্যতার বিশ্লেষণে Marx বলেছেন, "Those small and extremely ancient Indian communities, some of which have continued down to this day, are based on possession in common of the land, on the blending of agriculture and handicrafts, and on an unalterable division of labour, which serves, whenever a new community is started, as a plan and scheme ready, cut and dried. Occupying areas of from 100 up to several thousand acres, each forms a compact whole producing all that it requires. The chief part of the products is destined for direct use by the community itself, and does not take the form of a commodity, Hence, production here is independent of that division of labour brought about, in Indian society as a whole, by means of the exchange of commodities." এই গ্রামগুলোর গঠন কাঠামো সম্পর্কেও Marx খুব বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাদের বণ্টনপ্রথায় ছিল যৌথ ব্যবস্থা। Marx-এর উক্তি অনুসারে, "In those of the simplest form the land is tilled in common and the produce divided among the members." তাছাড়া গ্রামের ধোপা, নাপিত, শিক্ষক, কর্মকার, পূজারী প্রভৃতি শ্রেণীর ভরণপোষণ সম্পর্কে Marx বলেছেন, "These dozens of individuals are maintained at the expense of the whole community." আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর এই গ্রামগুলির অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাইরের পরিবর্তনগুলোর সাথে এগুলির কোন সম্পর্কই ছিল না। নানা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ও জাতিভেদে খণ্ডিত গ্রামগুলি ছিল

নিশ্চল, অসার, সৃষ্টিবিমুখ। জীবনকে সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ ক'রে গড়ে তুলবার মতো কোন উপকরণই এখানে ছিল না। "The simplicity of the organisation for production in these self-sufficing comumnities that constantly reproduce themselves in the same form, and when accidentally destroyed, spring up again on the spot and with the same name—this smplicity supplies the k y to the secret of the unchangeableness of Asiatic societies, on nchangeableness in such striking contrast with the constant dissol ion and refounding of Asiatic States, and the never-ceasing change of dynasty. The structure of the economical elements of society remains untouched by the storm-clouds of the politcial sky."—*Marx.*

শ্রেণীসম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান ছিল কৃষক, কারিগর আর সামন্ত প্রভু অর্থাৎ জমিদার, জায়গীরদার, রাজা এই কয়েক শ্রেণী। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল জমিদার বা জায়গীরদারদের উপর। কৃষকদের উপর অত্যাচারেই এরা ইতিহাসবিখ্যাত। খাজনা ছাড়াও ব্যক্তিগত বিলাসব্যসনের জন্য এরা অন্যায় জুলুম ক'রে কৃষকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করত। জিয়াবারনী লিখেছেন, "লোকে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের যমের মত ভয় করত। এই বিভাগে কেরানীগিরি করা পাপকর্ম বলে গণ্য হত এবং এই কেরানীদের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইত না। এই বিভাগে চাকরী নেওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে অনেকে শ্রেয় বলে মনে করত।"

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বাঁধা থাকলেও এরা মাঝে মাঝে গর্জে উঠতো। অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠলে তার বহিঃপ্রকাশ হতো নানা ভাবে। মাঝে মাঝে তারা চাষবাস ফেলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত, আবার জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করত, সে নজীরও আছে। বৃটিশ আমলের পূর্বে ও পরে কৃষকবিদ্রোহ বাংলার একটি দৈনিক ঘটনা ছিল। তা হলে দেখা যাচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম প্রাক্-বৃটিশ যুগেই একটি বিশেষ রূপ নিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব এবং তৎকালীন অপরিহার্য সামাজিক অনগ্রসরতার দরুন আন্দোলনগুলি সীমাবদ্ধ ও ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু চতুর নবাব ও জমিদারেরা এই বিদ্রোহ-গুলোকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করেছে। ফলে সমাজের কাঠামোতে কোন আঁচড় পড়ে নি।

এই সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনের মধ্যেও দেখা যেতে লাগল এমন কতকগুলো লক্ষণ যা সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতার পূর্বাভাস সূচনা করল। ইতিহাসের বজ্রমুষ্টির আঘাতে সামন্ততন্ত্রের প্রাচীরে ফাটল দেখা দিল। জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই ইংরেজ ও ডাচ বণিকেরা সরাসার বাণিজ্য করবার সুবিধে লাভ করল। জাহাঙ্গীর তাদের সুরাটে কুঠি স্থাপন

করবার অনুমতি দেন এবং ক্রমে বাংলার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর ফলে বাংলায় মুদ্রা অর্থনীতি গড়ে ওঠে। নরহরি কবিরাজ যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, "হিসাব করে দেখা গেছে যে ১৬৮০-১৬৮৩ মাত্র এই চার বছরের মধ্যে একমাত্র ইংরেজ বণিকেরাই পণ্যদ্রব্য কেনার জন্য শুধু বাংলাদেশে ২০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের রৌপ্য নিয়োগ করেছিল।" ফলে প্রত্যেকটি শ্রেণীর হাতে কিছু কিছু অর্থ আসে এবং বাণিজ্য প্রসারের সহায়তা হয়। সাথে সাথে শিল্পোৎপাদনের ঝোঁক দেখা যেতে লাগল। এখানেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যদিও সামন্ততান্ত্রিকতা এখনও সমাজে প্রধান শক্তি তবুও ডায়ালেকটিক্সের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের লক্ষ্য হবে পুঁজিতন্ত্রের দিকে, অথচ এটা সমাজের প্রধান শক্তি নয় কিন্তু বিকাশশীল শক্তি। কারণ অচিরেই আমরা দেখছি এই সামন্ততান্ত্রিকতার অবক্ষয়ের মধ্যেই দেশীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর আবির্ভাব। এই বুর্জোয়াশ্রেণী নূতন পরিস্থিতিতে অর্থবান হয়ে পড়ায় রাষ্ট্রের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ পেতে থাকে। সুতরাং পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব প্রাক্-বৃটিশ যুগের ভারতেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কেন দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ভারতে তখন সম্ভব হল না তা পরে আলোচনা করব। বর্তমানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে ভারতে দেশীয় বণিকসমাজের প্রতিকূলতায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সেই সময় খাস বৃটেনে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ শুরু হয়েছে, সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে। Morton তাঁর People's History of England-এ উল্লেখ করেছেন, "The thirteenth century in England is marked by a general transformation of feudalism leadnig ultimately to its decline and the growth of a capitalist agriculture."

কিন্তু বৃটেনে পুঁজিতন্ত্র ছিল বাণিজ্যগত। শিল্পগত পুঁজিতন্ত্র গড়ে উঠতে হলে যে পরিমাণ পুঁজি জমে ওঠা দরকার তা বৃটেনের অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছিল না। কাজেই স্বীয় প্রয়োজনে ইংলণ্ড বাধ্য হল ভারতের দ্বারে এসে আঘাত করতে। ভারতের সামন্তসমাজ বিদেশী বুর্জোয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য। শেষ হল পলাশীর যুদ্ধ। বাংলার স্বাধীন সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়ে ঘটল স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবসান।

ব্রিটিশ শাসন কায়েম হবার পর থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ-ধারা বাধাপ্রাপ্ত হল। দেশে যে বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব হচ্ছিল তা সমূলে ধ্বংস হল। এ সম্পর্কে রজনী পাম দত্তের উক্তি স্মরণীয়—"অপেক্ষাকৃত উন্নত শিল্পরীতি, সামরিক সাজসজ্জা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংযোগের অধিকারী, অপেক্ষাকৃত উন্নত ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্কটের দিন ভারত-অভিযান বিবর্তদের এই স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করিয়া দিয়া উহাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করিল। ফলে পুরাতন

ব্যবস্থার ধ্বংসের পর যে বুর্জোয়া শাসন ভারতে দেখা দিল, তাহা পুরাতন ব্যবহার কাঠামোর ভিতর বিকাশোন্মুখ ভারতীয় বুর্জোয়ার শাসন নহে। তাহা হইল বিদেশী বুর্জোয়ার শাসন। পুরাতন সমাজের বুকের উপর উহা নিজেকে জোর করিয়া চাপাইয়া দিল। অভ্যুত্থানশীল ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বীজ পর্যন্ত ধ্বংস করিয়া দিল।"

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দে[খল] যে ভারতে রাষ্ট্রীয় অধিকার তারা লাভ করেছে, স্থতরাং এখন যত কম টাকা দিয়ে যত [বে]শি মাল পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক অসহনী[য়] লুণ্ঠনের যুগ শুরু হলো বাংলার বুকে। শাহ্‌জাহানের আমল থেকেই কোম্পানী বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যে এই অধিকার প্রয়োগ করে। উপরন্তু নিষেধ থাকা সত্বেও তারা বহির্বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে। সিরাজের আমলেই এই দুর্নীতি চরম সীমায় পৌছে যায়। কোম্পানীর কর্মচারীরা সিরাজের কোন নিষেধ মানে নি। উত্তরোত্তর এদের এই অন্যায় লুণ্ঠন ও বাণিজ্য বেড়ে যেতে থাকে। মীর কাশিম জানিয়েছিলেন যে কোম্পানীর কর্মচারীরা শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার ফলে বছরে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা নবাবের ক্ষতি হয়ে থাকে। তাছাড়া কোম্পানীর দস্যুগিরিও এই সময় চরমে ওঠে। যত কম দিয়ে বেশি নেওয়া যায় এই নীতি বাস্তবে রূপায়িত হতে থাকে। মীর কাশিম কোম্পানীর এজেন্টদের কাছে অভিযোগ করেন, "তাহারা ন্যায্যমূল্যের চার ভাগের এক ভাগ দিয় জোর করিয়া কৃষক ও ব্যবসায়ীর নিকট হইতে জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছে এবং গায়ের জোর ও দমননীতির সাহায্যে কৃষকদের নিকট হইতে এক টাকার জিনিসের জন্য পাঁচ টাকা দাম আদায় করিতেছে।" উইলিয়াম বোল্টস্‌ বলেছেন, "কোনো উৎপাদককে কত মাল দিতে হইবে, এবং তাহার জন্য সে কত দাম পাইবে সে কথা ইংরাজরা তাহাদের মুৎসুদ্দি ও কালো গোমস্তাদের সাহায্যে যথেচ্ছভাবে স্থির করিয়া ফেলে। ···দরিদ্র তন্তুবায়ের সম্মতি সাধারণত দরকার বলিয়াই মনে করা হয় না, কারণ কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত গোমস্তারা রায়তদের দিয়া যাহা খুশি সই করাইয়া লয় এবং তন্তুবায়দের যে টাকা তাহারা দিতে যায় তাহারা তাহা লইতে অস্বীকার করিলে তাহাদের যে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বেত মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়—একথাও জানা আছে" [Consideration on Indian Affairs]। এই সময়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা যে কত শঠতা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়েছিল ক্লাইভের উক্তিই তা প্রমাণ করে। "I can only say that such a scene of anarchy, corruption and extortion was never seen or heard of in any country but Bengal...under the absolute management of the Company's servants." ১৮৫৮ খৃঃ কমন্স সভায় জর্জ লুইস বলেছিলেন, "আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে ১৭৬৫ সাল হইতে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নমেণ্টের চেয়ে অসাধু, শঠ, প্রবঞ্চক ও লোভী গভর্নমেণ্ট সভ্য জগতে আর কখনও দেখা যায় নাই।"

দেখা যাচ্ছে যে অষ্টাদশ শতকে কোম্পানীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে-কোন উপায়ে এদেশ থেকে অর্থ নিয়ে যাওয়া। বাংলার সামাজিক প্রগতি বা সাংস্কৃতিক উন্নতির দিকে তারা কোন লক্ষ্য রাখে নি। ক্লাইভ বলেছিলেন যে বাংলা ছিল inexhaustible riches-এর দেশ। তাই এদেশ থেকে অপর্যাপ্ত অর্থ নিয়ে তারা দেশে পাঠাতে লাগল। রজনী পাম দত্ত যে পরিসংখ্যান হাজির করেছেন তা থেকে এই ল্ণ্ঠনের একটা আঁচ পাওয়া যাবে। "১৭৭৩ সালে পার্লামেণ্টে প্রদত্ত কোম্পানীর প্রথম ছয় বৎসরের শাসনের সময়কার রাজস্ব আদায় এবং খরচপত্রের হিসাবেই দেখা যায়। মোট রাজস্বের পরিমাণ দেখান হইয়াছিল ১৩,০৬৬,৭৬১ পাউণ্ড; মোট খরচ হইয়াছিল ৯,০২৭,৬০৯ পাউণ্ড; বাকি ৪,০৩৯,১৫২ পাউণ্ড বিলাতে পাঠান হইয়াছিল।" "কোম্পানীর কর্মচারীরাও বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম দিকে ক্লাইভের কিছুই ছিল না; কিন্তু তিনি যখন দেশে ফিরিলেন তখন ভারতে বাৎসরিক ২৭ হাজার পাউণ্ড আয়ের জমিদারী ছাড়াও তাহার অন্যান্য ধনসম্পত্তির মূল্য হইল সাড়ে বারো লক্ষ পাউণ্ড।...গভর্নর ভেরেল্স্ট-এর মতে ১৭৬৬ হইতে ১৭৬৮ এই তিন বৎসরের মোট রপ্তানি হইয়াছিল ৬,৩১১,২৫০ পাউণ্ড অথচ আমদানির পরিমাণ হইল মাত্র ৬,২৪,৩৭৫ পাউণ্ড।" সুতরাং কোম্পানীর যে উদ্দেশ্য ছিল বিনিময়ে কিছু নিয়োগ না করে অর্থ উপার্জন তা সার্থক হল। ক্লাইভের কাউন্সিলের সদস্যের উক্তিতে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। "এই গৌরবময় সাফল্য জাতির হাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড আনিয়া দিয়াছে; কারণ সত্য কথা বলিতে কি, সুবা হইতে যে প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়, তাহার সবটাই শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডেই কেন্দ্রীভূত থাকে।" উপরন্তু ইহাও উল্লেখ করা হয়েছে যে কোম্পানী "এক আউন্সও সোনা বা রূপা না পাঠাইয়াও পুরা তিন বৎসর বাণিজ্য চালাইয়াছে।"

এইভাবে বাংলাদেশে লুণ্ঠনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দাঁড়ালো মন্বন্তর। লক্ষ্য করবার জিনিস হল কোম্পানীর ক্রমাগত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি। বাংলার শ্রমজীবী মানুষ যত অর্থহীন হয়ে পড়ছিল কোম্পানীর রাজস্বের পরিমাণ তত বেড়ে যাচ্ছিল। "১৭৬৪-৬৫ সালে বাংলার শেষ ভারতীয় শাসকের শাসনের শেষ বৎসরে ৮,১৭,০০০ পাউণ্ড ভূমিরাজস্ব আদায় করা হইয়াছিল। ১৭৬৫-৬৬ সালে কোম্পানীর শাসনের প্রথম বৎসরে বাংলার ভূমিরাজস্ব আদায় করা হয় ১,৪৭০,০০০ পাউণ্ড। ১৭৭১-৭২ সালের মধ্যে উহাই আবার ২,৩৪১,০০০ পাউণ্ডে গিয়া ঠেকিয়াছে এবং ১৭৭৫-৭৬ সালে গিয়া ঠেকিয়াছে ২,৮১৮,০০০।" তা হলে দেখা যাচ্ছে মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু সত্ত্বেও রাজস্বের পরিমাণ কমে নি, বরঞ্চ বেড়েছে।

এই লুণ্ঠনের ইতিহাস, ইতিহাসের সমস্ত বড় বড় আক্রমণ ও লুণ্ঠনের কাহিনীকে হার

মানিয়েছে। নাদির শাহ, চেঙ্গিস খান প্রভৃতি বড় বড় লুণ্ঠনকারীদের ভারতে আসতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু যুগের পর যুগ ভারতের মাটিকে অস্ত্রবলে কবলিত ক'রে এদেশের অর্থ অপহরণের কাহিনী তাদের লুণ্ঠনকে নিষ্প্রভ করেছে।

আশ্চর্যের কথা হল এই লুণ্ঠন ও বঞ্চনা সত্ত্বেও কোন সামগ্রিক বিপ্লব তখনও গড়ে ওঠে নি। তার প্রধান কারণ বাঙালীর তখনও জাতীয়তাবোধ জাগে নি। যদিও অত্যাচারে পীড়িত মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করেছে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। প্রাক্-বৃটিশ যুগে তাদের অনেক বিদ্রোহ সার্থকতা লাভ করছে, কিন্তু বর্তমান শাসক সভ্যতার সমস্ত উপকরণের মধ্যে শক্তিশালী।

কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকার মধ্যেও ইংরেজ এমন কতকগুলো পরিবর্তন সাধন করতে বাধ্য হ'য়েছিল যার মধ্যে ছিল ভবিষ্যতের শুভ সম্ভাবনা। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যেই ছিল বাংলার রেনেসাঁসের বীজ। কিন্তু এর জন্য ইংরেজ কোন গৌরব দাবী করতে পারে না। কারণ ভারতের প্রতি তাঁর মোটেই লক্ষ্য নয়। Marxএর মতে ইংরেজ শুধুমাত্র "Unconscious tool of history"।

এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে প্রধান হলো গ্রামীণ সভ্যতার ধ্বংসসাধন। বাংলাদেশে ও সমস্ত ভারতে যে সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যার সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, ইতিহাসের নির্মোঘ নিয়মে তা ভেঙে পড়তে শুরু করে। এই সময়টাকে Marx বলেছেন ভাঙনের যুগ। গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন কোনদিকে চলছিল তা অনুধাবন ক'রে Marx এই পরিবর্তনকে এশিয়ার সবচেয়ে বড় 'Social Revolution' বলে অভিহিত করেন। "English interference having placed the spinner in Lancashire and the weaver in Bengal, (On a par) or sweeping away both Hindu spinner and weaver, dissolved these small semi-barbarian, semi-civilised communities, by blowing up their economical basis and thus produced the greatest, and to speak the truth, the only Social Revolution ever heard of in Asia."—Marx. গ্রামীণ সভ্যতার ধ্বংসসাধনের ফলে গ্রামগুলো বৃটেনের বাজারের কাজ করতে লাগল। গ্রামগুলো সস্তায় কাঁচামাল নেওয়া এবং উৎপন্ন পণ্য বেশি দরে দেওয়ার কেন্দ্র হ'য়ে উঠল। ফলে কৃষকসমাজ শহরের পথে পা বাড়ালো—সৃষ্টি হ'ল সস্তায় ক্রয়যোগ্য শ্রমশক্তি দিনমজুর। আর গ্রামের ভদ্রলোকেরা শহরে এসে দুপাতা ইংরেজী শিখে হলো কেরানী। এলো এক মধ্যবিত্ত সমাজ যারা সৃষ্টি করল বাংলার বুকে রেনেসাঁস। বাংলার সামাজিক বিকাশধারা একদম পরিষ্কার হ'য়ে যায় A. F. Pollard-এর কথা মনে করলে। "The industrial and commercial system of modern history requires two factors feudalism did not provide, it requires a middle class and it requires an urban population. Without

these two there would be little to distinguish between modern from mediaeval history. Without commerce and industry there can be no middle class ; where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation." কিন্তু এই যে বিকাশোন্মুখ বীজ নিহিত হ'য়েছিল ইংরেজ এদেশে থাকতে তা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারে নি।

সুতরাং ইংরেজ যেজন্য এই দেশে এসেছিল তা পূর্ণতার দিকে। ভারতীয় অর্থ লুণ্ঠনের ফলে বৃটেন শিল্পবিপ্লবের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৭৫৭-এর পর থেকে বৃটেনে যত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছিল তা আর আগে হয়নি। একথা নিশ্চিত যে ভারত বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছিল।

পরিশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সংগ্রাম হ'য়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। কারণ এই সংগ্রামের কাহিনীগুলো না হ'লে প্রবন্ধ তো অপূর্ণ থেকে যাবেই উপরন্তু ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সুচনার পটভূমি ব্যাখ্যা না করলে স্বাধীনতার বিগত সংগ্রামীদের প্রতি অবিচার করা হবে, যা মোটেই মার্জনীয় নয়।

এই সময়ে ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে যে সব অগ্ন্যুৎপাত হ'য়েছে তার ব্যাখ্যায় এটা মনে রাখা প্রয়োজন, রেনেসাঁসের একটি ফল যে জাতীয়তাবোধ তা তখনও গড়ে ওঠেনি। কারণ বাংলায় রেনেসাঁস এসেছে উনবিংশ শতাব্দীতে। যে সমস্ত আন্দোলন ও বিদ্রোহ এই সময়ে দেখা গেছে তার মূলে ছিল দেশপ্রেম আর অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিবাদের ইচ্ছা। দেশপ্রেমের মূলে ছিল ইংরেজের প্রতি ঘৃণা।

মীরজাফরের চরম দাসত্ব সত্ত্বেও লোভী ইংরেজ সন্তুষ্ট হলো না। তাকে সরিয়ে বাংলার মসনদে বসানো হল মীরকাশিমকে। মীরকাশিম দেখলেন কোম্পানীর অত্যাচারে দেশীয় বণিকদের ব্যাবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং তিনি তাদের বাণিজ্যগত সুবিধা রহিত ক'রে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে দেশীয় বণিকদেরও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্ক দিতে হবে না। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ছিল একজন দেশপ্রেমিকের সংগ্রাম। বাংলার পরাধীনতার ব্যথা তাঁকে পীড়ন ক'রেছিল। তাঁর অনুপ্রেরণায় সমস্ত বাংলায় ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে। ঢাকার মহম্মদ আলী [illegible]মীনকে লিখে জানাচ্ছেন, "কোন ইংরেজকে সহ্য করবে না এবং ইংরেজ নামধারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাস্তি দেবে।" পরিশেষে মীরকাশিম যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং ফলাফল হয় তাঁর পরাজয়। এটাই বোধ হয় দেশের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত।

এবার আসা যাক বাংলার শ্রমজীবী মানুষের প্রতিরোধে। বাংলার শ্রমজীবী মানুষ কোন কালেই কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারকে মেনে নেয়নি। শান্তিপুরের তাঁতীদের কাছ থেকে কর্মচারীরা যে দরে মাল কিনতে চাইত তাতে তাদের পোষাত না। কিন্তু না দিলে তাদের

শাস্তি দেওয়া হতো। ফলে তাঁতীরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। শিঙা বাজিয়ে তারা এক জায়গায় জমা হতো। কোম্পানীর কর্মচারীরা এতে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল এবং ছয়জন নেতাকে অবরুদ্ধ করা হ'য়েছিল।

মালঙ্গীদের সংগ্রামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুরের তমলুক ও হিজলী ছিল লবণশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। কো নীর বঞ্চনা ও শঠতায় মালঙ্গীদের অবস্থা দিন দিন নিঃস্ব হতে থাকে। না খেতে পেয়ে ব সা ছেড়ে তারা চুরি করতে যায়। ফলে তারা অসহ-যোগিতা শুরু করলো। লবণ ৎপাদন বন্ধ ক'রে দিল। নরহরি কবিরাজের বিবরণে দেখা যায় যে পরমানন্দ সরকার তার ভ্রাতা মালঙ্গীদের জমায়েত ক'রে কাছারিতে নিয়ে যায় এবং তারা জানায় যে তাদে দাবি পূরণ না হ'লে তারা কাজ করবে না।

কৃষকবিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে চিরদিন অক্ষয় হ'য়ে থাকবে। এই কৃষকবিদ্রোহ বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তি আ দালনে অফুরন্ত শক্তি যুগিয়েছে। কুখ্যাত দেবীসিংহের অত্যাচারে রঙপুরের কৃষকেরা রীয়া হ'য়ে ওঠে। তারা খাজনা আদায়কারীদের ঘেরাও করে এবং খাজনা দেবে না ব ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহটি একটি পুরো রূপ নিয়েছিল। বিদ্রোহীরা নেতা দিরজী নার কে নবাব বলে ঘোষণা করে। লেফ্‌টন্যাণ্ট ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌কে নেতৃত্ব দিয়ে ফৌজ পাঠিয়ে কাম্পানীকে এই বিদ্রোহ দমন করতে হ'য়েছিল। এর পর চোয়ার বিদ্রোহও খুব বির আকার ধারণ করেছিল। বিদ্রোহের আগুন প্রথমে মেদিনীপুর জেলায় জ্বলে ল, তারপর ক্রমশঃ বীরভূম ও বাঁকুড়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এইসব বিদ্রোহ দমন করতে কাম্পানীকে সামরিক বাহিনী পাঠাতে হ'য়েছিল।

এই সব বিদ্রোহের ও বাংলাদেশে ফকীর ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ আরও ব্যাপক আকা রণ করে। ব দ্র তাঁর 'আনন্দমঠে' সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহকে চিরস্মরণীয় ক'রে গেছেন। এই বিদ্রো কায় কুঠি আক্রমণ ও দখল ক'রে নিয়েছিল। ১৭৬৯খৃঃ সন্ন্যাসীরা রংপুর আক্রম এবং সরকারী বাহিনীকে পরাস্ত করে। নরহরি কবিরাজের বিবরণ অনুসারে ১৭৭২ পুরের সন্নিকটে সন্ন্যাসীরা জমায়েত হয় এবং সরকারী বাহিনীর সাথে তাদের ঘোর যুদ্ধ হ নেতা টমাস সিপাহীদের বেয়নেট দিয়ে ছিন্নভিন্ন করবার আদেশ দিলে তারা আদেশ পালন রতে অস্বীকার করে। সন্ন্যাসীরা টমাস্‌কে হত্যা করে। পরে সন্ন্যাসীরা ঢাকা শহরের ক অগ্রসর হয়। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনে তারা ঢাকায় প্রবেশ করতে পারে না। সব দেশীয় সিপাই ও সেনাপতি ক্যাপ্টেন টমাসকে সাহায্য করতে অস্বীকার ক'রেছি কামানের মুখে দাঁড় করিয়ে তোপ দেগে তাদের জীবন নাশ করা হয়।

এই বিদ্রোহের প্রধান তা হিসেবে কবিরাজ মহাশয় মজনু শাহ ও তাঁর অনুচরদের যেমন মুশা শাহ, চেরাগ আলি হ, পরাগল শাহ প্রভৃতির নাম করেছেন। যদিও ফকীর ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে মাঝে মা সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, কিন্তু কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে

দাঁড়াতে তারা এক সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের কার্য্যপন্থায় এত মিল ছিল যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের উভয় দলকেই সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করতেন।

এইভাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভিত্তি গড়ে উঠতে থাকে। বোঝা যায় যে বাংলার জনসাধারণ কখনই বিনাপ্রতিরোধে বিদেশী শাসন মেনে নেয়নি। তারা সংগ্রাম ক'রেছে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ি[redacted]ছে। আরও উল্লেখযোগ্য এইসব বিদ্রোহে অংশগ্রহণ ক'রেছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে বা[redacted]ার শ্রমজীবী জনসাধারণ। এই সংগ্রামগুলো হলো স্বতঃস্ফূর্ত, স্থানীয় সংগ্রাম। কোন [redacted]ামগ্রিক রাজনীতি এদের পেছনে কাজ করেনি—ফলে তারা বারবার পরাস্ত হয়েছে, কি[redacted] হার মানেনি, আবার বিদ্রোহ ক'রেছে, কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল :

"My country, in thy day of glory [redacted]st
A beauteous halo circled round t[redacted]brow,
And worshipped as a deity thou w[redacted].
Where is that glory, where that re[redacted]ence now ?
Thy eagle opinion is chained down[redacted] last,
And grovelling in the lowly dust a[redacted]hou :
Thy minstrel hath no wreath to we[redacted] for thee
Save the sad story of thy misery."

[To India—My Native Land—Henry[redacted]. Derozio]*

---

* বিঃ দ্রঃ—যে সব বই-এর সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে—

(১) রজনী পাম দত্ত—আজিকার ভারত [পরিমল চট্টোপাধ্যায় [redacted]ত]

(২) নরহরি কবিরাজ—স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা

(৩) বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম খণ্ড)

(৪) জোসেফ স্তালিন—দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

(৫) Karl Marx—*British Rule in India*.

বিবেকানন্দ স্মরণে

অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র

বুদ্ধির সারথি-হাতে অসংশয় মনের লাগামে
ইন্দ্রিয়ের ঘোড়া বেঁধে
স্বাধ্যায়-সংকল্পে দিনে দিনে
প্রশান্ত সিদ্ধান্ত-যোগে যে পেয়েছে পরম প্রত্যয়,
সময়ের কোনো ছেদে
চিতাভস্মে নেই তার ক্ষয়।

এদিকে ভঙ্গুর প্রাণে অজ্ঞানের যন্ত্রণা নিশ্চিত।
ইন্দ্রিয়ের গণ্ডী ছেড়ে
মুক্তি, হায়, সাধ্যের অতীত।
তাই ফিরে ফিরে আসা—
বুদ্ধিবশে বুদ্ধির এলাকা
ক্রমে বোঝা যায় তুচ্ছ তৃপ্তি-অতৃপ্তির লক্ষ জ্বালা।
তপস্যা ভিনয়ে তখন এ-বিহ্বল চেতনা
খোঁজে পরিত্রাণসুখ
দেখা দেয় দর্শন-এষণা।

নব্য, সনাতনী অধ্যুষিত বিচিত্র চর্চায়
সমতাবিচ্যুত আত্মা।
বু কী সক্রিয়,—সেই কাল!
মোহনের ক্ষণ,—পরিব্যাপ্ত বিদ্যার সাগর,
কৃষ্ণ-কেশবের, বঙ্কিমের উনিশ শতক।
ওঁ ব্রহ্মই আত্মা,—সেই নাম বাজে ক্ষণে ক্ষণে
স্তর বাণীময় দেবেন্দ্র ও রবীন্দ্রের মনে।
কি-চালিত কর্মে আনন্দের তপস্যা উন্মুখ—
শতবর্ষ পরে কে দেবে সে সংকল্পের সুখ?

একটি নির্জন সন্ধ্যা

রূপেন্দু মজুমদার

প্রাক্তন ছাত্র

সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। পশ্চিমাকাশে ত বিবর্ণ ছোপটুকু মুছে গেছে। দূরের পাটখেতটা একতাল কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে । রাশিরাশি তালতাল কালো ছোপ এসে জমা হয়েছে আমার আশেপাশে। আর আ মি সেই অন্ধকারে আগাপাছতলা মুড়ি দিয়ে ঝিমোচ্ছি। ট্রেন আসতে দেরী আছে।

মাঝে মাঝে লাল পাথুরে রাস্তাটা বিদ্রোহ করছে। সাবেককালের নড়বড়ে লোহার বেঞ্চিটা একটা বিকট শব্দ করে সরে যাচ্ছে। স্টেশনের বনঝাউটা মাথা নেড়ে অপরিচিত আগন্তুকটাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

স্টেশনের কুলিটা ছায়ামূর্তির মত বসে ছিল। তা দাওয়ায়। নীচেই লাইনের ধারে বসে ছিল একতাল অন্ধকার। আর একটা ছায়ামূ । মাথা নাড়িয়ে কি একটা অস্পষ্টস্বরে তালহীন গান গাইছিল। গানে অবশ্য সম বা খা র কোনো বালাই ছিল না। আমার মনে কিন্তু একটা হারানো স্মৃতির আমেজ ছড়াচ্ছিল।

মিষ্টিস্বরে হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল। একটা ছোট দী তার ক্ষীণ আলোয় জেগে উঠল। সেই সঙ্গে ঝিমধরা ভৌতিক পরিবেশটা অসংগতভাবে স পড়ল।

অস্পষ্ট আলোয় অবয়বহীন খোয়াগুলোর দিকে ত য় তাকিয়ে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম আজ থেকে অনেকদিন আগের কথা। সেদিনও 'মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার' মিস্ করে 'গয়া প্যাসেঞ্জারে'র জন্য বসে বসে নিজের আশু পি বানের কাছে সুপারিশ করছিলুম।

কোন এক দুর্বিষহ মাতালের অসংবদ্ধ প্রলাপের ম ড় আর বৃষ্টি স্টেশনের ঝিমধরা পরিবেশটাকে মুখর করে তুলেছিল। বৃষ্টির শব্দে র হাওয়ার গোঙানিতে কোন এক অদৃশ্য প্রলয়ের ইঙ্গিত ছিল। মাঠ-ভর্তি পাট একগলা জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ আঁতকে উঠেছিলুম। দেখি একটা ছায়ামূর্তি নের ওপরে উঠে পড়েছে। পেছনে টলতে টলতে আসছে আর একটা। আরও পে একটা বিকট শব্দ আর একরাশ ছায়ামূর্তি সমস্ত পাটখেতটাকে দুমড়ে, ভেঙ্গে, একট তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার মত এগিয়ে আসছে বিদ্যুৎগতিতে। পেছনের ছায়ামূর্তিটা লা নের উঁচুনিচুতে আছড়ে পড়ে গেল। মুহূর্তের অসাবধানতা। একটা পেশীবহুল মজবুত ত আলতো ক'রে বুকে তুলে নিতে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে সেই উৎকট সমাজের অজস্র ঠির প্রচণ্ড ঝড় এসে পড়েছিল

তাদের ওপর। পৈশাচিক বর্বরতা দিয়ে সেদিন দুটো প্রাণের নিবিড়তম মিলন-সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে সমাজ তার যুক্তিহীন বিধিনিষেধের জয়ঘোষণা করেছিল। সমাজের সেই গলিত জৈবিক মুখের জান্তব মুখব্যাদানে ভয় পেয়ে নারীমূর্তিটা আকাশের দিকে তার মৃণাল বাহুদুটোকে তুলে আর একবার আকুল স্বরে বাঁচবার আবেদন জানিয়েছিল "হেই বাবা"!

জমিদারের নায়েব আমি চাকরি রাখতে হবে। আর জমিদারদের সে সব দিনকালও নেই। এদিকে 'গয় প্যাসেঞ্জার' ও যক্ষ্মারুগীর মত হাড়-পাঁজর বের করে একরাশ ধোয়া কাশতে কাশতে এসে পড়েছিল স্টেশনে। আর আমি দুর্বল শৃগালের মত বিবেকের কণ্ঠরোধ করে নিয়ে মুখ লুকিয়েছিলুম ট্রেনের জনারণ্যে।

কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে ট্রেন থেকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো মানব-মানবীর বিদ্রোহী অন্তরের তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠছে আকাশের পুবকোণ।

ঈপ্সা ও শীত

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ, ইংরাজী

হাড়তলিতে বিকেল নামছে
দেবদারু গাছের গোড়ায়
াওতাল ছেলেমেয়ের চোখে।
ামি 'মার্‌লো'র ফসটাস্ :
যদিও দেয় না ভার হেলেন
শষবেলার প্রহরগুলো
তবু তার মতো ভীতু
াবি আর ক' ঘণ্টা বাকি ?
ক উঠছে ঘন ঘন
নার্সরা করে করুণা,
একটা বেদনা
শর্মিলা একথা জানে না।

দু-বছর আগে যেদিন
        স্যানিটোরিয়ামের পথে
হাওড়া স্টেশনে আমায় ওরা তুলে দিলো
সেদিন ও আসেনি—ও জানতো না।
আমি দোষ দি না,
        ও তো নয় অন্তর্যামী নয় কোন সর্বজ্ঞ।
আজ ভাবি, জানলেও কি ও আসতো ?
        ও তো আমায় ভালবাসেনি :
আমার প্রেম ? তাও বোধহয় বোঝেনি।
না, না, ওসব কথা ভেবে
        শেষবেলায় কাঁদবো না।
আজকে ওরা আমার ঘরের
        ছেলেটাকে সরিয়ে দিয়েছে
কাল ভোর হবার আগেই
        হয়তো আমার শেষ
যাবার আগে পৃথিবীর কাছে কি বলবো ?
        কিচ্ছু না—
শুধু আলো তোমার কাছে প্রার্থ…
        কোলকাতার স্যাকরা… ল দিও
শর্মিলার গয়নাগড়ার সময়
        আমার হাড়ের গুঁড়ো
সে সোনাতে মিশিয়ে দিতে
তবু আমি বাঁচবো ওর হাতে, গ… কানে
        নাইবা থাকলাম ওর মনে… বাসনে—
আবার কাশির ঝলক, গলাতে র… াধ
        ও তো নয় রক্ত, ওযে ভ… তার ঋণশোধ।

কোনও এক নির্বাসিতের জন্য

সুমিত্র মিত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

এখানেই কোথায় সে নির্বাসিত হয়ে আছে।

বৈশাখের [illegible]তাস মাঝে মাঝে,
ফুলওয়ালার হাতের রজনীগন্ধার
সৌরভ বয়ে নিয়ে যায়,
নড়তে থাকে পানবিড়ির দোকানের পাল্লা
আর ম্যাজিকওলার তাঁবুর ছেঁড়া কানাত।
লম্বাগলা হাড়উঁচু পথযাত্রীর ভিড়;
সন্ধ্যার [illegible]জারে,
সস্তায় [illegible]তেও পারে
কীটভুক্ত ফসলের বর্জিত অবশেষ।
রেডিও [illegible] হিন্দী গান,
পোস্[illegible] রঙের সাজ,
সা-[illegible]-মা হর্নের আওয়াজ,
এরই [illegible] তার নিবাস,
[illegible]সিত ভদ্রলোকের—
[illegible] আছে এখানে,
নি[illegible]রঙ্গ, বর্ণহীন ছায়া,
আ[illegible]স্পন্দ জীবনের কোণে কোণে
ভীরু [illegible]গোসের মত লুকিয়ে।

এসপ্ল্যানেড

পিনাকী গুপ্তভায়া
দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

পরিক্লান্ত দিবসের বহুম্লান ছায়া,
এসপ্ল্যানেড্ মোড় হ'তে ছুটে চলে বাসের ফোয়ারা !
মনে হয় আছে তাতে জীবনের কত শুভ্র রে !
কিন্তু হায় ! সে যে শুধু পেয়ালার তলানির শেষ !
জানালার মাঝ দিয়ে শুধু দূরে চেয়ে চেয়ে দে া,
নিয়নের বাতি দেখে মন আমার মেলে দেয় প থা।
মনে ভাবি,
আমাদেরও জীবনেতে আছে বহু রঙের আকুতি
কিন্তু যেই কিছুক্ষণ বাদে,
চলে যাই গলিপথে, ভাঙা ম্লান সেই জীর্ণ খাদে
যেখানেতে শুধু অন্ধকার,
আর হাহাকার !
যেখানেতে জ্বলে শুধু প্রভাহীন ম্লান হারিকেনই,
সব মৃত ! শুধু দারিদ্র্য মরে নি !
(তখন) মনে হয় নিয়নের বাতিগুলো সব,
প্রবঞ্চক অতি বড় ! মোহময়ী তীব্র সে আস
জীবনের অন্ধকার হোক সত্য হোক !
সত্য কেন নেবে যেচে মিথ্যার নির্মোক ?

রোমন্থন

সুভাষরঞ্জন বসু

চতুর্থ বর্ষ, ভূগোল

—আমার কিন্তু মনে হয় মেয়েটাকে দেখতে বেশ।

—হুঁঃ, তবে চোখদুটো একটু ছোট।

—আচ্ছা, ওর নাম জানিস্?

—দিদিরা বলছিল, ব্রততী না ঐ ধরনের একটা কি।

—চাকরি পেয়েছে শুনলাম।

—আমিও শুনেছি।

—Sad!

—কি?

—ওই ওদের বাড়ির ব্যা বলছিলাম।

—হুঁঃ।

দু'জনের এলোমেলো চিন্তার জাল, প্রশস্ত হতে হতে একসময় অব্যক্ত বেদনায় গুমরে মরে। সৌমেন, শিবুর নি ভাবটায় একটু থমকে গিয়ে আকাশ দেখে। কালপুরুষটা চট্ করে খুঁজে বের করতে ও দিক্ হারিয়ে ফেলে।

—আচ্ছা শিবু, দেবযানী নাকি drop করেছে।

—কার কাছে শু

—দীপক শূর বল ।

—হতে পারে। তনু আর ওকে নিয়ে কলেজে কি ঝড়টাই না উঠেছিল জানিস্ তো।

—না তো। শান্ত ক বল্ ত?

—কেন, 4th yea পড়ত সেই লম্বা ফর্সা মতন ছেলেটা।

—ডান হাতে ঘড়ি ত?

—হ্যাঁ।

—ওটাতো number e চালবাজ ছিল রে!

—তাতে কি হয়েছে?

—আমাদেরই bad luck.

—সত্যি বলেছিস্।

—আসল কথাটা কি জানিস্, আমরা ঠিক মতন পারি না।

—না পারলে হবেও না।

—না হলো।

—তবে আবার কপালের দোহাই দিচ্ছিলি কেন

—যাকগে। তুই কাল যাচ্ছিস্ তো?

—কোথায়?

—সিনেমায়।

—দেখি। দাদার কাছ থেকে manage করতে পারি কিনা।

—উঠে পড়ল দু'জনে। সৌমেন এগুতে থাকে। শিবু ডাকে:

—দাঁড়া। টুলটা দিয়ে আসি।

—দিয়ে আয়।

শিবু টুলটা দু'হাতে তুলে রবীনদের বাড়িতে ঢোকে।

সৌমেন একা দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়। এখন বর্ষাকাল। আকাশটা কিন্তু শরতের মতন মেঘের সাজে সেজেছে।—ওর দেখতে বেশ লাগে।—পাশের বাড়িতে কে যেন গান গাইছে। গলাটা বেশ। সুরটাও চেনা লাগছে।—সৌমেন মনোযোগ দেয়।

—চল।

—হুঁঃ, দাঁড়া গানটা শুনি।

—তোকে দেখি রোগে ধরেছে।

—মানুষ তো, রোগে ধরবে তাতে আশ্চর্য কি।

—বাজে কথা রাখ্। চল্ তো দেখি এখন।

—চল্—শুনতে যখন দিবিই না।

দু'জনে গলির আবছা আঁধারে এগুতে থাকে।

—বই বদলাতে যাবি না, সৌমেন?

—হ্যাঁঃ।

তবে চল্, বইটা বাড়ি থেকে নিয়ে আসবি।

—চল্।

—কেমন বই আছে রে লাইব্রেরীটায়।

—মন্দ না। তবে কি জানিস্ অধিকাংশ বই আমারে পড়া। যে দু'চারখানা নতুন বই আছে, তা চাইলেই বলে out.

—বোগাস্।

—তুই এখানে দাঁড়া, বইটা নিয়ে আসি।

—চট্ করে আসিস্। বাড়ি ঢুকলে তো আর বেরুতে চাস্ না।

সৌমেন চলে যায়। শিবু একলা দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় ঘড়িটা দেখে। ৮টা বেজে ৫। কি বিশ্রী গরম। বিকেলে স্নান করেও শান্তি নেই। পকেট থেকে রুমালটা নিয়ে মুখটা মুছতে থাকে।

—ধর।

—কি ?

—খেয়েই দেখ্ না।

—পেঁয়াজি কোথায় পেলি?

—মা ভাজছিলেন, নিয়ে এলাম।

—মোড়ের দোকানের পেঁয়াজি খেয়েছিস্ ?

—হ্যাঁ।

—কেমন।

—চমৎকার। আমি তা প্রায়ই খাই।

—এটা তোর উচিত নয়।

—কেন ?

—অপারেশনের ক ভুলে গেলি।

—ওঃ। আচ্ছা ে কি মনে হয় ব্রততী মেয়েটার খুব শীঘ্রই বিয়ে হয়ে যাবে ?

—মোটেই না।

—কেন ?

—ওর পরে পুরে lyটা depend করছে জানিস্ তো।

—তা জানি, তে

—তবে কি ?

—পুঁজি আছে শু· লাম।

—থাকলেও, সেটা া permanent নয়।

—হবে হয়ত।

—আজকে একটা ার দেখলাম।

—কি ?

—Private car এ ে য়টা ফিরল।

—আমিও দেখেছি।

—আমার কিন্তু সন্দেহ

—তুই চট্ করে বড্ড এগিয়ে যাস্।

—কিরকম ?

—বিপিন আমাকে বলছিল, ভদ্রলোক ওদের কে হয়।

—বাজে কথা রাখ্। আমি শুনেছি বলেই বলছি।

—কি শুনেছিস্ ?

—পরে বলব।

লাইব্রেরীর কাছে এসে পড়ে ওরা। সৌমেনের তে বইটা দিয়ে শিবু হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে।

—পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরবি কিন্তু।

—কেন ? তুই যাবি না।

—না। যা গরম, আমি বাইরেই থাকি। তুই চ করে বইটা নিয়ে আয়।

সৌমেন লাইব্রেরীটায় ঢুকে পড়ে। শিবু মাঠটার ম্যে ভেঙ্গে-পড়া একটা নারকেল গাছের উপর বসে পড়ে। এলোমেলো চিন্তা করতে ওর গাল লাগে না। গুনগুন করে একটা রবীন্দ্রসংগীত ধরে। গানটা ওর ভালই আসে।··· দিকটায় কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করছে। দু'টোই ছেলে! না, একটা মেয়ের গলা বলে নে হচ্ছে। বাজে লাগে ওর। —ঘড়িটা আর একবার দেখে।···

সৌমেন লাইব্রেরী থেকে ডাকে :

—শিবু ?

—এই যে।

—শিবু এগিয়ে যায়।

—"কড়ি দিয়ে কিনলাম" টা নিলাম।

—পড়া।

—কেমন রে।

—মন্দ না। "Pearl" বইটা পড়েছিস্ ?

—হ্যাঁ। আমার ভারী ভাল লেগেছে।

—আমাকে দিস্।

—আচ্ছা।

অন্ধকারে সৌমেনের চটিটা হঠাৎ কাদায় স্লিপ । দু'জনেই চমকে ওঠে। খানিকটা কাদাজল ছিট্‌কে গিয়ে শিবুর পাজামায় লাগে।

—দিলি তো বারোটা বাজিয়ে।

—লাগে নি বোধ হয়।

—না, লাগে নি আবার।

শিবু নিচু হয়ে পাজামাটার অবস্থা দেখতে চেষ্টা করে। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারে না কতটা নোংরা হল। পাজামাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে আবার এগোয়। পা'র নিচের দিকটা ভিজে ভিজে ঠেকছে। বিরক্তিকর।

—শিবু ?

—বল।

—তোর মার্কশীট্ পেয়েছিস ?

—না রে। কেরানীটার অসুখ করেছে।

—কিছু হবে না তো ?

—না, officeএ বলে এসেছি।

—আচ্ছা—বড়দার কি খবর রে ?

—দারুণ।

—কি রকম !

—যেমন বড়লোক, তেমনি দেখতে সুন্দরী।

—বেশ আছে, তাই-ন

—হ্যাঁ। সেদিন দেখলাম মেট্রো থেকে বেরুচ্ছে। কি সেজেছিল, তোকে কি বলব।

—সাজবেই। যুগের হাওয়ায় ভেসে যাওয়াই তো নিয়ম।

—আমার ভাল লা না।

—তোমার না লাগ কি হবে! Maximumই ওটা চায়।

—এদিক থেকে বি াকে আমার খুব ভাল লাগে।

—ও

—সেটা ঠিক অ

শিবুর বাড়ির দর ওরা এসে পৌছায়। শিবু সৌমেনকে বাইরের ঘরে বসতে বলে ভেতরে চলে যায়। সৌমেন চেয়ারে না বসে খাটটার উপর শুয়ে পড়ে। একটা শিথিলতা ওকে গ্রাস । ঘরের ভেতর হ্যারিকেনের আবছা আলো। সৌমেন কড়িকাঠের দিকে একদৃ তাকিয়ে থাকে।···একটা মাকড়শা একটা তেলাপোকাকে কামড়ে ধরেছে। পোকা পালাতে চেষ্টা করেও পারছে না।···কিসের তাড়নায় ওটা আনন্দে শুঁড় নাড়ছে। সে ন অবাক হয়।

—কিরে ঘুমলি ?— [আলোটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে।

—না।

—ওঠ্।

—কেন, এই তো বেশ ছি। ক'টা বাজে রে ?

—সাড়ে দশ।

—দেরী হয়ে গেল। বাড়ির সবারই বোধ হয় খাওয়া হয়ে গেছে।

—তোরা বড্ড তাড়াতাড়ি খাস্।

—তাড়াতাড়ি খাওয়াটাই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

—কি স্বাস্থ্যটাই না বাগিয়েছিস্!

—সৌমেন একটু মুচকি হেসে শিবুর পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বলে—চলি।

—কে এল রে?—গলিতে একটা রিক্শা ঢোকার শব্দ শুনে শিবু জিজ্ঞাসা করে সৌমেনকে।

—দেখি।···ও জানলার গরাদে দুটো চেপে ধরে অন্ধকারে চোখ রাখে।—রিক্শাটা গলির মধ্যে খানিকটা ঢুকে থেমে গেল। রিক্শা থেকে প্রথমে একটা মেয়ে, পরে একটা ছেলে নামল। রিক্শার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ওরা এগিয়ে আসছে। সৌমেন চিনল।

—শিবু—দেখ।—সৌমেনের কণ্ঠস্বরটা চাপা।

—কে? শিবু এগিয়ে যায়।—ব্রততী আর সেই ভদ্রলোক।

—চিনেছিস্?

—হুঃ। চুপ কর।···শিবু আলোটা ডিম করে দিতে দিতে ফিস্‌ফিস্ করে বলে।

ওরা প্রায় জানলার কাছের রাস্তায় এসে গেছে। শিবুরা ওদের কথা শুনতে পায়।

—আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে।

—তাই বুঝি—! মেয়েটার স্বরে খুশির আমেজ।

—হ্যাঁ। তোমাকে মার ভীষণ ভাল লেগেছে জান

—তোমার বুঝি লাগে নি।···

একটা মিষ্টি হাসির রেশ ভেসে আসে। ওদের কথা শোনা যায় না। শিবু হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বালাতে চায়। হাতে লেগে আলো শব্দে মাটিতে পড়ে যায়। ঝন্‌ঝম্ করে চিমনিটা ভেঙ্গে যায়। শিবু বিরক্ত হয়।

—দুর ছাই।

—কি ব্যাপার রে।

—রাখ্ তোর ব্যাপার। ওদিকে যাস্ নে, কাঁচ আছে

—তাই নাকি।

—দাঁড়া, মাকে ডাকি। ও মা—মা। একটা আলো নিয়ে শীগগির এসো।

নেপথ্যে শিবুর মার গলা ভেসে আসে—কি হল রে খে ?

—আরে এসোই না।—শিবু চেঁচিয়ে উত্তর দেয়। দু'জনে চুপ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। শিবুর মা আলো নিয়ে আসছেন। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মনে হচ্ছে একটা হ্যারিকেন হেঁটে আসছে। অন্ধকারটা কমে আস ।

চলার পথে

নন্দিতা রায়

প্রাক্-মেডিকেল

কলকাতার কাছেই একটি ছোট শহর—গঙ্গানদী এখানে আধখানা চাঁদের মত বাঁক নিয়েছে। সকাল থেকেই শশিভূ্ষণ ভিলায় আনন্দ কোলাহলের অন্ত নেই। কারণ অবশ্য একটা আছে, তা হ'ল বাড়ির স চয়ে ছোট মেয়ে শিখা এবারে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করেছে বৃত্তি পেয়ে। শশি ষণ ভিলার কর্তা প্রসন্নবাবু এই শহরেরই একজন নামকরা ডাক্তার। রাত্রে খাওয়ার টেবিলেই কথাটা উঠল। শিখা এবারে কি করবে। শিখার মা সুবালা দেবী বয়সে সেকালের হলেও তিনি চান মেয়ে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে। কর্তা প্রসন্নবাবু বাড়ির ব্যাপারে মাথা ঘামান কম—সে সময়ও তাঁর নেই। তবু তিনি মনে ক্ষীণ আশা রাখেন যে মেয়ে তাঁর ড ক্তার হোক। কিন্তু সব মতলব উল্টেপাল্টে গেল মনে হয়। শিখার পিসিমা স্পষ্টবাদী মা, তিনি সোজা বললেন—"মেয়ের তো প্রায় ষোল বছর বয়স হল, এবারে একটা পাত্র টাত্র খুঁজলে তো হয়—পরে আবার হয়ত নিজে পছন্দ করেই বিয়ে করতে চাইবে।"

"তুমি একটা ভাল পা সন্ধান করে দাও তো আমি বাঁচি"—বলেন প্রসন্নবাবু। কথাটা তাঁর মনোগত কি কে জানে তবে বর্ষীয়সী এই দিদিটিকে তিনি বিলক্ষণ সমীহ করে চলেন।

"কিরে, তুই এখনও যাস নি?" হঠাৎ খাবার ঘরে শিখাকে দেখে ওর মা বললেন কথাটা। ... ার জের টানেন সুবালা দেবী, "মেয়ের আমার পড়াশোনার খুব ঝোঁক"—কিন্তু পি াধহয় সে কথাটা শুনতে পেলেন না। গম্ভীরভাবে বললেন "সুবালা, মেয়েকে এবার পরাও। ঐ পায়জামা আর ফ্রক পরে বেড়ান আমার মোটেই পছন্দ নয়।" খাবার ঘ আবহাওয়াটা ভারী হয়ে ওঠে। যে রুমালটা খুঁজতে শিখা এ ঘরে ঢুকেছিল তা আর হল না। সে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

যে মানুষটিকে ঘি এত আলোচনা সে কিন্তু একটুও চিন্তিত নয়। তার নিজের জগৎ তার পড়ার ঘরে, দী রিদ্রের দুঃখমোচনের চিন্তায়—যেখানে সে একা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গাছে ওঠা, সাইকেল চা রাইফেল ছোঁড়া, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটায় যেমন পটু তেমনি পড়াশোনায় বরাব সে ভাল। ছুটির সময় বস্তীর ছেলেমেয়েদের অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেয় আবার মাঝে ঝে তাদের কি করলে উন্নত করা যায় ভাবতে বসে। সকাল থেকে হাসি আনন্দের মধ্য দি বেশ কাটছিল কিন্তু রাত্রের এই আলোচনাটা তার কানে যেতে হঠাৎ সে বিষণ্ণ হয়ে প অথচ বিষয় এমনই যে বাবা, মা কিংবা দাদাদের সঙ্গে

আলোচনা করতে ইচ্ছে করে না। তার বন্ধুদের মধ্যে দু-একজনের অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে, তাদের বিয়েতে খুব উৎসাহের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিল। আজ হঠাৎ তার বিয়ের কথাটা এমন করে উঠে পড়ায় সে কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ে। অবশ্য কলেজে সে পড়বেই। বইপত্র কেনাও কিছু হয়ে গেছে তবু আজ একটা অজানা আশঙ্কা তার মনকে থেকে থেকে বিচলিত করে তুলছে।

ঢং ঢং করে দশটা বাজল। মফস্বল শহরে ঘুমের আমেজ এসে গেছে। বাড়ির সবাই এতক্ষণ শোবার আয়োজন করছেন। শিখার পিসেমশাই বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে একটা চুরুট ধরালেন। শিখা আস্তে আস্তে গিয়ে পিসেমশাই-এর পায়ের কাছে বসল। শিখার পিসেমশাই উমানাথবাবু সরকারী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের নানা জায়গায় কাজ করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। উমানাথবাবু কথাবার্তা একটু কমই বলেন। শিখাকে নিঃশব্দে বসে থাকতে দেখে বললেন, "কিরে, এমা চুপচাপ কেন ? কিছু বলবি ?" শিখা আর নিজেকে সামলাতে পারল না, অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে বলল, "পিসেমশাই, আমাকে বিদায় করতে পারলে আপনারা খুব নিশ্চিন্ত হন,—না ?"

উমানাথবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তোমার কোন আনন্দ হচ্ছে না।" পিসেমশাই যখন কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে কথা বলেন তখনই তুই থেকে তুমিতে চলে যান এটা শিখা বরাবরই দেখেছে। চুরুটে একটা হালকা টান দিয়ে উমানাথবাবু বললেন, "আচ্ছা ভেবে দেখ যখন তোমার বাবা-মা থাকবেন না তখন কার ওপর তুমি নির্ভর করবে ? কে তোমাকে দেখবে ?"

"আচ্ছা পিসেমশাই, বিয়ের পরই তো অনেক মেয়ের স্বামী মারা যান তাতে মেয়েরা দুঃখ পায় খুবই, কিন্তু যদি তাদের নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি থাকে তবে কি তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না ?"

শিখার কাছ থেকে এধরনের জবাব আশা করেন নি উমানাথবাবু। সেদিনের ছোট্ট মেয়েটা এমন গুছিয়ে কথা বলতে শিখল কবে ? কথাটাকে হালকা করার জন্য তিনি বললেন, "আরে অল্প কয়েকজনের কথা রেখে দাও, বেশীর ভাগ লোকই তো বিয়ে-থা করে সংসার করছে।"

"পিসেমশাই, চিরাচরিতভাবে লোক যা করে তার বাইরেও কিছু লোক থাকে আর তাদের নিজস্ব মত একটা থাকেই। এক অজানা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে সারাজীবন পরগাছার মত কাটান বোকামী নয় কি ? আরো একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন"—শিখা একটু থামল, উমানাথবাবু সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—"বল, তোমার যা বলবার নিঃসঙ্কোচে বলতে পার।" শিখা বলল, "ধরুন, আমার বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে মতের মিল নাও হতে পারে—সেখানে ... অশান্তি লেগেই থাকবে।" উমানাথবাবু বললেন, "তোমার কি বিশেষ কোন ছেলেকে পছন্দ ? তাকেই বুঝি বিয়ে

করতে চাও ?" শিখা কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "না পিসেমশাই, সেরকম কিছু নয়। আমি অন্যধরনের চিন্তা করছি। আমি সকলকে ভাইবোনের মত ভালবাসি। বর্তমান দুর্দিনে চারিদিকে নানা সমস্যার দিনে ছেলেরা যদি কেবল পরিবার পুষ্ট করে চলে এবং মেয়েরা যদি আপন সংসার ও সন্তানদের মাঝে জড়িয়ে পড়ে, তবে মহত্তর, বৃহত্তর বিপ্লব তো আমাদের দেশে কোনদিনই সম্ভব হবে না। আমার মনে হয় বিয়ের পর মানুষ কিছুটা আত্মসুখী হয়ে পড়ে, আদর্শের চেয়ে নিজের ও নিজের পরিবারের কথাই বেশী করে ভাবতে শেখে।

"আমার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র। এঁরা যদি সংসারী হয়ে পড়তেন তাহলে কি নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য এতটা কাজ করতে পারতেন ? কে জানে ?"

রাত অনেক হয়েছে। দূর নদীবক্ষে একটা স্টীমারের দূরাগত বংশীধ্বনি মনকে থেকে থেকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। উমানাথবাবুর শোবার সময় হয়ে গেছে কিন্তু তিনি শিখার সব কথা না শুনে উঠতে চাইছিলেন না। শিখা তখনও একভাবে বসে আছে। নিভে-যাওয়া চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন উমানাথবাবু।

শিখা আবার বলতে শুরু করল, "পিসেমশাই, আমার মধ্যে স্বার্থপরতার ভাব আসবার আগেই আমি তাকে নির্মূল করতে চাই, আপনারা তাতে বাধা দেবেন না ; যে সত্য আমি উপলব্ধি করেছি বাস্তব জীবনে তাকে প্রকাশ করতে চাই।"

পিসেমশাই অন্যমনস্কভাবে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বারান্দায় কয়েকবার পায়চারি করে শিখার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সস্নেহে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—"তোমার প্রচেষ্টায় আমার শুভ কামনা সময় থাকবে, আর"—কথাটা বলতে গিয়ে পিসেমশাই একটু থামলেন—"তোমার পথে যাতে কোন কাজ না হয় তা আমি দেখব।"

উমানাথবাবু নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। বারান্দার মৃদু আলোতে তাঁর চোখের কোণটা চিক্‌চিক্ করে উঠল।

চিরসাথী

বিষ্ণুপদ উকীল

চতুর্থ বর্ষ, অর্থনীতি

সবাই যেদিন অন্তরে মোর হানবে কঠিন বাজ,
ওরা যেদিন বুঝবে আমায় ভুল ;
হাঁপিয়ে যবে উঠবে পরান অন্ধকারের মা
তোমার মাঝে পাবই খুঁজে আলো উপকূল ।

জীবনসিন্ধু 'পরে আমার হৃদয়-তরীখানি
ভাসিয়ে দিলেম স্বপন দিয়ে ভরি ;
দুখের রাতে আসবে তুফান উঠবে লহর জা
ডুবাতে আমার কনকভরা তরী ।

দুই পারেতে নামবে আঁধার, ঢেউএর চাপে ভাঙবে বেলাভূমি,
চিকুর-হাসি হাসবে বিধি দূরদিগন্তকে ;
অন্ধকারের ওপার থেকে, প্রভু ! অভয় দি মি—
শুধু তোমারি আদেশ হৃদয় যেন শো

বন্ধু যদি না-ই মিলে মোর বন্ধুভরা হাটে,
দুঃখে হিয়া কাঁদবে না মোর তবে ;
শুধু তোমারি সাথে যেন গো মোর উজল বে ট,
অনন্ত হে, তুমিই আমার বন্ধু হয়ে রবে

সবাই মোরে করুক আঘাত, আগুন জালাক ত.
সামনে থাকুক তপ্ত মরুর ছবি ;
সকল জালা জুড়িয়ে যাবে হৃদয়সমাধিতে
লাগলে তব প্রেমের পরশ, কবি !

সবাই মোরে কাঁদায় যদি, কাঁদাক প্রভু অ
হাসির ছোঁয়া নাই বা দিল প্রাণে

চোখের জলে নয়তো হল সাগর রচার কাজ,
বক্ষ না হয় ভেসেই গেল বানে।

তুমি কেবল থেকো প্রভু হয়ে আমার সাথী,
মুছিয়ে দিও অরুণ আঁখির জল ;
যতন ক'রে রাখব ঘরে আসন তোমার পাতি',
স্নিগ্ধ, সখা ! কোরো চিত্ততল।

যদি কেউ না আসে আমার পাশে, না শোনে মোর গান,
নিভবে যেদি আমার দীপের শিখা ;
ওগো প্রেমিক, সঙ্গে থেকে অভয় কোরো দান,—
লুপ্ত কোরে রাতের বিভীষিকা।

জীবনের এই সাগ বেলায় ঘূর্ণি হাওয়া এলে
ভাঙ্গবে য সাধের খেলাঘর ;
বন্ধুরা সব, জানি প্রিয়, আমায় যাবে ফেলে
একলা র বইব যতেক ঝড়।

সব হারিয়ে র ড়ে তিমির-তীরে একা,
শূন্যত পূর্ণ রব আমি ;
রিও রে দাও যদি হে, দেখা,—
শূন্য য়ায় তোমার পূর্ণ করো, স্বামি !

স্মিতা সরকার

মলয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ, দর্শন

'শুনুন একটু।'

বেশ চমকে উঠলুম। বামাকণ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে তাকালুম ; ফলে চটির স্ট্র্যাপটা জবাব দিল। রাত তখন এগারটা। ট্রামের নড়বড়ে দেহের ধড়ঘড়ানি শব্দ স্তব্ধ। বাসটা লাস্ট কার, হু হু করে চলছিল। ঘণ্টার আওয়াজে আর্তনাদ ক'রে কাতরাতে কাতরাতে থামল। গাড়ি আবার এগিয়ে চলল স্টপেজ পেরিয়ে। আমার অনেক কসরতের পরেও নামা হল না। না মেয়েটা দেখতে সত্যিই ভালো। ফিটফাট চেহারা, জৌলুস আছে ; তারপর মাজাঘষায় আরো রূপ উপছে পড়ছে। চুলের প্রান্তে ঘোড়ার লেজ, ফিকে সবজে রঙের ম্যাচ করে জামাকাপড়, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে এখনকার চলতি একটা ঝুড়ি।

আমার চোখে তখন অবাক বিস্ময় ; মহাসমুদ্রের গভীরতা নিয়ে সে আমায় দেখছে। আমার হার্টের গতিটা বেড়ে উঠেছে, পাল্‌স্ রেট নর্মাল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মৌন এক মুহূর্ত ; আমার কাছে এক যুগ। বাসের কণ্ডাকটারটা তার অপাঙ্গ ইঙ্গিতে আমায় বিদ্ধ করছে। উৎসুক যাত্রীরা রহস্যের গন্ধ পেয়ে ঝিমুনো বন্ধ করেছে। দু'একজন ছোকরাও মধ্যযুগের নাইটদের মত শিভালরি দেখাতে প্রস্তুত হয়ে উঠে।

নির্বিকার শুধু কর্ণধার চালক। পরের স্টপে গাড়ি থামল। প্রথমে ভেবেছিলুম মেয়েটাই শুধরে দেবে, বলবে, 'ক্ষমা করুন, ভুল করেছি।' কারণ প্রমীলা-রাজ্যের সঙ্গে আমার মত মুখচোরা ছেলের পরিচয় খুবই সামান্য। না, সেদিকে পা বাড়ায় না।

প্রথমটা বেশ থতমত খাই। তারপর মনের গুপ্ত গোপন সন্ধান চালাই। হ্যাঁ, এযে সেই দু'দিন আগে দেখা মেয়েটা। অফিস বাসেই এর সঙ্গে সামান্য পরিচয়। গাড়িতে তখন ভীষণ ভিড় ; পোর্টফলিও ব্যাগকে নিয়ে দাঁড়াতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। লেডিজ সীটের পাশে তখন দাঁড়িয়ে। এই সুবেশা নারীই ব্যাগটা সযত্নে চেয়ে নিলেন নিজের হাতে, তারপর কোলের উপর। বোঝা খুবই কমল। ধন্যবাদ জানালুম ; উনি মৃদু হাসলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটার পাশের মধ্যবয়সী নারীটি নামলেন। আমার অভাবিত বসার সুযোগ মিলল। এক অদৃষ্টপূর্ব শিহরনের আস্বাদন। মনে হল আজ দিনটা বড় ভাল, কাজের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ যে আমার অফিসের টেবিলে জমেছে তাও ভুলে গেলুম। এক স্বল্পসময়ে হল অল্প আলাপ। পরিচয় দেওয়া নেওয়ার। নাম তার স্মিতা সরকার। বাড়ি তার বনেদী পাড়ায়। চেহারার আভিজাত্য বংশের আভিজাত্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

(২)

সামান্য সময়ের সংলাপ। তবুও সুগভীর এর প্রভাব। সপ্তাহের কাজ একদিনেই সারলুম। মিঃ ব্যাক আমার বস। কাজে পরিতুষ্ট হয়ে প্রমোশনের সুপারিশও করলেন। কিন্তু এত সবের পরেও ভুলে গেছি মেয়েটাকে! মনে মনে ভাবলুম কী হতভাগাই না হয়েছি!

এবার ওর দিকে সমীহের সলজ্জ হাসি হাসলুম। ওরও মুখে বিদ্যুতের ঝিলিক। তাঁর ইঙ্গিতে গাড়ি থেকে নামলুম। একান্ত অনুগত সামন্ত।

'চলুন ঐ পার্কে বসি!'

আমি তটস্থ হয়ে সায় দিই। তারপর সাহস সঞ্চয় করি। ডেল কার্নেগীর ধার করা বিদ্যেতে প্রশস্তি শুরু করি তার চেহারার। শুনেছিলুম মেয়েরা নার্সিজমের রুগী!

দরাজ গলায় বলি, 'বাঃ, কি সুন্দর মানিয়েছে আপনাকে!'

'তাই নাকি?' কণ্ঠে তা অবাক-বিস্ময়।

তারপর সেই তূণটাই ছুঁড়ে আমার দিকে। 'আপনাকেও ত খুব ভালো দেখাচ্ছে!'

আমি বলি, 'ওসব ফর্মা টি রাখুন!' তবে মনে মনে বিরাট আলোড়ন জাগে, সেও আমায় এপ্রুভ করেছে। এত ক্ষণে মাঠে পৌঁছে গেছি। কিন্তু না, এখানে একটাও বেঞ্চি খালি নেই। বুড়োরাই য় সব দখল করে রেখেছে।

আবার আহ্বান, 'আসু ঐ ঘাসের উপর আমরা বসি।' আমি কোন্ সময়ই বা গররাজী? তবে একটু বাি বলি, 'বেঞ্চের চেয়ে ঘাসে বসলেই বেশী আরাম হবে!' অবশ্য বলেছি মনের ভাব এ ম চেপে; পাটভাঙ্গা প্যাণ্টের শোক তখনও মনে দগদগ করছে। বসলুম দুজনে; মু ; মাঝখানে হাতখানেকের তফাত। আজকের প্রশ্নকর্তা ও, আমি মুগ্ধ উত্তরদাতা সিনেমা থেকে শুরু করে, গড়ের মাঠে মোহনবাগান পর্যন্ত। ও ঘড়ি দেখে, আমিও 'সাড়ে এগারটা।' আমরা উঠে পড়ি। আমি বলি, 'আজকের দিনটা মনে রাখ ।'

স্মিতা বলে, 'দোহা আপনার, এত বাড়িয়ে বলবেন না।' কথাটা স্তুতির মত কানে এসে লাগে। যাবার আগে ওই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে সন্ধ্যে ছটায় ভবানীপুরের কফি হাউসে! আমি মাথা নাড়ি, দ্ব্যর্থহীন উত্তর। সেদিন আর অফিস যাই নি। স্মিতার কথা ভাবতেই সময় কেটে গেল। সাড়ে পাঁচটায় আমি হাজির; ও কিন্তু সময়নিষ্ঠ। সামনে এসে বসল। দু'প্রস্থ কফি আর স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিই।

স্মিতা বলে, 'বড্ড গরম, তাই দেরী হয়ে গেল।' আমি বিগলিতপ্রাণ, বলি, 'ঠিক সময়েই এসেছেন। আমিই একটু ফাস্ট!'

ও হাসে, কৌতুক করে বলে, 'এখানে আসার খুব লোভ বুঝি আপনার!' আমার মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে পড়ে, 'আপনার সঙ্গে দেখা করার—'

ও হাসে আবার, আমার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি। আজকের আলোচনা একটু বেশী এ্যাকাডেমিক। আধুনিক কবিতা, সাহিত্য সমালোচনার মধ্যেই সময় কাটে বেশী। উঠে পড়ে আটটার সময়, মনে হয় কি যেন বলি বলি ক'রেও বলতে পারছে না। আমি ভাবি এও কি মুখচোরা ঠিক আমার মতো।

ও রবিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দেখা করতে বলে। সন্ধেবেলায়। আমি সেখানেও হাজির। ও আসে। জলের ধারে ঘাসের উপর একটু নিবিষ্ট হয়েই বসি। সঙ্কল্প করি আজই সব বলে ফেলব।

ও বলে, 'বাড়ি করুন।' আমি আঁতকে উঠি। এসব কি এনগেজমেণ্টের আগে কনডিশান! গাড়ির প্রসঙ্গে আসে। এ্যাকসিডেণ্টের কথাও পাড়ে। জানিয়ে দেয় কার ইনসিওরেন্স করলে আর্থিক লোকসান মিটবে। অনেক লোকই নাকি আজকাল এ্যাকসিডেণ্ট ক'রে পুরানো গাড়ি সারিয়ে নতুন গাড়ি কিনছে। তারপর আসে বাড়ির সকলের কথা, আমার জীবনবীমা করার উপদেশ, স্বাস্থ্য মেনে চলার কথা। আমি মনে মনে ভাবি মেয়েরা কত কথাই না ভেবে ফেলে এত তাড়াতাড়ি। মাঝে মাঝে তারিফ করি তার বিষয়বুদ্ধির। ও প্রশংসা শুনে আরো জোর দেয় জীবনবীমা করার। আমি নীরবে ঘাড় নাড়ি। জীবনবীমা আমার পছন্দসই নয়। নিজে প্রিমিয়াম দিয়ে ভবিষ্যতে আমার আত্মীয়স্বজন পাবে এ আমি পছন্দ করি না। তবে স্মিতা পাবে? সে কথা স্বতন্ত্র। ঈষৎ সায় দিই ওর কথায়। ভয় হয় এই সব সামান্য মতানৈক্যে যদি স্মিতা ধরা না দেয়! রাত বেশ গভীর হয়ে উঠেছে। আমরা উঠে পড়ি। আবার আমি অফিসে ওকে দেখা করতে বলি। স্মিতা স্মিত হাসি হেসে রাজী হয়ে যায়।

মন আনন্দে ভরপুর। যে এত ভাবছে আমার জন্যে সে কি আমায় ব্যর্থ করতে পারে? মনে মনে ভাবি বন্ধুদের দেখিয়ে দেব আমার চয়েস কি রকম! দেখিয়ে দেব, তাদের টেক্কা দিয়েছি!

ক্লাবের মণ্টুদা এই প্রেমে পড়তে খুবই এক্সপার্ট। চার চার জনকে খেলিয়ে রেণুদিকে নিয়েছেন। তবে আমার স্মিতা মণ্টুদার চয়েসকেও হার মানিয়ে দেবে। রেণুদির রঙটা একটু চাপা! ক্লাবে যাওয়া অনেকদিন বন্ধ করেছিলুম। কিন্তু আমার মন বলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তাই বকেয়া খাজনা নিয়ে হাজির হই।

সব শুনে মণ্টুদা বলে, 'আরে তুই যে দেখছি ডুবে ডুবে জল খাস!' মণ্টুদা আবার সব রসিয়ে রসিয়ে বলে চণ্ডীকে।

চণ্ডী বলে, 'প্রেমেতে পড়ে অনেকেই, যেমন অনেকে পড়ে খানায় ডোবায়। কিন্তু দেখিস্ হাড়গোড়-ভাঙা 'দ' হয়ে যাস নি।'

মণ্টুদার অভিজ্ঞতা অনেক; তাই বলে, 'আরে এত এখন লাভ এ্যাট ফার্স্ট সাইটের মত নয়, ছোট ফোড়া ছিল, এখন সেটা টিউমারে দাঁড়িয়ে গেছে।'

আমি চুপ ক'রে থাকি। অপরের সময় আমি বলেছি। তবুও রোমান্টিক হিরো মনে ক'রে খুব খুশী হই। সকলে ধরে বসে সামান্য জলযোগের জন্যে। আজ এড়ানোর জো নেই। চায়ের পর্ব চলে।

পরের দিন সন্ধে। ফিরছিলাম অফিস থেকে। এসপ্লানেডের কাছেই ঘাড় ফেরাতে চোখে পড়ল একটা দৃশ্য। দেখলুম স্মিতা দাঁড়িয়ে, সঙ্গে সুগ্রীব। ওরা হাতে হাত দিয়ে, তন্ময় হয়ে। আমি ফানুসের মত চুপসে গেলুম। আমার নিষ্ফল আক্রোশ।

মেজাজ সপ্তমে চড়ে গিয়েছিল। বাসের মধ্যেই একজনের সঙ্গে এক পসলা ঝগড়া হয়ে গেল। লোকটা নেমে বাঁচল। আমার সাময়িক বিজয়।

রাতে বিছানায় এপাশ ওপাশ করি। ঘুম বিদায় নিয়েছে, মাথায় তখনও আগুন জলছে। নিজের উপর নিজের রাগ হচ্ছে। নেমে সুগ্রীবটার সামনে স্মিতার পরিচয়টা বের করে দিলেই বোধ হয় ভাল হত। আমার মত ওটারও ঘুম হত না। তবে আমার নার্ভের অনেক জোর। নইলে এই স্বর্গ থেকে বিদায়ের পর অনেকেই সুইসাইড করে। না, আমি ঠিক করলুম ইতিহাসের নায়ক আমি হব না। ভুলব স্মিতাকে। না তাও সম্ভব হল না।

দু'দিন পরে অফিসে।

দরওয়ান ভিজিটারের স্লিপটা সামনে রাখল। নাম পড়লুম স্মিতা সরকার। প্রথমে ভাবলুম হাঁকিয়ে দিই, ওর সঙ্গে দেখা আর আমি করব না। কিন্তু দুর্বার আকর্ষণ!

দরজা ঠেলে ও ঢুকল; আজও প্রসাধন। আহত পৌরুষ আজ খ্যাপা কুকুরের মত। কাজের ফাঁকে যেন মুখ তুলবার অবকাশ পাই না। ও নির্বিকার! কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে দেখি ও আমাকেই দেখছে।

এবার আমি ফেটে পড়ি।

বলি, 'কেন অসময়ে অফিসে?' ও বলে, 'আপনিই ত বলেছিলেন।' হাতে ব্যাগের মধ্যে থেকে কীসব কাগজপত্র বার করতে থাকে!

আমি যুক্তি দেখাই, 'সেদিন আপনার সব জানতুম না।'

ওর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। আমি বাঁকা ইঙ্গিতে পরিষ্কার করে দিই সেদিনের সেই বিসদৃশ দৃশ্য।

ও একান্তভাবে জবাব দেয়, 'ও আমার স্বামী।'

স্বর সপ্তমে চড়িয়ে দিই, 'আগে থেকে রেড সিগন্যালটা চাপালে এতদূর এগোতুম না।'

চুলের ছোট্ট আচ্ছাদন সরিয়ে দেখায় সিঁথিতে একটু লালের ছোঁয়া!

আমার উচ্চগ্রাম এবার খাদে নামে।

ও এর পরেও নিজের বিষয় ফাঁদে। জানায় ও একজন জীবনবীমার এজেণ্ট, আমাকে বড় কাপ্তেন ঠাউরেছে। অভাবের সংসার। স্বামীসঙ্গে স্ত্রীও কর্মক্ষেত্রে।

স্মিতা বলে, 'এই বীমার কমিশনে বাচ্ছাটার এমাসের দুধের দাম উঠে আসবে।'

আমি এতক্ষণে অতলে তলিয়ে গেছি। প্রিয়া—সংসার—জীবনবীমার এজেণ্ট স্মিতা সরকার—সন্তানের জননী ঃ না সবই জার্মান সিলভার!

আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ একটি প্রশ্ন

রামেশ্বর শ'

ষষ্ঠ বর্ষ, বাংলা

কৃষ্টির ধারাকে বলতে চাই নদীর ধারা। সে ধারা কখনো দু'কূল ছাপিয়ে ওঠে, কখনো ক্ষীণপ্রাণ হয়ে বয়ে চলে, কখনো আবার শুকিয়ে যায় একেবারে। কৃষ্টির এই প্রবাহ যখন মন্থর হয়ে আসে, তখন বান ডেকে যায় সেখানে ক্রান্তির নবোচ্ছ্বাসে। একে বলি, ইতিহাসের অমোঘ বিধান। ক্রান্তির বন্যা না এলে জীবনে এবং সমাজে নতুন প্রাণ পেতাম না। প্রাণ না পেলে প্রগতি হত না।

সাহিত্যেকে ধরেছি কৃষ্টির অন্যতম অঙ্গ বলে। সাহিত্যেও তাই আসে যুগে যুগে ক্রান্তি। ক্রান্তি নিয়ে আসে প্রাণ। প্রাণ চলে প্রগতির পথে এগিয়ে।

বাংলা সাহিত্যে—বাংলা কাব্যে—এমনি দু'টো বড় ক্রান্তিকাল হল ষোড়শ শতকের চৈতন্য-যুগ আর উনিশ শতকের রিনাইস্যান্স্। দু'টোই, দেখেছি, বাঙ্গালীর দু'টো বড় নব-জাগরণের—নতুন সংগঠনের যুগ। আমাদের সমাজে সভ্যতার উৎক্রান্তিমুখীনতার দু'টো বড়ো ইতিহাস বিধৃত রয়েছে এই দুই ক্রান্তিকালে। তার পরে, বলা হয়, আর একবার ক্রান্তি এসেছে বাংলা কাব্যে, বাংলা সাহিত্যে। এই ক্রান্তি অবশ্য আগের দুটোর মতো কোন মহৎ আত্ম-উদ্বোধনের, কোন নব-সংগঠনের ইতিহাসকে আশ্রয় করে নেই। বরং একটা বিরাট ভাঙনের বিষাদময় স্বীকৃতিতেই এই ক্রান্তিকালের সাহিত্যের সংগঠন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ক্রান্তিকালের অভিধা দিয়েছেন অনেকে—'কল্লোল যুগ'।

বাংলা কাব্যে যুদ্ধোত্তর ক্ষয়িষ্ণুতা ও ভাঙনের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে এই যে 'কল্লোল যুগ' আজ তো তার সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের কোন ব্যবধান নেই। একজন পশ্চিমী কবি আমাদের কাছে এই যুগের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছেন—

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang, but a whimper !

—T. S. Eliot : 'The Hollow Men.'

মনে হয়েছে এ যুগ চরম নারকীয় যন্ত্রণার যুগ : এই নরকের গানই হয়েছে এ যুগের কবির সামগান—

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রামিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ ।
অতএব পরিত্রাণ নাই ।···

—সুধীন্দ্রনাথ : 'নরক' ।

এ যুগের ক্ষয়িষ্ণু জীবন তাই আত্মরক্ষার জন্যে আপ্রাণ যুদ্ধরত। এ জীবনে তাই অনেক আবর্ত, অনেক তির্যক্ গতি; অনেক জটিলতা। কাব্যেও তাই এল দুর্বোধ্যতা, দুরূহতা, বিক্ষিপ্ততা। এ যুগের কবি-সমালোচক এইজন্যেই বলতে বাধ্য হয়েছেন—

> Our civilisation comprehends great variety and complexity playing upon a refined sensibility, must produce various and complex results. The poet must become more and more comprehensive, more allusive, more indirect, in order to force, to disolate, if necessary, language into his meaning.
>
> —T. S. Eliot : 'Selected Essays', p. 289.

এ যুগের শিল্পোদ্যোগে, যন্ত্রজীবনে তাই বাস্তবতাই ধ্যান, এ যুগের অবসরের গানও হট্টগোলের আতঙ্কে পীড়িত। এসবই আমরা জানি—একই সুরে সবাই আমরা এই কথাই বলে আসছি! একটি প্রশ্ন কিন্তু এর পরে না এসে পারে না : আধুনিক যুগের গোলযোগে গলা-যোগ করেছেন এই যে আধুনিক কবিরা, তাঁদের সাধনার সিদ্ধি কি এইখানে ? জীবনে ও কাব্যে এই যে ক্ষয়িষ্ণু যুগ, এই কি আমাদের কৃষ্টির ধারার সাগর-সঙ্গম ?

এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের নিজেদের কাছে। আমাদের অন্তর-পুরুষ কি বর্তমান যুগ ও জীবনকে নিয়েই তৃপ্ত হয়েছে ? বর্তমান সমাজের ভাঙন ও চক্রাবর্তে নিষ্পিষ্ট হয়েই কি জীবনের মহত্তম সিদ্ধির আনন্দ পাব ? নিঃসন্দেহে আমাদের সকলের এক উত্তর হবে : বর্তমানকে আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু বর্তমানই আমাদের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। ভাঙন জীবনেরই একটা সত্য, কিন্তু এই ভাঙনও আর একটা মহত্তর সংগঠনের জন্যেই। নইলে ভাঙনের এমন স্বীকৃতি আমাদের কাছে হত না।

মৃত্যুকে আমরা চাই, কিন্তু মৃত্যুকে মৃত্যুর জন্যে চাই না। মৃত্যু আমাদের জীবনের সঞ্চিত আবর্জনাকে ধুয়ে জীবনকে করে শুদ্ধ, সুন্দর, বার বার তাকে ভেঙে নতুন করে গড়ে—এতেই জীবনে মৃত্যুর প্রয়োজন অনুস্যূত। মৃত্যুকে চাই না, চাই অমরত্বকে। মৃত্যু হয়েছে সেই অমৃত-সাধনার সহায় মাত্র। ভাঙন ও মৃত্যুর এই সার্থকতা যুদ্ধোত্তর বাংলা কাব্যের কবিরা হয়তো ধরতে পারেন নি, কিংবা অবসর হয়তো পান নি এত কথা ভাববার। হতে পারে, দুঃখ-মৃত্যু-ভাঙনকে আমরা চিরকাল স্বীকার করতে ভয় পেয়েছি বলেই তাঁরা আরো জোর গলায় তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। মৃত্যুর পথ অতিক্রম করেই হবে তাঁদের অমরত্ব লাভ, পিতামহ যেমন বলেছেন—

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

কিংবা মহাকবি দান্তে যেমন স্বর্গযাত্রার জন্যে প্রথমে নেমেছিলেন নরকে।

কিন্তু আজ আবার সেই প্রশ্ন উঠেছে,—দুঃখ-মৃত্যু-জরা-ভাঙন—এই কি জীবনের পরম প্রাপ্য, সর্বশেষ এষণা? এই প্রশ্নই আনতে চাইছে বাংলা কাব্যে আর এক ক্রান্তিকাল। কল্লোলের পরে একে বলব আর এক ক্রান্তিকাল, কিংবা তারই পরিপূরক দিব্যপরিণতি। বাংলা কাব্যে এই নতুন ক্রান্তির পদধ্বনি বেজেছে। কবি তাই নতুন দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছেন মৃত্যু ও তমিস্রার যথার্থ উপযোগিতা—

ডুবতে হবে মৃত্যুর তিমিরে
নয়তো কেমন করে বেঁচে উঠবে আবার?
লুপ্ত হতে হবে পাতালে
নয়তো কেমন করে ফিরে আসবে আলোয়?

—বুদ্ধদেব বসু : 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'।

কবি সেই অমৃতময় নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন—

তৃপ্তিহীন বিরহে তুমি জ্বলছো—
জ্বলতে দাও পুড়ে যাক যা-কিছু
তোমার পুরানো,
ডিমের খোলসের মত ফেটে যাক
তোমার পৃথিবী, বেরিয়ে আসুক
অন্য এক জগৎ……। —বুদ্ধদেব বসু : 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'।

এ যুগের এক কবি-মনীষী এই কথাই ঘোষণা করেছেন তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টি থেকে—

He has need of darkness to perceive some light,
And need of grief to feel some bliss,
He has need of death to find a greater life.

—Sri Aurobindo ; SAVITRI, Book III, Canto IV.

আমাদের বক্তব্য হল—প্রত্যেক নবযুগের জোয়ার তখন আসে, যখন প্রথমে থাকে একটা উত্তেজনা, উন্মাদনা, বিক্ষোভ, প্রচণ্ডতা। জাতির দৃষ্টি তার পরে হয়ে আসে শান্ত, প্রত্যয়বান ও সংগঠনশীল। বাংলা রিনাইস্যান্সের প্রথম পর্যায়ে এমনি দেখি 'হিন্দু কলেজ' ও 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রচণ্ড উন্মাদনা। একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন—It was more a destruction of the old than a construction of the new. এই আবেগ, এই উচ্ছ্বাস যখন শান্ত হয়ে এল, তখনই পেলাম প্রকৃত বড় সৃষ্টি, মহৎ সংগঠন। পেলাম যথার্থ নবযুগ-স্রষ্টা বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমকে। আমাদের আধুনিক কালেও এই প্রচণ্ডতা, এই কল্লোল আজ শান্ত হয়ে আসছে, জীবনদৃষ্টির বিক্ষুব্ধ ঘোলা-জল থিতিয়ে স্বচ্ছ হয়ে আসছে। এই স্বচ্ছতার জন্যেই জীবনের একটা লক্ষ্য, একটা অর্থ ধরা পড়ছে কবিদৃষ্টিতে। আধুনিক বাংলা কাব্যের যে পাঁচজনকে প্রধান ("major five") বলে ধরা হয়, তাঁদের জীবনদৃষ্টির মধ্যে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বা উঠছে একটা-না-একটা দৃঢ় প্রত্যয়। বুদ্ধদেব প্রেম ও কাব্য-সত্যে আস্থাবান্। সুধীন্দ্রনাথের 'নেতি'র উল্টো পিঠে রয়েছে 'ইতি'র পরোক্ষ স্বীকৃতি। বিষ্ণু দে সাম্যবাদী আদর্শে প্রত্যয়বান। এমনকি যে জীবনানন্দ ছিলেন 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি', তাঁরও কবিমানসে আসন পেতেছে রোমান্টিক সত্যের শেষ বিজয়ে অব্যভিচারী শ্রদ্ধা—

শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক !

—'নীলিমা'।

আর সবচেয়ে লক্ষণীয় অমিয় চক্রবর্তীর আশ্চর্য বিশিষ্ট সুর—নব্যবিজ্ঞান ও অমৃতবিদ্যাকে সমন্বিত করার, দিব্যসত্যের প্রতি আস্থার, এক বিশিষ্ট সুর—পরম পুরুষের কল্যাণধর্মে সুদৃঢ় প্রত্যয়—

তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।···
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

—'সংগতি'।

আধুনিক বাংলা কাব্যে নানাভাবে যিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন, সেই এলিয়টের জীবনেও দেখছি আশ্চর্য রূপান্তর। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে এই শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁর মনে হয়েছিল—এই জীবন ও জগতে আর কিছু উর্বরতা রইল না, সবই হল 'পোড়ো জমি' (Waste Land)—

Here is no water but only rock—
Rock and no water and sandy road.

সেই Waste Land ও Hollow Man-এর কবির জীবনদৃষ্টি ক্রমে আরো প্রশান্ত হল, প্রজ্ঞাবান হল। প্রবীণ প্রাজ্ঞ জীবনদর্শন যখন গড়ে উঠল, তখন এল প্রসন্ন নিরাসক্তি। কবি খুঁজে পেলেন অমৃতপুত্র মানুষের জীবন-সাধনার প্রকৃত যুগোপযোগী পথ —অহং থেকে মুক্তি ও নিষ্কাম কর্মসাধনা। 'অহংকে উত্তীর্ণ হবার সাধনাই তিনি করেছেন। এখন থেকে কর্মহীনতা নয়, নিষ্কাম কর্মই তাঁর লক্ষ্য। Waste Land-এর Inferno-র Four Quartets-এর এই Paradiso (নাকি এখনও Purgatorio ?) এমন এক অবাঙ্‌মনসোগোচর জগতের অবতারণা করেছে যেখানে মানুষের ভাষা প্রায় মন্ত্রের স্ফটিক-সংহত রূপ গ্রহণ করেছে।' আধুনিক বাংলা কাব্যজগতেও অনন্তের স্বাদ নিয়ে কেউ কেউ সাগর থেকে ফিরছেন। অনেকে আবার সাগর পানে নতুন করে যাত্রা করছেন। কণ্ঠে তাঁদের ব্যাকুল অমৃত-পিপাসা।

বাংলা কাব্যে এই স্বতন্ত্র সুরের আর এক অধিকারী হলেন কবি নিশিকান্ত। রবীন্দ্র-সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তিনি অপরিচিত হতে চলেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে অমৃত-সংবেদনা একটি গভীর তীব্র লিরিক অনুভূতিময় প্রকাশ লাভ করেছে। কল্লোলের পরে আধুনিক বাংলা কাব্যে এসেছে যে নতুন পর্যায়, কবি নিশিকান্ত তার মধ্যে সর্বাধিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

যুগ ও জীবনের জটিল সংঘাতে আধুনিক বাংলা কাব্যের সুর বিচিত্র। কারো সুরে 'নেতি', কারো 'ইতি', কারো বা 'অজ্ঞেয়বাদ'। কিন্তু সকলেরই সোচ্চার আত্মঘোষণার মধ্যে একটা দৃঢ় প্রত্যয় ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দৃঢ় প্রত্যয়ই উত্তর-ক্ষয়িষ্ণু যুগের (post-decadent period) একটা ইতিমূলক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আনে। ইতিহাসের এই সাক্ষ্য।

স্বপ্নের জগৎ বাস্তব হ'তে বহুদূরে

অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ, পদার্থবিজ্ঞান

প্রীতম, যখন তোর অবাক দৃষ্টি এই পরিচিত অক্ষরগুলোর মাঝে বিচরণ করবে কৌতূহলচরিতার্থতায়, তখন হয়তো আমার বিচার সাঙ্গ হয়েছে। ইতালীর কোন অজানা স্টুডিওতে তোর 'মডেল' যখন অবাক হবে তোকে হঠাৎ বিচলিত দেখে, তখন হয়তো আমার মামলার রায় বেরিয়ে গেছে। হয়তো তখন আমি চরম শাস্তির প্রতীক্ষারত। জানি, তখন তোর আর করার কিছু থাকবে না। সব জেনে কিছু করার ইচ্ছেও থাকবে না তোর। ঘৃণায়, লজ্জায় ভুলে যেতে চাইবি সমস্তই—তোর, আমার আর নীলিমার—আমাদের 'ত্রিভুজে'র স্মৃতিজড়িত ঘটনাবলীকে স্থান দিবি বিস্মরণের কোঠায়। কিন্তু তবুও তোকে সব কথা না বলে থাকতে পারছি না। ইতালী যাবার আগে তোর নিরীহ জিজ্ঞাসাটা আজ আলিপুরের বিলাসবহুল এক কক্ষে ক্লান্ত এক প্রাণের সব সুপ্তি চুরি করে নিচ্ছে। প্লেনে চড়বার আগে আবেগে আমার হাতদুটো ধরে যে বেদনায় তোর জিজ্ঞাসা মুখরিত হয়েছিলো, তার নিবিড়তা আর অকৃত্রিমতা আমি জানতাম। উত্তরও আমার জানা ছিল, প্রীতম। সেই ডিসেম্বরের সকালে হাতে হাত রেখে শুনলাম তোর জিজ্ঞাসা :

—"কেন এলো না ; নীলিমা আজও কেন এলো না, সুপ্রিয় ?"

সেদিন আমিও উত্তর দিতে পারতাম, প্রীতম। বলতে পারতাম যে তার কলঙ্কিত কৌমার্যের স্বাক্ষর বহন করে তোর সামনে সে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু উত্তরটা আমার বলা হয় নি, প্রীতম। তোর বেদনাতুর জিজ্ঞাসু চোখ দুটোর ঐ নিরীহ দৃষ্টিকে কঠিনতর আঘাতে সজল ক'রে দিতে সংকোচ বোধ করেছিলাম। কিন্তু আজ আর কোন সংকোচ নয়, প্রীতম। আজ সব কথাই তোকে জানাবো।

আমাদের 'ত্রিভুজ'-এর কথা তোর মনে আছে ? তুই, আমি আর নীলি ; প্রীতম রায়, সুপ্রিয় চৌধুরী আর নীলিমা মল্লিক। মনে আছে, প্রীতম ? মনে আছে কলেজের সেই দিনগুলো ?—'ত্রিভুজ'-এর সেই নিষ্কাম বন্ধুত্বের স্মৃতি। আমাদের জগৎ ছিল আলাদা। 'ত্রিভুজ'-এর জগত। সেখানে তুই, আমি আর নীলিমা বাদে আর সবারই ভূমিকা ছিল আগন্তুকের। মনে আছে ? মনে না থাকলেও আজ সব কথাই মনে করতে হবে নতুন করে। নয়তো আমার অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করতে চাইবে তোর বন্ধুবৎসল মন। তাই 'ত্রিভুজ'-এর কথা তোকে স্মরণ করতে হবেই।

সেখানে দু'টি শিল্পী মন বুনে চলতো পৃথক জাল একটি সুন্দর ভাবপ্রবণতাকে ঘিরে। কলেজের নামকরা আর্টিষ্ট প্রীতম রায়ের তুলি আর ইউনিভার্সিটির কৃতী ছাত্র সুপ্রিয়

চৌধুরীর কলম ব্যস্ত ছিল নীলিমা মল্লিক নামে কোন সেন্টিমেন্টের সার্থক রূপায়ণে ক্যানভাস আর কাগজের বুকে। তোর ক্যানভাসে অঙ্কিত হত নীলিমার পশ্চিমী 'ফিগার'-এর সাথে অ্যামালগামের পারদের মতো আঁটা মিষ্টি মুখটা অপূর্ব দক্ষতায় আর আমার লেখনী যে মোহনীয় 'মানসীর' বন্দনায় আকুল হত কাগজের বুকে তার মোহনীয়তার উৎস ছিল ঐ নীলিমা মল্লিকের লোভনীয় সঙ্গই। সরস, প্রাণবন্ত এক বন্ধনে বাঁধা ছিলাম আমরা।

মনে পড়ে কলেজের সেই সবুজ 'লন'টা? আমরা আসর সাজাতাম ওর বুকে প্রতি ঋতুর প্রতিটি দিনে।

তুই চলে যাবার পরও কলেজে গেছি। দেখেছি সেই পুরাতনের পুনরাবর্তন নবরূপে। প্রীতম, পাঁচটা ঋতুর হার্ডল পেরিয়ে সেই বসন্ত এখনো আসে। কলেজের 'লন'টা এখনও সবুজ—ঘাড়কাটা কবন্ধ ঘাসগুলো আজও ওর নরম অসমতল বুকটা আগলে রাখে ঘন অন্তরঙ্গতায়।

তোর কথা জানি না, প্রীতম, কিন্তু আমার চোখ জ্বলতো, লোভ জ্বলতো—প্রকাশের পথ ছিল না যদিও কালচারের দেওয়াল ভেদ ক'রে। মনও জ্বলতো। তখন বাতাসে গা ঢেলে রোমাঞ্চকর আবেশ অনুভব করতাম, ফাঁকা 'পিরিয়ড'গুলোর ফাঁক বেয়ে যে রোদটুকু আসতো, তাতে পেতাম তারুণ্যের আমেজ। আজ একবছর বাদে সেই সুপ্রিয়কে আর পাবি না, প্রীতম। সে সুপ্রিয়ের মৃত্যু ঘটেছে আজ প্রকাশিত লোভের তাড়নায়।

স্বপ্নের জগৎ বাস্তব হ'তে বহুদূরে। জানতাম আমরা তবুও স্বপ্ন দেখেছিলেম। স্বপ্ন দেখেছিলো 'ত্রিভুজে'র তিনটি বাহুই। গর্ব করেছিলো—'ত্রিভুজে'র বন্ধন শুধু বাহু দিয়েই নয়, তার চেয়েও মৌলিক কিছু দিয়ে। বলেছিলেম আমরা, 'ত্রিভুজে'র আত্মা তিনটি নয়—একটি।

দীপাঞ্জনকে মনে আছে তোর? হাত-পা নেড়ে তর্ক করতো ছেলেটা। 'ত্রিভুজ'-এর এক কোণ বাদ দিয়ে সরলরেখায় রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা তুলে সতর্ক করতো আমাদের। আমি প্রতিবাদ জানাতাম। তর্ক করতাম আবেগ দিয়ে। কথার তরঙ্গ তুলতাম। তুই হাসতিস্। নীলিমাও। 'মরালিস্ট' সুপ্রিয় চৌধুরীর দামী কথার ফুঁয়ে নিবে যেতো দীপাঞ্জন। আর তোদের হাসির অন্তরালে কোন বিদ্রূপের অস্তিত্ব সম্ভাবনায় ব্যস্ত হতো আমার দুর্বল মন। আমার নীতিবাদিতায় তোদের আস্থার পরিমাপ করতাম আমি। তোর যে আস্থা ছিল আমার ওপর, আমার আদর্শবাদী মনের ওপর তা' আমি অনুভব করতাম। খুশী হতাম খুবই। কিন্তু তুই কি জানিস্, প্রীতম, মুখে যতোই নিষ্কাম বন্ধুত্বের গর্ব করি না আমি, আমার মোহনীয় 'মানসী'র লোভনীয় সঙ্গ আকুল করতো আমায়? তুই কি জানিস্, আমার বাহ্যিক বৈরাগ্যের মুখোশের নীচে দুটো ক্ষুধার্ত চোখ জ্বলতো অতৃপ্ত কামনায়? যখন গর্ব করেছি নিছক বন্ধুত্বের, বলেছি বাসনা কামনা হ'তে বহুদূরের

কথা, তখন কামনার লালাসিক্ত জিহ্বাটাকে গোপন করেছি কী কষ্টকর প্রয়াসে, জানিস্ তা' প্রীতম ? বোধহয় এতক্ষণে তোর আমার ওপর শ্রদ্ধা, আস্থা লুটিয়ে পড়েছে ; এতক্ষণে ঘৃণায়, লজ্জায়, রাগে হতবাক হয়েছে প্রীতম রায় মুখোশের নীচে সুপ্রিয় চৌধুরীর আসল স্বরূপ দেখে। কিন্তু এখনই না, প্রীতম। আরও আছে। আরও শোনাবো তোকে। সব কথা।

মনে আছে সেদিনের কথা। তোর ইতালী যাবার মাস কয়েক আগে। যেদিন নীলিমা শেষ দেখা করে তোর সঙ্গে। আমি ছিলাম না। কলেজের 'লন'-এ তোর সামনে ঝরঝর করে কেঁদেছিলো নীলিমা। বলেছিলো—"আমাদের 'ত্রিভুজ' আর টিকবে না, প্রীতম। সুপ্রিয় তাকে ভেঙ্গে দিলো।" অনেক কাকুতিমিনতি করেও আর কিছু জানতে পারিস্নি তুই ওর কাছ হ'তে। আমায় জানিয়েছিলি সব। তুই লক্ষ্য করিস্নি। কিন্তু যদি দেখতিস্ ভালো করে, তবে তোর আদর্শবাদী বন্ধুর পাংশু মুখটার, কম্পমান আঙ্গুল-গুলোর অন্তরালে যে মনটা ভীষণ সংগ্রামে রত তোর জিজ্ঞাসার উত্তর গোপনের অভিলাষে, তার আসল রূপ তোর চোখ এড়াত না। তুই বিক্ষুব্ধ হয়ে দোষারোপ করেছিলি নীলিমার উপর—"মিছে তোর ওপর নীলিমা দোষ চাপায় কেন, সুপ্রিয় ? খুব খারাপ এসব।"

আমি চুপ করে ছিলাম। কিন্তু আমার মৌনতা যে কতবড় সত্যের স্বীকৃতি, তা' তুই জানতিস্ না, প্রীতম। দিনকয়েক আগের রাত্রের ঘটনা জানবার কথা নয় তোর। তুই শুধু জানতিস্ সন্ধেয় নীলিমা বেড়াতে গিয়েছিলো আমার সঙ্গে। এই জেনেই পরিতৃপ্ত ছিলো তোর অনুসন্ধিৎসা কিন্তু তারপর, তার পরের ঘটনা, প্রীতম ? জানলে ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় ভেঙ্গে পড়তিস্ তুই। 'ত্রিভুজ'-এর আদর্শ নিয়ে গর্ব করতিস্ না আর ; ওকালতি করতিস্ না আমার হয়ে।

সেদিনের ঘটনা আমার অক্ষমতার কাহিনী। আমার নিজস্ব রূপ, যা' অনেক প্রয়াসে আড়াল করে রেখেছিলাম তোদের কাছ হ'তে, আমার নারকীয়, লালসাসিক্ত লোভ প্রকাশিত হয়ে যাবার কাহিনী। আজও ভুলিনি, ভুলতে পারিনি, পারবোও না। পার্কের নির্জন বুক নির্জনতর, নির্জনতম হ'লো রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে। প্রতিদিনের মত পরিচিত বাবু আর দিদিমণিকে রাত্রির গভীরতার কথা স্মরণ করিয়ে কর্তব্য সারলো দারোয়ান। চলে গেলো সে। আমাদের গল্পের গতি কিন্তু রইলো অব্যাহত। রাত বাড়লো। তারপর প্রীতম ? তারপর ?.....

প্রীতম, অনুশোচনা হয়েছিলো। ভীষণ জ্বালাময় অনুশোচনা। অক্ষমতার জ্বালা।

প্রীতম, ভেবেছিলেম নটেগাছটি এখানেই মুড়োবো কিন্তু তা' হয়নি। তারপর তুই চলে গেলি ইটালীতে শিল্পের সাধনায় ; আর আমি গ্রেপ্তার হলেম মাসকয়েক পরে। আমারই হঠকারিতার জন্য।

সারা জীবন ভরে আমায় এর প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে কারণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে মাথা তোলার স্পর্ধা করেছিলাম। কল্পনা ছিল চিরকালের জন্য ত্রিভুজকে বোধহয় বাস্তবের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। কিন্তু বাস্তব বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়, ক্রূর। সে তার নিজের দাবি জানিয়েছিল।

দুটি কবিতা

মানস রায়

চতুর্থ বর্ষ। ইংরাজী

মহাপথিক

একদিন পৃথিবীর গল্প শেষ হয়ে
তুমি আমি মিশে যাব এই নদী অসীম সময়ে
তোমার গল্পের ঢেউ আমার গল্পের তট সূর্যপটঅববাহিকায়
সেইদিন চিহ্ন রেখে যাবে কোন অন্তিম নিশায়—
নিরন্তর কাল হতে সেই স্মৃতি ভেসে আসে তীরে
শেষের উদ্দেশ খুঁজে প্রথম সমীরে
নীলাম্বু বারিধি ভিড় সে সমীর জাগায়ে তোমার মুখচ্ছবি
ডাক দিল আমারে যে, তাইতো আকাশ ঘিরে শান্ত উষারবি
অনাদির প্রাচীভূমে পেতেছে আপন মায়াজাল,
নিগূঢ় রাত্রির পিছে ধেয়ে এল উদয়সাগরজ্যোতি প্রসন্ন সকাল,
তোমার আলোর ভিড়ে যে রূপসাগর দেশ এনেছ এ পৃথিবীর পারে,
উদয়ভানুর সখী, সেই রূপভূমে, সখী, চিনিবে আমারে ?

মনে রেখো, হে কিশোরী, তোমার প্রথম খেলাঘর
একদিন ধন্য হোল বুকে নিয়ে আমার স্বাক্ষর।
তোমার অরণ্যদিন ফাল্গুন-প্লাবন
মোর বায়ুতটিনীরে জানাল অরূপ সম্ভাষণ—

প্রথমা তরুণী সেই উষার ব্যাকুল দ্বারে দ্বারী
আর তারে ভালোবেসে সেই প্রাণ নক্ষত্রকুমারী
চলে গেছে বহুদূর কাল-রূপ-জ্যোতিছায়াপথে
সেও কবে আনে গান এই রূপস্বপ্নের জগতে ॥

অনেক ধূসর মৃত্যু, অনেক জীবন, শান্তি, মহাপ্রেম, অক্লান্ত আহ্বান
পার হয়ে এসে এই সময়ের বহুদূর টানে
যুগান্তের নক্ষত্রের অন্তহীন আলো, নদী, সূর্যের আলোয় রক্তস্নান
সেরে এসে জন্মান্তের পটভূমিবাহিকা অম্লানে,
ঘুরে ঘুরে ফিরে তবুও হৃদয়ে মোর, সেইখানে লেখা মোর মরণশরীর
কবে সে যে ছেড়ে এল পৃথিবীর কাহিনীর নীড় ॥

তোমরা কোথায় যাও ওগো নর ওগো নারী এই প্রেম ধূলিধোওয়া জীবনসায়র
এখানে খুঁজেছ দোঁহে পৃথিবীর আদিকালে এই রূপভিড়ে মহাপথিকের ঘর ?
এই প্রাচীন সাম্রাজ্যের বহমান বায়ুদূতী কোন অনন্তের এক এনেছে আহ্বান
আমার ললাট ঘিরে তাহার চুম্বনলেখা রেখে গেছে অনাদির বহুদূর গান ;
তবুও সৃষ্টির ভিড়ে সেই রূপতীর্থপথে হেঁটে গেছে অনাদির নারী আর নর
সূর্যের আলোয় রক্তস্নান আদি পৃথিবীর নিয়েছে হৃদয়ে যারা আশ্চর্য স্বাক্ষর।

তবু সেই সৃষ্টিপথে সূর্য আসে, শূন্য, নদী, নক্ষত্রের বৃহৎ সংসার
পাতে যে হরিণখেলা মায়াজাল বহুদূর লাবণ্যসময়সীমা পার,
সেখানে নেইকো আমি, সে আমারে খুঁজে গেছে এই রূপ-আকাশের তলে,
অরণ্যসাগর হাহাকার ব্যাপ্ত ক্রন্দসীর অবিরাম ব্যথার উচ্ছলে
অনেক ক্লান্তির ভূমি অতিক্রান্ত হয়ে তবু, পার হয়ে এই মেঘ সমুদ্র পর্বত
সূর্যনক্ষত্রের দেশ ছাড়ায়ে গিয়েছে চলে নিরন্তর এই প্রাণ বন্ধহারা রথ ॥

তোমাকে পেয়েছি পাশে, দুজনে হয়েছি পথ পার
অনেক মৃত্যুর ভূমি পার হয়ে, পার হয়ে এই নদী রাত্রি অন্ধকার
অনন্ত রাত্রির পথ অতিক্রান্ত জন্মভূমি আজ এই পৃথিবীর ভোরে
তোমাকে পেলাম পাশে, তোমাকে দেখেছি যেন এই কচি রৌদ্রের প্রহরে
এই ঘাস শিশির-উৎসব আর নীলিমা উষায় ॥

এই পৃথিবীর ভোরে দূর জীবনের গন্ধ মেখে এলে, হে বৈশাখী নারী,
জানি কোনদিন এক অনাদির প্রহরে তোমারি
যে নিগূঢ় প্রেমআত্মা, যে নিগূঢ় জীবনপ্রতিভা
সৃষ্টির প্রথম ভূমে রেখে এসে জেলেছ প্রাণের দীপবিভা
সেও জানি আকাঙ্ক্ষিত রয়ে গেছে অন্তিম উষায়॥

হে প্রাণ, অসীম, মৃত্যু, তোমাদের সাম্রাজ্যের যেই ধূলি গিয়েছে ছড়িয়ে
এই জ্যোতি ব্রহ্মাণ্ডের রূপের কণার দেশে, দিনরজনীর মহাশুভ্রপথ দিয়ে,
কোন সে বিস্মৃত যুগে হৃদয়-সৈকতে মোর নিয়েছিনু ঢেকে সেই জ্যোতিধূলিকণা
তারপর আমারই সত্তার খোঁজে সূর্যতারা ছায়াপথ গেয়েছে বন্দনা
মহাকাল সপ্তপদে শান্ত পদে এনেছে প্রণাম
এই জ্যোতিনিখিলের অস্তিত্বসভায় কবে লিখে গেছি মোর পূর্ণ অতলান্ত নাম॥

হে প্রাণ, অসীম, মৃত্যু-বিজয়ী সম্রাট,
সহস্র বরষ ব্যাপ্ত দ্বাদশ সবিতাদীপ্তি গেঁথে দিল তোমার ললাট
তোমার দক্ষিণ মুখ রুদ্র্যনিত্য অভিলাষে রচনা করেছে পৃথ্বী, স্তব্ধ নীলিমাকে,
তাই আদি সকালের সূর্যউষা এনেছিল প্রণাম তোমাকে
যে তুমি ছড়িয়ে গেছ শত মুক্তিশতাব্দীর মৃত্যু আর জন্মের ধারায়
একটি কাহিনী ঘিরে মহানীড় স্তব্ধ ইশারায়
গাঁথা হয়ে গেল কত যুগান্তের রাত্রি আর দিন
সকল উত্থান, লগ্ন, সকল রহিত, শান্তি, বহুদূর তোমাতে বিলীন
সে ছন্দ-আহ্বান-ঢেউয়ে রূপের সমুদ্রস্নান ছেড়ে যেতে হবে
এ নিখিল মর্মঘেরা—শুভ্রআত্মা-নটরাজ-প্রকাশ-উৎসবে॥

বন্ধু তোমার

বন্ধু তোমার স্মৃতির হাওয়ার অরূপ নিরঞ্জনে
ঢাকো আমার মুখ
অনন্তকাল ছিনু প্রতীক্ষায়
বিরহী উৎসুক,
মেঘের বেলায় সাগরপারের সীমা
ডাক দিল যে চৈতালী পূর্ণিমা

প্রাণের নিরঞ্জনে
কালের ঘরের অতন্দ্র নির্জনে ॥

কালের পথে ফিরে ফিরে পাই নি যার দেখা
সে জন কবে ছড়িয়ে গেল পৃথিবীময় একা
মধুরূপের অন্তরালে, জেনে আমার মন
রয়েছে চেয়ে ঘর বাহির আলোয় নির্জন
উদাস ভোরের মাতন হাওয়ায় লেখা তোমার নাম
বন্ধু হে,
তোমায় চেয়ে
পৃথিবী হারালাম ॥

৩

শঙ্কা মোর রোদের নীড়ে ভাসিয়ে দিয়ে ভেলা
এই পৃথিবীর প্রান্তে কবে বেঁধেছিলেম ঘর
সে কথা আজ ভেসে আসে অনন্ত মেখলা
সময়নীড়ে নয় সে নির্ভর
সে কথা জেনে উজান হল মন
কালের কথা শুনে গেলেম বিরলে এই ক্ষণ ॥

জেনেছি তাই, জেনেছি মনে, তব পায়ের ধ্বনি
রক্তমাদল হৃদয় চলার অতল রনরনি
এই জীবনের বাহির ঘরে রূপের সাজ ঢালা
সাজাক তবে তব প্রাণের বাসর নিরালা।
তোমার খেলা ফেলেছে আলো সূর্যতারার পথে
ঢেউ দিয়েছে রূপের জনম প্রাণের আদি স্রোতে—
যেথায় তব মনের অবিরাম
জোয়ার ভাঁটা খেলে চলে রূপপ্রলয় তলে
সেথায় আমি পাব কি বিশ্রাম
তব প্রাণের গভীর কলরোলে ॥

কলেজ প্রসঙ্গ

প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস ২০শে জানুয়ারি ১৯৬২

"উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের প্রথম যুগে স্থাপিত হয়েছিল আমাদের এই শিক্ষায়তন। চিন্তায় ও কর্মে প্রাণের যে ধারাটি সেকালে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, বিদেশী প্রাণশক্তির অভিঘাতে তাতে নতুন স্পন্দন সঞ্চারিত হয়। নবযুগের আদর্শকে বহন করবার গুরু দায়িত্ব নিয়ে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি এই কলেজ স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে ছিলেন ভারতহিতৈষী ডেভিড হেয়ার, বর্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর, গোপীমোহন ঠাকুর, রাজা গোপীমোহন দেব, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, সার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, জোসেফ ব্যারোটো, জে. এইচ. হ্যারিংটন, লেঃ-কর্নেল ফ্রান্সিস আরভিন প্রভৃতি বরেণ্য ব্যক্তি। রাজা রামমোহন ছিলেন এর আদি কল্পক। আজ ১৪৫ বৎসর পূর্বের সেই কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাব্রতীদের আমরা বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি।

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়, তখন যত আন্দোলন এবং সমালোচনাই হয়ে থাক না কেন, আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই রূপান্তরণ আদর্শের প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কলেজের ইতিহাসে যুগ ও জীবন প্রতি পর্যায়েই যথাযথরূপে প্রতিফলিত হয়ে আসছে। মহত্তর গৌরবের অভিমুখে এর নিরন্তর যাত্রা আমাদের নিত্য গর্বের বিষয়।

বাঙলা ও ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণী নেতা ও কর্মী—যাঁদের অনেকেরই ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছে এই বিদ্যাভূমিতে, তাঁদের সঙ্গে আজকের ছাত্রদের আত্মিক যোগ অনুভবের সাধনা সার্থক হোক।"

বিভিন্ন পরীক্ষার ফল

কলেজের ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে ১,৫৮০; তার মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ৫১৬। ২৭১ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী বৃত্তি লাভ করেছে। অসচ্ছল অথচ মেধাবী ৩৮৭ জন এবং উদ্বাস্তু ৩৯ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে পড়াশুনা করছে। এ ছাড়া, ৬ জন ছাত্রকে জগদীশ বোস ন্যাশন্যাল সায়ান্স ট্যালেণ্ট সার্চ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় কলেজের মান অক্ষুণ্ণ আছে। আই. এ ও আই. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের পাসের হার যথাক্রমে ৯৫·৪ এবং ৯৭·১৪। ঐ পরীক্ষা দু'টিতে যথাক্রমে ৪৪ এবং ১৭৫ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৫ এবং ১৫৯ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। আই. এস-সি পরীক্ষার প্রথম দশজনের মধ্যে ন'জন এবং আই. এ পরীক্ষায় একজন আমাদের কলেজের। বি. এ ও বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের পাসের সংখ্যা যথাক্রমে ১০২ এবং ১৩০। বি. এ পরীক্ষায় ৭ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং বি. এস-সি পরীক্ষায় ৩৮ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কলা এবং বিজ্ঞান পরীক্ষায় মোট পাসের হার শতকরা ৯৮·৯১—তার মধ্যে কলা বিভাগের ১২ জন এবং বিজ্ঞান বিভাগের ৬৫ জন প্রথম বিভাগে। প্রথম দশজনের মধ্যে চারজনই আমাদের কলেজের।

বিভিন্ন পরীক্ষায় যারা কৃতিত্ব দেখিয়েছে এবং পদক ও পুরস্কার লাভ করেছে, ইংরেজী বিভাগে তাদের নামের তালিকা ছাপা হ'ল।

অধ্যাপকমণ্ডলীর পরিবর্তন ও অন্যান্য সংবাদ

অর্থনীতিতে নবসৃষ্ট অধ্যাপক পদে গত অগাস্ট মাসে ডক্টর সুখময় চক্রবর্তী যোগ দিয়েছেন। এই বিভাগের ডক্টর হীরেন্দ্রনাথ রায় পদত্যাগ ক'রে দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যোগ দিয়েছেন। তাঁর

জায়গায় শ্রীঅশোকচন্দ্র সেন গত নবেম্বর মাসে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। রাষ্ট্রনীতি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীনীরোদবরণ দে। ইংরাজী বিভাগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত সহকারী অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছেন। শ্রীনিরুপম চট্টোপাধ্যায় গত মার্চ মাসে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসেই বিদেশ যাত্রার জন্য পদত্যাগ করেন। শ্রীতীর্থঙ্কর বসু লেকচারার পদ ত্যাগ ক'রে উচ্চতর শিক্ষার্থে বিদেশে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন শ্রীপ্রবীরকুমার সরকার। শ্রীযোগেশ ভট্টাচার্য সম্প্রতি এই বিভাগে যোগ দিয়েছেন।

বাঙলা বিভাগের লেকচারার পদে শ্রীহরনাথ পাল ও ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য যথাক্রমে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠী গবেষণাকার্যে কয়েক মাসের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করায় ডক্টর অসীম দাসগুপ্ত প্রধান অধ্যাপকের কাজ করেন। তিনি ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় অধ্যাপক পদে কিছুকাল পূর্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিভাগে সহকারী অধ্যাপকরূপে কিছুকাল কাজ ক'রে, পরে পদত্যাগ ক'রে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার এখানে বদলির আদেশ পেয়েছেন।

রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছেন। ডক্টর ব্রজেশ সেন বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে উচ্চতর পদে যোগ দিয়েছেন। এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর এস. সি. সোম আমেরিকা যাত্রা করেছেন এবং তাঁর জায়গায় ডক্টর প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। এই বিভাগে দু'জন লেকচারার নিযুক্ত হয়েছেন—শ্রী জে. সি. সরকার এবং শ্রী এস. কে. চক্রবর্তী। শারীরতত্ত্ব বিভাগে শ্রীসুনীলচন্দ্র সেন সহকারী অধ্যাপক পদে আর এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হলেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবনাথ লেকচারার পদে এবং শ্রীঅশোক সেনগুপ্ত পদত্যাগ করায় শ্রীঅরবিন্দকুমার সিংহ ডেমনস্ট্রেটর নিযুক্ত হয়েছেন। ভূগোল বিভাগের শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসেছেন। গণিত বিভাগে শ্রীনারায়ণ বর্মণ লেকচারার পদে যোগ দিয়েছেন। প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শিবতোষ মুখোপাধ্যায় আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন। এই বিভাগে শ্রীঅরুণ রায় লেকচারার নিযুক্ত হয়ে পরে বদলি হয়েছেন। এই বিভাগে ডক্টর অশোক বসু এবং ডক্টর অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেকচারার নিযুক্ত হয়েছেন। সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের শ্রীসম্প্রীত চট্টোপাধায় ডেমনস্ট্রেটর পদ ত্যাগ করেছেন কেম্ব্রিজে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য।

উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ডক্টর এ. কে. চক্রবর্তী সহকারী অধ্যাপকরূপে বদলি হয়ে এসেছেম। ডক্টর এইচ. এল. চক্রবর্তী অন্যত্র চলে যাওয়াতে এই শূন্যপদের সৃষ্টি হয়। ডক্টর এস. কে. পাইন সহকারী অধ্যাপক পদে অস্থায়িভাবে কাজ করেন। তিনি ডক্টর জে. কে. চৌধুরীর শূন্যপদ পুরণ করেন। শ্রীপ্রদ্যোৎ ভঞ্জ এবং শ্রীপ্রবীর চট্টোপাধ্যায় অস্থায়িভাবে লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। শ্রীপ্রদ্যোৎ ভঞ্জ পরে পদত্যাগ করলে ডক্টর অপূর্বকুমার ঘোষ গ্রীষ্মের ছুটির পর ঐ পদে যোগ দেন। নবসৃষ্ট পদে ডক্টর এস. সি. দত্ত এবং শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায় লেকচারাররূপে নিযুক্ত হন। শ্রীঅশোক কর উচ্চশিক্ষার্থ বিদেশযাত্রা করেছিলেন; তিনি ফিরে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন।

কলেজ অফিসের সহকারী শ্রীশশাঙ্কশেখর ধর পরলোকগমন করেছেন। তাঁর জায়গায় যোগদান করেছেন শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটিতে যাওয়ায় তাঁর জায়গায় শ্রীরণেন্দ্রমোহন বাগচী (টাইপিস্ট) অস্থায়িভাবে কাজ করছেন। শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ই জানুয়ারি অবসরগ্রহণ করবেন। শ্রীরণেন্দ্রমোহন বাগচীর স্থলে শ্রীদীপক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক মাস কাজ করেন। অতঃপর সম্প্রতি শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পদে নিযুক্ত হয়েছেন। কলেজের প্রধান দারোয়ান শ্রীবাবল সিং কার্যে রত অবস্থায় গত ২১এ নবেম্বর করোনারি থ্রমবোসিস রোগে আকস্মিকভাবে মারা যান। তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কাল এই কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং লেকচারার শ্রীহরিমোহন সরকার উভয়েই উচ্চতর শিক্ষার জন্য পশ্চিম জার্মানী যাত্রা করেছেন। অর্থনীতি বিভাগের শ্রীদীপক বন্দ্যোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। শারীরতত্ত্ব বিভাগের ডক্টর সুখময় লাহিড়ী হিমালয়ের উচ্চ অঞ্চলে গবেষণাকার্য শেষ করেছেন। স্যার এডমণ্ড হিলারি পরিচালিত মাকালু অভিযানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। অক্সফোর্ডে হলডেন শতবার্ষিক অধিবেশনেও তিনি যোগদান করেছিলেন। প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের ডক্টর শিবতোষ মুখোপাধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং পরে অক্সফোর্ডে পাঠচক্রেও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগে শ্রীমিলনকুমার গুপ্ত দুই বৎসরের ছুটিতে ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছেন। ইংরেজী বিভাগের শ্রীনিরুপম চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীতীর্থংকর বসু উচ্চতর শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড যাত্রা করেছেন। এ বিভাগের শ্রীশৈলেনকুমার সেন দার্জিলিং কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হয়েছেন। রসায়ন বিভাগের ডক্টর এস. সি. সোম টেডিংটন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে গবেষণার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। ভূগোল বিভাগের শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি উপাধি লাভ করেছেন।

ইতিহাস বিভাগের ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠী লণ্ডন প্রাচ্য ও আফ্রিকা বিদ্যাকেন্দ্র কর্তৃক আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে গবেষণা করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। জেনেভা ও মিউনিকে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট ইতিহাস বিষয়ক সেমিনারেও তিনি আহূত হয়েছিলেন। ইতিহাস বিভাগের শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা' দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন।

ডক্টর শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা ক'রে শ্রীবংশীধর হাজরা, শ্রীবঙ্কুবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীসোমেশ সান্যাল ডি. ফিল উপাধি লাভ করেছেন। শারীরতত্ত্ব বিভাগের শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি উপাধি অর্জন করেছেন। রসায়ন বিভাগে কাজ ক'রে শ্রীঅরুণশঙ্কর বসু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল উপাধি পেয়েছেন। উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের শ্রীঅশোক কর যুক্তরাষ্ট্রেরই লিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি অর্জন ক'রে ফিরে এসেছেন। ঐ বিভাগেরই শ্রীঅশোক সিংহ কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছেন।

বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে গবেষণা অব্যাহত আছে। রসায়ন বিভাগে পনর জন কাজ করছেন। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন বিভাগে একাধিক গবেষণার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। রসায়ন বিভাগের শ্রীমতী ইলা মুখোপাধ্যায় সর্ব-ভারতীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হয়ে ইউ. জি. সি. ফেলোশিপ লাভ করেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষামূলক ভ্রমণের সুপ্রচুর ব্যবস্থা আছে। বিশেষ ক'রে বিজ্ঞানের ছাত্রদের এই ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বেশি। এর দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে আপন আপন বিষয়ের প্রতি কৌতূহলের সঞ্চার হয় এবং কলেজীয় শিক্ষা যথাসাধ্য সম্পূর্ণ হয়। ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূগোলে শিক্ষাদানের অঙ্গ হিসাবেই বাৎসরিক বহির্যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

ভূতত্ত্ব বিভাগ থেকে এবার কয়েকটি যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছিল। মাদ্রাজ, সালেম, ত্রিচিনাপল্লী, চাইবাসা, সিংভূমের অন্তর্গত কুদাদা প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ থেকেও মাদ্রাজ, মহাবলীপুরম্ এবং বোম্বাইতে ছাত্ররা গিয়েছে। সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ থেকে এবার তিনটি ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়। স্টেট স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং নতুন দিল্লীতে সেণ্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশন এবং ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্ট্যাটিসটিকস—এই চারিটি স্থল পরিদর্শন করা হয়। ভূগোল বিভাগের ছাত্ররা গিয়েছিল গুজরাট, কচ্ছ এবং রাজপুতানা। আর-এক দল গিয়েছিল সিকিম-তিব্বত সীমান্তে। তারা ফেরবার পথে জলঢাকা হাইডেল প্রোজেক্ট দেখে আসে।

উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগ থেকে এ বছর কুড়িটি নিকট-ভ্রমণে এবং দু'টি দূর-ভ্রমণে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরও একটি দূর-ভ্রমণের সঙ্কল্প আছে।

বিভিন্ন বিভাগের সেমিনারে সারা বছরই সুপরিচিত পণ্ডিতদের দিয়ে বক্তৃতা দেওয়ানো হয়ে থাকে। ছাত্ররা নিজেরাও এখানে আলোচনা ক'রে থাকে। দর্শন বিভাগের সেমিনারে আমেরিকার টাকটস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর জর্জ. বি. চার্চ. বক্তৃতা দেন ২৮এ এপ্রিল। ২১এ এপ্রিল বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কর্টোচি বিভাগীয় অধ্যাপকদের সঙ্গে দর্শন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। হিরোসিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক য়ুনোকুরা এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেরি ভূগোল সেমিনারে বক্তৃতা দেন।

সমগ্রভাবে কলেজের পুনর্মিলন উৎসব ছাড়াও কোন কোন বিভাগ এ রকম উৎসবের অনুষ্ঠান ক'রে থাকে। এই উপলক্ষে নাট্যাভিনয়, শখের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং বিতর্কের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। অনেক বিভাগই নিজেদের পৃথক পৃথক পত্রিকা প্রকাশ ক'রে থাকে।

গ্রন্থাগার

১৯৬১ সালের ৩০এ নবেম্বর পর্যন্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ছিল ৮৯,১৭২ এবং বাঁধানো পত্রিকার সংখ্যা ১৩,৪৩৪। ১৯৬০-৬১ সালে কেনা বই ও পত্রিকার সংখ্যা যথাক্রমে ২,১৬২ এবং ২১৬। এর জন্য মোট খরচের পরিমাণ ৭০,৭২৪·৬১ টাকা। এ ছাড়া আলোচ্য বর্ষে ২০৭খানি বই, পত্রিকা ও পুস্তিকা উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়েছে। আলোচ্য বর্ষে যেসব অতিরিক্ত বরাদ্দ বই কেনবার জন্য গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে পাওয়া গেছে তা কেবল বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্য। অন্যান্য বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় নি। আলোচ্য বর্ষে বরাদ্দ ১৫,০০০ টাকায় ৫,১২৫খানি বই ও পত্রিকা বাঁধানো হয়েছে। ১৯৬১-৬২ সালের বই বাঁধানোর কাজ চলছে। উক্ত বছরে বই বাঁধানোর জন্য ১৮,০০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডক্টর কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার বই কেনার জন্য ৫০০ টাকা দান করেছেন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী আবেদন-নিবেদনের পর অবশেষে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে একটি নতুন টাইপরাইটার পাওয়া গেছে।

১৯৬০-৬১ সালে মোট ৯৩,২৪১খানি বই ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে বাড়িতে ব্যবহারের জন্য ৩৫,৪৩৪খানি এবং বিভিন্ন সেমিনারে ব্যবহারের জন্য ৩,১৬৭খানি।

'থ্রি-ইয়ার ডিগ্রী কোর্স', 'প্রি-ইউনিভার্সিটি' ও 'প্রি-মেডিক্যাল' ক্লাস এই কলেজে শুরু হওয়ায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে। অবিলম্বে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়েছে; এখনও কোন ফল হয় নি।

পাঠকপাঠিকাদের অধ্যয়নের সুবিধার্থে সকাল, সন্ধ্যায় ও ছুটির দিনে গ্রন্থাগার খোলা রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অতিরিক্ত কর্মচারী এবং বই, আলমারি ও সেল্‌ফ ঝাড়পোঁছ করার জন্য দু'টি ফরাশ গত নয় বছর ধ'রে চাওয়া হচ্ছে; এখনও পর্যন্ত কোন ফল হয় নি। এ ছাড়া গ্রন্থাগারে ক্রমবর্ধমান কাজের সুবিধার জন্য কয়েকটি অতিরিক্ত কর্মচারী (যেমন উপগ্রন্থাগারিক, অতিরিক্ত তালিকা-প্রণেতা, অতিরিক্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক, অতিরিক্ত বেয়ারা, দ্বার-রক্ষক ইত্যাদি) চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এখনও কোনও ফলাফল জানা যায় নি। ইউনিভার্সিটি গ্র্যাণ্টস কমিশন-এর সম্প্রতি অনুমোদিত বেতন-হারের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনহার নির্ধারণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়েছে—ফলাফল এখনও জানা যায় নি। অস্থায়ী তালিকা-প্রণেতার পদটি অবিলম্বে স্থায়ী করার বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্র বিনিময় হচ্ছে।

অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে বিভাগীয় গ্রন্থাগার চালু করার জন্য অস্থায়িভাবে একটি সহকারী গ্রন্থাগারিক ও একটি বেয়ারার পদ এ বছরে (১৯৬১-৬২) মঞ্জুর করা হয়েছে। ঐ গ্রন্থাগারের বই-আলমারি কেনার জন্য যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ২০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে। গ্রন্থাগারে বই রাখার গুরুতর স্থানাভাব পূর্ববৎ।

ছাত্রসংসদের সভাপতি ডক্টর অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং অন্যতম প্রাচীন সদস্য চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এ বৎসর পরলোকগমন করেছেন। শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্রসংসদে নয়, দেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক জগতে তাঁদের মৃত্যু শূন্যতার সৃষ্টি করল। সংসদ এবার শততম রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করেছে। এই উপলক্ষে ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র রবীন্দ্র-প্রতিভার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ৩০এ সেপ্টেম্বর নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট-এ সংসদ-সদস্যরা রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' অভিনয় করেন। ৩রা ডিসেম্বর শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গানে রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব' এই সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। বক্তৃতার সঙ্গে গান করেন বৈতানিকগোষ্ঠী। ১০ই ডিসেম্বর বেলুড়ে একটি উদ্যান সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হয়। ইংরেজীতে পর পর দু'টি বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে; রবীন্দ্রসংখ্যাটি গত পূজার ছুটির আগেই প্রকাশিত হয়। কলেজের দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্যকল্পে কয়েকজন সভ্য সংসদে কিছু অর্থ দিয়েছেন।

পরিশেষে, এ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়েছে। প্রথমোক্ত বিভাগে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং শেষোক্ত বিভাগে শ্রীভবতোষ দত্ত প্রধান অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত। কলেজে যথারীতি ত্রিবর্ষব্যাপী স্নাতক-শিক্ষা, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান শ্রেণী এবং প্রাক্-চিকিৎসা শিক্ষণ চলেছে। বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপকদের শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করা দরকার। কর্মভার বহু পরিমাণে বেড়েছে, প্রতিদিনের সাধারণ পঠন-পাঠনের পক্ষে বাঞ্ছিত স্থানের সমূহ সঙ্কোচ অনুভব করা যাচ্ছে।

ইংরেজী সেমিনার

ইংরেজী সেমিনারের কার্যাবলী কিছুটা সীমাবদ্ধ। সেমিনার লাইব্রেরী থেকে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দেবার কাজ ভাল ভাবেই এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য সেমিনার ঘরটিতে অসময়ে ক্লাস হওয়ার দরুন কিছুটা অসুবিধা বোধ করতে হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে লাইব্রেরী থেকে বই দেওয়ার পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। তা ছাড়া, বইগুলি পৃথক পৃথক section অনুযায়ী সাজিয়ে রাখার ফলে এখন আর আগেকার মত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

মিস বসুর বিশেষ তত্ত্বাবধানে এই বছর আমাদের পক্ষে "প্লে-রিডিং" এর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। উৎসাহী দর্শকবৃন্দের সম্মুখে কয়েকটি বিখ্যাত নাটক হইতে কয়েকটি দৃশ্য সাফল্যের সাথে অভিনয় করা হয়েছিল। আশা করা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতেও এই ব্যবস্থা আমরা সাফল্যের সাথে চালিয়ে যেতে পারব।

কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী ও বর্ত্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না ভট্টাচার্যের সুইনবার্নের "Atalanta in Calydon"এর উপর এক সারগর্ভ আলোচনা শুনতে যে ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ হয় তাতে মনে হয় বর্তমান সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা সুইনবার্নের প্রতি আগ্রহশীল। এরকম আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সুপ্রচুর।

গৌতম চক্রবর্তী
সম্পাদক, ইংরেজী সেমিনার

রাজনীতি সেমিনার

এই সেমিনার ছাত্রবৃন্দের দ্বারা সংগঠিত এবং ইহার কার্য্যসূচিও ছাত্রবৃন্দের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এর কার্য্যধারা বহুমুখী। একদিকে সেমিনার লাইব্রেরী, অপরদিকে আলোচনাচক্র, বিতর্কসভা, নবাগত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে সংবর্ধনা ইত্যাদি পরিচালনা করে।

এই সেমিনারের উল্লেখনীয় দিক হচ্ছে—এর মাধ্যমে ছাত্ররা তাদের মতামত প্রকাশ করে। আমরা

দুইটি আলোচনাচক্র এবং কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করি ও শেষের দিকে আরও কয়েকটি করবার আশা রাখি। আমাদের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টায় অধ্যাপকবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষ ক'রে বিভাগীয় প্রধান—শ্রীঘোষাল, আমাদের প্রয়োজনে তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ছাত্রবন্ধুরা সেমিনারের ভার আমাকে দিয়ে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। আমি বলতে পারি না যে কতখানি কর্তব্য আমি পালন করেছি। সবশেষে আমি তাদের কাছে বিরুদ্ধ সমালোচনার পরিবর্তে আরও বেশি সহযোগিতা আশাই করি। ইতি—

বিষ্ণুপদ উকিল
সম্পাদক, পলিটিক্যাল সায়েন্স সেমিনার

ইংরেজী অনার্স লাইব্রেরী

ইংরেজী অনার্স লাইব্রেরীর ভার আমার হাতে এসেছে এ বছরের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে। বিবরণী দিতে হচ্ছে জুলাই মাসে। তার মধ্যে আবার দু'মাস গরমের ছুটি গেছে। তাই কাজ করার সময় পেয়েছি মাত্র দু'মাস, আড়াই মাস। বিভিন্ন বার্ষিক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে বাকী চাঁদা মোটামুটি সংগ্রহ করেছি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। নিয়মিত চাঁদা দেওয়া এবং সময়ে বই ফেরত দেওয়া ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের ঔদাসীন্য খুবই দুঃখজনক। তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব।

কয়েকখানি নতুন বই কিনেছি, আরও কেনবার জন্য চেষ্টা করছি। ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বই কেনা বিশেষ প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্তের উপদেশ অনুসারে কাজ করছি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আরও কয়েকটি বই কিনতে পারব বলে আশা করি।

প্রাচীরপত্র 'Mural Muse'-এর নতুন সংখ্যা প্রকাশের কাজ ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। লেখা সংগৃহীত হয়েছে। কলেজ ম্যাগাজিনে আমার এ বিবরণী প্রকাশিত হবার আগেই আমরা প্রাচীরপত্র প্রকাশ করছি।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে চতুর্থ বার্ষিক ছাত্রছাত্রীদের বিদায় অভিনন্দন জানানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বার্ষিক ছাত্রছাত্রীদের পরিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ রইল।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, ইংরেজী অনার্স লাইব্রেরী

ইতিহাস সেমিনার

এই বিভাগের সেমিনারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর বিবরণ উপস্থিত করতে না পারার জন্য দুঃখিত। নানা কারণে আমাদের পূর্বপরিকল্পিত কাজগুলির বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী মহাশয় সম্প্রতি ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ডঃ অসীম দাসগুপ্ত মহাশয় কিছুদিনের জন্য বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে কাজ চালিয়েছিলেন।

১৯৬০ সালের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বিদায়-অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। আশা করা যায় যে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের অভ্যর্থনা, আনুষ্ঠানিকভাবে, ভাল করেই করা হবে।

আমাদের একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণের প্রস্তাবনা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যত তা বর্জন করতে হল, তার প্রধান কারণ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব এবং উৎসাহেরও অভাব।

অনিরুদ্ধ মোসলা
সম্পাদক, ইতিহাস সেমিনার

অর্থনীতি সেমিনার

বর্তমানে আমাদের বিভাগের যে প্রচুর জায়গা ও সুন্দর ব্যবস্থা তা' আমরা পেয়েছিলাম দুই বৎসর আগে। আর এই বৎসর ১৯৬২ সালে পেলাম আমাদের নিজস্ব বিভাগীয় গ্রন্থাগার। এইটিই আমাদের কলেজে একমাত্র বিভাগীয় গ্রন্থাগার। গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা আমাদের পরীক্ষার্থী চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাই। এর কিছু পরেই ডঃ তাপস মজুমদারকে তাঁর 'London School of Economics'-এ যাওয়ার প্রাক্কালে এক ঘরোয়া আন্তরিক অনুষ্ঠানে অভিনন্দিত করা হয়। গ্রীষ্মের ছুটির আগে আমরা দুইজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ Prof. Rosen এবং Prof. Harberger-এর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আর একটি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউ. এন. ঘোষালের সভাপতিত্বে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅনিমেষ ঘোষাল 'সার্বভৌমত্ব' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আমাদের আগামী কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর নবাগতদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান। এবং তার পরেই সপ্তাহব্যাপী 'পরিকল্পনা-সপ্তাহ' উদ্‌যাপন যার কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী বিতর্ক সভা এবং সারগর্ভ বক্তৃতাবলীর আয়োজন করা।

বিশ্বজিৎ দাস
সম্পাদক, অর্থনীতি সেমিনার

ভূগোল সেমিনার

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কলেজের ভূ-জ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতি বিভিন্ন ছাত্র এবং শিক্ষক নিয়েই গঠন করা হয়েছে। বর্তমান সম্পাদকের কার্যকালীন তিনটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গত ৩রা মার্চ, ১৯৬২ সাল তারিখে পরিষদের একাদশ বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব ভূ-জ্ঞান বিভাগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন বিভাগীয় অধ্যক্ষ শ্রীনিশীথরঞ্জন কর। সভাশেষে অভ্যাগতদের জলযোগে আপ্যায়ন করা হয়। পরিশেষে সভায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়েছিল।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে Indian Geological Survey-এর শ্রী এ. কে. সেন Slide এবং Specimen নিয়ে পরিষদকক্ষে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "Phenomenal Aspects in Desert Region of Rajputana." গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে পরিষদে চিকাগো-বিশ্ববিদ্যালয়-আগত অধ্যাপক বেরী সাহেবের আগমন ঘটে। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় Central Place Theory ব্যাখ্যা করেন। এই স্বল্প সময়ে পরিষদে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে Moscow বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Geography-এর Faculty অধ্যাপক A. M. Riavchikov-এর আগমন। তাঁকে পরিষদকক্ষে চা-এর বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান হয়। সেদিন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সনৎকুমার বসু এবং অন্যান্য বিভাগের বহু অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।

পরিভ্রমণ

প্রতি বৎসরের মত এবারও ভূ-জ্ঞান বিভাগ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ হয়। গত অক্টোবরে দুটি পরিভ্রমণ সংঘটিত হয়। প্রথমটিতে ডক্টর নিশীথরঞ্জন কর এবং ডক্টর সত্যেশচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায় তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীগণ পূর্ব-হিমালয়ে জলঢাকা উপত্যকা, গ্যাংটক, নাথুলা ইত্যাদি অঞ্চল পরিদর্শন করেন। আর দ্বিতীয়টিতে চতুর্থ এবং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপক তরুণবিকাশ লাহিড়ী এবং অধ্যাপক নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি আঞ্চলিক ভৌগোলিক বৃত্তান্ত আহরণে

ব্রতী হন। গত ১৮ই জানুয়ারী তারিখে তৃতীয় এবং প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীগণ মোটরবাসযোগে বসিরহাট, হাসনাবাদ-টাকী প্রভৃতি অঞ্চলে যান। গত ২১শে মে তারিখে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীগণ সিমলা প্রভৃতি পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে গমন করেন। সেইসময় সিমলায় অনুষ্ঠিত All India Geographical Society-এর Summer School-এ ভূ-জ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নিশীথরঞ্জন কর প্রতিনিধিত্ব করেন।

পাঠাগার

ভূ-জ্ঞান পরিষদের পাঠাগারের পুস্তকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৫০০। দেশ-বিদেশের অনেক journal আমাদের পরিষদের পাঠাগারে নেওয়া হয়ে থাকে। পরিষদীয় পাঠাগার বর্তমানে এই কলেজের সেমিনার লাইব্রেরীগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই প্রশংসনীয় উন্নতির জন্য পরিষদ বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীতরুণবিকাশ লাহিড়ীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ভূ-জ্ঞান বিভাগের পাঠাগারে পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বিবিধ জ্ঞানগর্ভ এবং গবেষণামূলক প্রচুর পুস্তকের সমাবেশ ঘটেছে।

গত আগষ্ট মাসে ভূ-জ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় লণ্ডনে উচ্চতর শিক্ষালাভ ক'রে কলেজে এসে যোগ দেন। পরিষদের সবচেয়ে বেদনাদায়ক সংবাদ হল এই যে পরিষদ তার সর্বজনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীতরুণবিকাশ লাহিড়ীকে হারিয়েছে। অবশ্য পরিবর্তে আমরা পেয়েছি তরুণ অধ্যাপক শ্রীমৃণালকান্তি দত্তকে।

পরিষদের প্রতিটি কাজে ছাত্রবন্ধুদের এবং অধ্যাপকমণ্ডলীর কাছ থেকে যে উপদেশ এবং সহৃদয়তাপূর্ণ আচরণ পেয়েছি তার তুলনা মেলে না। বিশেষ ক'রে বিভাগীয় প্রধান শ্রীনিশীথরঞ্জন করের নিকট পরিষদ বিশেষভাবে ঋণী।

গণেশপ্রসাদ চক্রবর্তী
সম্পাদক, ভূ-জ্ঞান বিভাগ

ভূবিদ্যা সেমিনার

১৯৬০/৬১ সালের ভূ-জ্ঞান পরিষদের পরিচালনা সমিতি এঁদের নিয়ে গঠিত হয়—

সভাপতি—ডক্টর নিশীথরঞ্জন কর
সহ-সভাপতি—ডক্টর সত্যেশ চক্রবর্তী
কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর সত্যেশ চক্রবর্তী
সহ-কোষাধ্যক্ষ—সুমিত্রকুমার সেনগুপ্ত
গ্রন্থাগারিক—অধ্যাপক তরুণবিকাশ লাহিড়ী
সহ-গ্রন্থাগারিক—ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক—অভিজিৎ গুপ্ত
সহ-সম্পাদক—সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অসীম দাশগুপ্ত

আলোকচিত্র প্রদর্শনীর (Photo Corner) ভার গ্রহণ করেন রত্না সেন ও প্রদীপ ঘোষ এবং প্রাচীর পত্রিকার সম্পাদনাভার অরবিন্দ বিশ্বাস ও মৃদুলবন্ধু নিয়োগীর উপর ন্যস্ত হয়।

২২শে ডিসেম্বর ১৯৬০ তারিখে আমাদের দশম বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডক্টর নিশীথরঞ্জন কর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় German-Indian Association-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত "The Conquest of Nanga Parbat" চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এ বছর বিভিন্ন সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করা হয় : (পাশে প্রধান বক্তাদের নাম দিলাম)

1. The Study of Rocks and Minerals By Dr. A. K. Banerjee (Geology Dept.)
2. The Geological Evolution of Peninsular India By Dr. A. K. Saha (Geology Dept.)
3. Recent Excursion in the Western Himalayas and the Kulu Valley By Dr. N. R. Kar.
4. Recent Excursion : Jabalpur, Rihand and Giridih. By Sri T. Lahiri.
5. Settlements in Japan By Dr. J. Yonokura (University of Hiroshima).
6. Geographical Aspects of Arid Research. By Sri A. K. Sen (Arid Zone Research Institute, Jodhpur).
7. Excursion in Saurastra and Western Rajputana By Avijit Gupta.
8. Studies in Central Place Theory By Dr. J. L. Berry. (Universityof Chicago).

এই বক্তৃতাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই রঙিন চলচ্চিত্র ও Slides প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। এ বিষয়ে আমাদের বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ শ্রীগোপাল রায়কে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত একটি সভায় Alliance Francoise de Calcutta-র সৌজন্যে প্রাপ্ত ভূ-জ্ঞান-বিষয়ক ফরাসী ডকুমেণ্টারী কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

১৯৬০ সালে অধ্যাপক বিমলেন্দু ভট্টাচার্যের যুক্তরাজ্যে যাত্রার প্রাক্কালে ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সভায় তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানান হয়। এ বছর আমরা ডক্টর অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের বিভাগে পেয়েছি। তিনি যুক্তরাজ্যে তাঁর উচ্চতর গবেষণার কাজ শেষ ক'রে আবার আমাদের বিভাগে যোগ দিয়েছেন।

১৯৬১ সালের একটি বিশেষ সভায় পরিষদে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের অভ্যর্থনা জানান হয়। এই উপলক্ষে পরিষদের প্রাক্তন পরিভ্রমণগুলির কিছু কিছু চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেখান হয়েছিল।

পরিভ্রমণ—১৯৬০-৬১ সালে পাঁচটি পরিভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের শারদীয় ছুটিতে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রেরা ডক্টর করের পরিচালনায় পশ্চিমহিমালয়, কাংড়া ও কুলু উপত্যকায় ভ্রমণ করেন। ঐ সময়ে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপক লাহিড়ী ও অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় জব্বলপুর, রিহান্দ ও গিরিডি পরিভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন।

১৯৬১ সালের শারদীয় ছুটিতে একদল সৌরাষ্ট্র ও পশ্চিম রাজপুতানা অঞ্চলে যাত্রা করেন। অন্য একটি দলের গন্তব্যস্থান ছিল পূর্বহিমালয়। তাঁরা ফেরার পথে জলঢাকা হাইডেল প্রোজেক্ট দেখে আসেন।

অধ্যাপক লাহিড়ী ও অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথমটি এবং ডক্টর কর ও ডক্টর সত্যেশ চক্রবর্তী দ্বিতীয়টি পরিচালনা করেন।

এ ছাড়া বারুইপুর অঞ্চলে একটি শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ হয়েছিল। এটিতে ডক্টর কর, অধ্যাপক লাহিড়ী ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করেন।

এ ছাড়া দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের নিয়ে আরও একটি পরিভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়।

ভূ-জ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে দুটি প্রাচীর-পত্রিকা ('পরিক্রমা' ও 'Traverse') বার করা হয়। এ ছাড়া মধ্যে মধ্যে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে, তবে এ দুটি বিষয়ে আরও উন্নতির যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

পরিষদের প্রধান গর্বের বিষয় তার পাঠাগার। ভারতবর্ষ এবং বিদেশের সবক'টি প্রয়োজনীয় জার্নালে আমাদের পাঠাগার সমৃদ্ধ। বইগুলির প্রাচুর্য এবং সুব্যবস্থার জন্য বিভাগের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক শ্রীতরুণবিকাশ লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে ঋণী।

পরিষদের সম্পাদক হিসাবে কাজ করবার সময় সকল সদস্যের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে অরবিন্দ বিশ্বাস, সুমিত্র সেনগুপ্ত ও গণেশ চক্রবর্তীর কথা বিশেষ ক'রে উল্লেখ করতে হয়।

প্রতিটি কাজে আমাদের অধ্যাপকদের কাছ থেকে উপদেশ, প্রেরণা ও সহানুভূতি পেয়েছি। তাঁদের পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভিজিৎ গুপ্ত
সম্পাদক, ভূ-জ্ঞান পরিষদ

উদ্ভিদবিদ্যা সেমিনার

উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত সেমিনারে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা ও শিক্ষকেরা যোগদান করতে পারেন। ১৯৬০-৬১ সালে এই বিভাগের বইএর সংখ্যা শতকরা ১৯ ভাগ বেশী হয়েছে। এবং আশা করা যায় যে, এই বছরে আরও অনেক বেশী বই সংগ্রহ করা যাবে।

এই বিভাগের সভ্যেরা, "Improved Method of Crop Productivity" সম্বলিত ফিল্ম প্রদর্শনীর জন্য ও "Metabolism of the Dreaded Vibrio Chlora" বিষয়ে আলোচনার জন্য আগ্রহসহকারে অপেক্ষা করে আছেন। এই আলোচনাটি উত্থাপন করবেন Indian Institute of Biochemistry & Applied Medicineএর একজন রিসার্চ-কর্মী।

অশোক মুখার্জী
সহ-সম্পাদক

শারীরবিদ্যা বিভাগ

এই সংসদের প্রথম অনুষ্ঠান বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মুখার্জীর সভাপতিত্বে, ১৯৬১ সালের ৩০শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আমরা ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে বিদায় অভিনন্দন ও নবাগতদের স্বাগত সংবর্ধনা জানাই। একদল ছাত্র কৃতিত্ব অর্জন করে কর্মভার গ্রহণ করবার জন্য বহির্বিশ্বে পদক্ষেপ করছে আর একদল তাদের স্থান পূর্ণ করছে। এই বাৎসরিক পরিবর্তনের মধ্যে মহাবিদ্যালয় প্রাচীন্য লাভ করেও তার যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখে।

দ্বিতীয় অধিবেশন ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১ সালে, শারীরবিদ্যা বক্তৃতামঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ বর্ষের অজিৎ ঠাকুর এবং তৃতীয় বর্ষের করুণাময় লাহিড়ী এই সংসদের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কর্মকার বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব দেখান।

তৃতীয় অধিবেশনে আমরা চতুর্থবার্ষিক ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক বিদায় অভিনন্দন জানাই।

আমাদের চতুর্থ অধিবেশন ২৮শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ সেনকে ডি. এস্-সি ডিগ্রী অর্জন করার জন্য সংবর্ধনা জানাই। কিছুদিন পরেই, তিনি ভারত সরকারের একটি কার্যভার গ্রহণ ক'রে আমাদের ছেড়ে চলে যান।

এর পরের অধিবেশনটিতে বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মুখার্জী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। এই বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সুখময় লাহিড়ী উচ্চ বায়ুমণ্ডলে শারীর অবস্থা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। অভিযান-কালে পর্বতারোহণকারীদের যে সমস্ত শারীর পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয় সে সম্বন্ধেও বলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ডক্টর লাহিড়ী স্বয়ং পর্বতারোহণ বিষয়ে Himalayan Mountaineering Instituteএ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এবং তিনি পরে Edmund Hillaryর দলে যোগ দেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় বোঝানর জন্য পর্বতারোহণকালে গৃহীত একাধিক রঙিন চিত্র আমাদের দেখান।

বিগত গ্রীষ্মাবকাশে ২০ জন ছাত্র দ্বারা গঠিত একটি দল, চারজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে দার্জিলিং

পরিদর্শন করেন। একই সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা ও এই বিশিষ্ট শৈলাবাসটির অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য এই সফরটি বিশেষ আনন্দ দান করেছিল।—আমাদের কার্যাবলী শুধু সভাসমিতিতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক মাসে 'প্রাচীরিকা' নামে একটি প্রাচীর-পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

এই পত্রিকা ষষ্ঠ বর্ষের নীনা ঘোষ এবং চতুর্থ বর্ষের প্রসাদ মুখার্জীর সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

এই বিবরণী দেবার সঙ্গে আমাদের একটি অভিযোগ না জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে পারছি না—কারণ এটি আমরা প্রত্যেকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। সেটি হল আমাদের স্থানাভাব। আমাদের সব সময় অন্য বিভাগের কক্ষে ক্লাস করতে হয়। কোন একটি বিভাগ কখনও যাযাবর বৃত্তির মধ্যে দিয়ে সারস্বত সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। আমরা আশা করি যে এই অসুবিধার আশু সমাধান হবে।

এই বিবৃতির সঙ্গে বর্তমান সম্পাদক তার উত্তরাধিকারীকে এই সংসদের ভার অর্পণ করছে এবং এই সুযোগে তার অধ্যাপকদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে ও তার সহপাঠীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

করুণাময় লাহিড়ী
সচিব

রসায়ন সেমিনার

রসায়ন সেমিনারের উদ্যোগে নিম্নলিখিত বক্তৃতামালার আয়োজন করা হইয়াছিল :—

1. Biochemistry of Mental Disorder—Dr. J. J. Ghosh, Reader in Biochemistry, Calcutta University (15. 9. 61).
2. New Selective Reducing Agents—Dr. D. Nasipuri, Reader in Chemistry, Calcutta University (5. I0. 61).
3. Growth of Wave Mechanics—Dr. Dilip Biswas (17. 2. 62).
4. Rubber—Old and New—Dr. S. R. Palit, Professor of Chemistry, I. A. C. S., Jadavpore (9. 3. 62.).
5. The Nature of the Valency force in Hydrojen Mollenle—Sri Tapan Kumar Dasgupta (31. 3. 62).
6. Gas Chumatography—Sri Amal Mitra, Lecturer in Chemistry, Presidency College, Calcutta (27. 7. 62).

আর্থিক অসুবিধা ও স্থানাভাববশতঃ আমাদের সেমিনারের কার্য্যাদি ব্যহত হচ্ছে। আশা করা যায় আমরা শীঘ্রই এ অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারবো।

দিলীপ বিশ্বাস
সরোজ চক্রবর্তী
যুগ্ম-সম্পাদক—রসায়ন সেমিনার

বাংলা সেমিনার

জীবনের জমাখরচের খাতাটায় নিত্য নতুন আঁকের সমারোহ। শূন্য-পূর্ণের অবিরত ঠিকানাবদল প্রত্যহের পরিধিতে এ পালা প্রথাসিদ্ধ। আমাদের তাই হিসেব রাখতে হয়। চাওয়া-পাওয়া-হারানোর একটা ফর্দ সব সময় উত্তেজনা ছড়ায়: হেরে যাওয়ায় লজ্জা দেয়, বেদনা আনে, আবার জয়ের আনন্দে দেয় হাততালি, অভিনন্দনে দেখি স্রকৃচন্দনের বিপুলতা। আমরা তা জানি, আমাদের তা জানা আছে।

তবু বিপদ আসে। সঙ্কোচের কুয়াশা আমাদের আচ্ছন্ন করে যখন দেখি সে হিসেব দাখিল করতে

হবে। পাঁচজনের কাছে তুলে ধরতে হবে একটি বছরের জমাখরচের আঁকগুলো। দাঁড়াতে হবে পাঁচজনের সামনে।

'যে দায়িত্ব একদা তুলে দেওয়া হয়েছিল তোমাদের স্কন্ধে, বলো তোমরা কতখানি তার পালন করেছ, তার কতখানি ভরিয়ে দিতে পেরেছ পরিপূর্ণতার মহিমায়, তার কতখানিতে মাখিয়ে দিতে পেরেছ সাফল্যের দীপ্তি : অথবা সব শূন্য, সমস্ত হিসেব খরচের পাড়ায় বাসা নিয়েছে? তবু বলো, তাই বলো সেই ব্যর্থতার ইতিহাস ; তোমাদের দৈন্য, অবহেলার, আলস্যের স্মৃতিকণা।'

বলতে হয়, আমাদেরও বলতে হয়। এ বড় কঠিন, বড় ভীষণ, ভয়ংকর। তবু বলতে হয়। জমা নেই ; তাই খরচের বিরাট শূন্যতাকেই ভাষার চাকচিক্যে তুলে ধরি। পাঁচজনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, বিদ্রূপের বিদ্যুৎ ইশারা রেখে যায় তাঁদের অযুত ওষ্ঠে। এই বিরাট ব্যর্থতা, সময়ের এই বিপুল অপচয় শ্লেষ হানে, চোখের তারায় তারায় ক্ষোভ রেখে যায়।

তা সত্ত্বেও আমরা জানাবো, আমরা শূন্যই। একটি বছরের হিসেবের খাতাখানায় আমরা এক বিরাট ব্যর্থতা। তাই পাঁচজন যেন আমাদের ক্ষমা না করেন, এ আমাদের সবিনয় নিবেদন, কারণ আমাদের গাফিলতি ক্ষমা পেতে পারে না। শুধু আশ্বাস পেতে পারে ভবিষ্যতের কাছে। সাফল্যলক্ষ্মী যার ঘরে বাঁধা। উঠোনে যার প্রাচুর্যের মরাই।

* * * *

বাংলা পাঠচক্রের পুস্তকসংগ্রহ ব্যবস্থাটি অনেকদিন পর আবার সচল হয়ে উঠেছে। পাঠচক্র প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে সকল পুস্তক অন্যত্র দুর্লভ এবং এই সংগ্রহে ছিল না তার মধ্যে অনেকগুলি মহাবিদ্যায়তনস্থ গ্রন্থাগার থেকে পাঠচক্রের সংগ্রহশালায় সম্প্রতি আনানো হয়েছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের একটি বিশেষ প্রয়োজন যেমন মেটানো সম্ভব হয়েছে, তেমনি সম্ভব হয়েছে সংগ্রহ ব্যবস্থাটির উন্নতিকরণ। আর এই সঙ্গে অনেকগুলি অব্যবহার্য পুরনো বই নতুনভাবে বাঁধিয়ে নিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হয়েছে।

গত বারোই মার্চ এ বছরের সাম্মানিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষার্থিনীদের একটি বিশেষ ভাব-গম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জলযোগ প্রভৃতি সাধারণ ব্যাপার ছাড়াও এ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'বসন্তরূপক'। যার রচনা, পরিকল্পনা এবং উপস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে পাঠচক্রের সভ্যসভ্যাদের।

দশই এপ্রিল বিভাগীয় প্রধান পাঠচক্রের সভাপতি কবি-অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্রের উল্টোরথ পুরস্কার প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশের জন্য পাঠচক্রের সভ্যসভ্যাবৃন্দ এবং অধ্যাপকগণ একটি সংবর্ধনা সভায় মিলিত হব। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীসনৎকুমার বসু মহাশয়। তিনি বলেন, অধ্যক্ষ হিসেবে নয়, কবি শ্রীমিত্রের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে এবং তাঁর কবিতার একজন অনুরাগী পাঠকরূপে এ পুরস্কার প্রাপ্তিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশবাসী কর্তৃক প্রতিভার যোগ্য সমাদরকে তিনি প্রশংসা করেন। উত্তরোত্তর সৌভাগ্যময় গৌরবমণ্ডিত আসন লাভে যাতে কবি শ্রীমিত্র সমর্থ হন সেই আকাঙ্ক্ষাই তিনি রেখে যান। বিভিন্ন অধ্যাপক এই সভায় কবি শ্রীমিত্রের কবি-কৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। পাঠচক্রের পক্ষ থেকে কবির হস্তে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়।

তিরিশে এপ্রিল বিভাগীয় অধ্যাপক শ্রীহরনাথ পালের স্থানান্তর গমন উপলক্ষে একটি বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন অধ্যাপকদের বক্তৃতা এবং ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে মানপত্র পাঠের উত্তরে অধ্যাপক পাল তাঁর আবেগোচ্ছল বিদায়ী ভাষণে সহকর্মীদের উদ্দেশে রেখে যান তাঁর আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি স্নেহাশীর্বাদ এবং শুভকামনা।

প্রখ্যাত কবি-সমালোচক 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক স্বর্গত সজনীকান্ত দাসের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পাঠচক্রকক্ষে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন

পাঠচক্র সভাপতি বিভাগীয় প্রধান ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়। স্বর্গত আত্মার কল্যাণ কামনা ক'রে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

পাঠচক্রপরিচালিত প্রাচীর-পত্রিকা 'আশাবরী'র প্রকাশ ব্যবস্থা নিয়মিত এবং অব্যাহত রয়েছে। 'ঝড়বৃষ্টি' সংখ্যাটি ছাত্রছাত্রীদের মনে বিশেষভাবে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে দেখে আমরা আনন্দ পেয়েছি।

এই হলো মোটামুটি আমাদের একটি বছরের প্রয়াস-পরিণতি, সংকল্প এবং সিদ্ধির ইতিহাস। জানি, একটি পুরো বছরকে মনের সামনে তুলে ধরলে এ জমাখরচের আঁকগুলো মূল্যহীন। তবু পাঁচজনের কাছে জবাবদিহির খাতিরে তা অবশেষে মূল্যবানের মর্যাদা পাবে সেই সান্ত্বনা নিয়েই সম্পাদকীয় বক্তব্যের উপসংহার আনবো। শুভেচ্ছান্তে

মানস মজুমদার
ডলি মুখোপাধ্যায়
বাংলা পাঠচক্র

বিরামাগার

১৯৬০ সালের ৩রা ডিসেম্বর কাজের ভার হাতে পেয়ে প্রথমেই বিশ্রামাগারের যে অবস্থা দেখেছি বৎসরকাল পরে সে ভার উত্তরসূরীকে হস্তান্তরিত করার পূর্বে তার কিছু পরিমাণ উন্নতি সাধন করতে পেরেছি বলেই মনে হয়। এই ভার গ্রহণের আগে থাকতেই বিরামাগারকে স্থানান্তরিত এবং বিস্তৃত করার কথা শুনে আসছি, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে আমার কার্যকালে ত নয়ই, আজও সে অবস্থার কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় বিরামাগারকে এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ প্রদানের আশা আমায় সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয়েছে।

এই সময় বিরামাগারে কোন প্রকার সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র দেখি নি। আমার কার্যকালের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিনই দুইটি সংবাদপত্র "আনন্দবাজার" (বাংলা) এবং প্রথম দিকে "অমৃতবাজার" ও পরে "স্টেট্‌সম্যান" (ইংরেজী) রাখবার ব্যবস্থা ছিল। বাংলা সাময়িক পত্র "দেশ"-এর প্রতিটি সংখ্যা নেওয়া হয়। আরও কয়েকখানি সাময়িক পত্র (ইংরেজী ও বাংলা)-এর ব্যবস্থা করার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হয় সীমাবদ্ধ অর্থের জন্য। Messrs. Statesman Limited কিছুদিনের জন্য বিনামূল্যে তাঁদের সংবাদপত্র দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন। Consulate-General of the Federal Republic of Germany এবং United States Information Service Library কিছু বই এবং পত্রপত্রিকাদি দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁদের আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

খেলার সরঞ্জামের মধ্যে টেব্‌ল্‌টেনিস্ এবং ক্যারম্ বোর্ডগুলিকে প্রথমেই মেরামত এবং পালিস ক'রে খেলার উপযুক্ত করা হয়েছে এবং টেব্‌ল্‌টেনিস্ র‍্যাকেট ও বল এবং ক্যারম ও দাবার ঘুঁটি সবকিছুই নূতন কিনতে হয়েছে ; পূর্ব বৎসরের কিছুই পাওয়া যায় নি। প্রয়োজনমত কয়েকবার টেব্‌ল্‌টেনিস্ র‍্যাকেট, নেট, ক্যারম ও দাবার ঘুঁটি ইত্যাদি কেনা হয় এবং নিয়মিতভাবে প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণ টেব্‌ল্‌টেনিস্ বল সরবরাহ করা হয়। শেষের দিকে আরও একটি টেব্‌ল্‌টেনিস্ বলও কেনা হয়।

চিরন্তন প্রথা বজায় রেখে এবারও ১৮ই ফেব্রুয়ারী ষ্টীমার পার্টির আয়োজন করা হয়। কিন্তু আমাদের এই কলেজের প্রায় ষোল শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে দু শ' জনও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। অংশগ্রহণকারীদের স্বল্পতার দরুন, এই ষ্টীমার পার্টিতে বিরামাগারের জন্য বরাদ্দ অর্থের চার ভাগের তিন ভাগ খরচ হয়ে যায়। তবে যে কয়েকজন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের যদি আশানুরূপ আনন্দ দিয়ে থাকতে পারি তবে এই আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও এ অনুষ্ঠানকে আমি সার্থক মনে করবো। এই উপলক্ষে আমাদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভবতোষ সাহা এবং বিতর্ক পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়,

যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এই অনুষ্ঠানকে সার্থক ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে, তাঁদের আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অধ্যক্ষ ডক্টর সনৎকুমার বসু, বিভাগীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাস এবং সেই সকল ছাত্রছাত্রীকে যাঁহাদের অংশগ্রহণ ব্যতীত এই ষ্টীমার পার্টি সম্ভবপর হত না।

টেব্‌ল্‌টেনিস্‌ ও ক্যারম প্রতিযোগিতা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। দাবা প্রতিযোগিতা যথেষ্ট সংখ্যক অংশগ্রহণকারীর অভাবে অনুষ্ঠিত হয় নি। যাঁরা অংশগ্রহণ ক'রে প্রথম দুইটি প্রতিযোগিতাকে সার্থক ক'রে তুলতে সাহায্য করেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ১৯৬০-৬১ সালের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজিতদের নাম দেওয়া হল :

প্রতিযোগিতা	চূড়ান্ত খেলায় বিজয়ী	চূড়ান্ত খেলায় বিজিত
টেব্‌ল্‌টেনিস্‌	শ্রীযুক্ত স্বপনকুমার দাসগুপ্ত	শ্রীযুক্ত অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
	(প্রাক্‌-বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান)	(প্রাক্‌-বিশ্ববিদ্যালয়, কলা)
ক্যারম্‌	শ্রীযুক্ত শোভেন রায়	শ্রীযুক্ত তপনকুমার দাসগুপ্ত
	(১ম বর্ষ, বিজ্ঞান)	(১ম বর্ষ, বিজ্ঞান)

এঁদের রৌপ্যাধার এবং মানপত্র পুরস্কার দেওয়ার জন্য এক অপরাহ্ণে বিরামাগারের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়ার কক্ষে সামান্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেয়েদের বিরামাগারে প্রতিদিনের ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্র এবং বাংলা সাময়িক পত্র "দেশ"-এর প্রতিটি সংখ্যা আশা করি পৌঁছেছিল। তাঁদের তরফ থেকে কোন প্রকার অভিযোগ না পাওয়ায়, সারা বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েকখানি টেব্‌ল্‌টেনিস্‌ বল ব্যতীত আর কোনও প্রকার সাহায্য করা সম্ভব হয় নি।

অধ্যক্ষ ডক্টর সনৎকুমার বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাস এবং কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীকে কৃতজ্ঞমনে স্মরণ ক'রে শেষ করছি।

অরূপকুমার মিত্র
বিভাগীয় সম্পাদক—বিরামাগার

॥ রবীন্দ্র পরিষদ ॥ ১৯৬১-৬২

এ যাবৎ রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে দুইটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলার নাট্য আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভা এর মধ্যে একটি। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্য এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় নট শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি সকলের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়। রবীন্দ্র পরিষদের অন্য অনুষ্ঠানটি ছিল একটি সান্ধ্য রবীন্দ্র-সংগীতের আসর। আসরে শ্রোতাদের মনোমুগ্ধ ক'রে গেলেন সর্বশ্রী দেবব্রত বিশ্বাস, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, পূরবী মুখোপাধ্যায় এবং নীলিমা সেন। শ্রোতারা সকলেই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্র পরিষদের আরও দুইটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার পরিকল্পনা আছে।

ছাত্রবন্ধুগণের অনেকেই এত সাহায্যে করেছেন উপরোক্ত অনুষ্ঠান দুটি উপলক্ষ্যে যে, শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে তাঁদের সহযোগিতাকে ছোট করতে চাই না। এঁদের আন্তরিক সাহায্য ব্যতীত কোন অনুষ্ঠানই আয়োজন করা সম্ভবপর হত না। অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হবার পিছনে ছিল অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং সতত পর্যবেক্ষণ। এঁদের সকলের প্রতি রইলো সম্পাদকের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ।

সঞ্জয়কুমার সেন
সম্পাদক

।। রবীন্দ্র পরিষদ : কবির শতবর্ষ জয়ন্তী ।। ১৯৬০-৬১

রবীন্দ্র পরিষদের গত এক বছরের কর্মপদ্ধতির কথা লেখবার দায়িত্ব আজ যে আমার উপরেই এসে পড়েছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য গৌরবান্বিত। গৌরব এজন্য যে, এই কলেজের সংস্কৃতি-চর্চার আর যেসব প্রশস্ত ক্ষেত্র রয়েছে (অবশ্য সামনের এ্যালবার্ট হল বাদ দিয়ে), তার প্রত্যেকটির মানই যথেষ্ট উচ্চে, একথা স্বীকার ক'রেও, রবীন্দ্র-পরিষদকে শীর্ষ-মর্যাদা দিতেই হয়। এই সংস্থাটিকে যদি শুধু ছাত্রছাত্রীদের নাচ-গানের আসর জমাবার কেন্দ্র বলে মনে করা হয়, তবে এর প্রতি চূড়ান্ত অমর্যাদা করা হয়। একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের যে সম্পর্ক ছিল, এ-পরিষদ তার সাক্ষ্য বহন করছে তো বটেই, তা ছাড়াও বাঙ্গলাদেশের কলেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপরূপেও এই পরিষদের প্রথম সৃষ্টি। কবির জীবন-সূর্য যখন মধ্যগগনে, সারা বিশ্বের নিমন্ত্রণ যখন পৌঁছেচে তাঁর দ্বারে, সেই সময় এই কলেজে নানা উপলক্ষ্যে ঘটতো তাঁর শুভাগমন, এখানকার তৎকালীন অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে নিবিড়ভাবে মিলতেন, আবৃত্তি করতেন, আলোচনা করতেন, অভিনয় উপভোগ করতেন তিনি। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে সেদিনের রবীন্দ্র-পরিষদ বাঙ্গলার বিদ্বজ্জনের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

আজ কবির কায়িক অস্তিত্বের অবসান ঘটেছে, কিন্তু আছে তাঁর কীর্তি ; আমাদের জন্য আরও অমূল্য রত্ন রয়েছে—সেই সব দিনের স্মৃতি। আমরা যদি তার মর্যাদা রক্ষা করতে না পারি, তার জন্য আমাদের ক্ষমা নেই। তাই কবির জন্মশতবর্ষে যখন এই পরিষদের পরিচালনভার আমার উপর ন্যস্ত হল তখন আমার দায়িত্ব বিরাট, স্বপ্ন আকাশ-ছোঁয়া। তার জন্য সাগ্রহে উপদেশ গ্রহণ করেছি অধ্যাপকদের কাছে, সতীর্থ বন্ধুদের কাছে, এমনকি বাইরের অনেক কীর্তিমান গুণী ব্যক্তির কাছে। আমার কার্যকাল স্বল্প, আমার শক্তি সীমিত, ভাণ্ডার অসমর্থ। আমার আশা যতটুকু পূর্ণ হয়েছে, তা' আংশিক হলেও তার পেছনে যে বিপুল সাড়া জেগেছে তাই আমার কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। পরিষদের নিয়মিত কর্ম-পদ্ধতি এবং রবীন্দ্র-প্রণামের কর্ম-সূচী তুলে ধরলাম।

১৩ই জানুয়ারী, ১৯৬১ স্বামী বিবেকানন্দের ৯৯তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ফিজিক্স থিয়েটারে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও উদ্বোধন-পত্রিকার সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামীজীর জীবন ও মতবাদ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এই সভায় শ্রোতাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দেখা যায়, তা' অভূতপূর্ব।

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৬১ কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য-সভায় শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমনোজ বসু উত্তর-শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৫ই এপ্রিল, ১৯৬১ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সংগীতানুষ্ঠান। অংশ গ্রহণ করেন শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস, শ্রীপূরবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅর্ঘ্য সেন এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রী শিল্পীরা।

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উৎসব : এই উৎসবকে দুটি পর্বে পালন করা হয়। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান ২৪ থেকে ২৭শে এপ্রিল ফিজিক্স থিয়েটারে উদ্‌যাপিত হয়।

২৪শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। "রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র" পর্যায়ে স্বর্গত অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি রসগ্রাহী আলোচনায় এই দুই প্রতিভাধর মনস্বীর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে কবির সম্পর্কের বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য পরিবেশন করেন। অধ্যক্ষ ডক্টর সনৎকুমার বসু, ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ এবং পরিষদ-সভাপতি ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র বক্তৃতা করেন। আবৃত্তি করেন শ্রীশমীক বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীশক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সংগীতে অংশ-গ্রহণ করেন সর্বশ্রী প্রমিতা চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, শিবানী দাশগুপ্তা, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, সনৎ ঘোষ ও সুধীর সেন।

২৫শে এপ্রিল "রবীন্দ্রনাট্যের প্রয়োগবিধি" ও "রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন" পর্যায়ে আলোচনা করেন

যথাক্রমে নট-সূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী। নট-সূর্যের আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। অধ্যাপক চক্রবর্তীর জলদ-কণ্ঠের সেই ভাষণ শ্রোতারা সম্ভবতঃ আজীবন স্মরণ রাখবেন। শ্রীচক্রবর্তী পরিষদের প্রথম জীবনের আগন্তুক। রবীন্দ্র-পরিষদ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং যে আশা পোষণ করতেন, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি স্বীকার করেন যে পরিষদ পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সংগীতানুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়েছিল।

২৬শে এপ্রিল, বুধবার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন এবং ডক্টর কালিদাস নাগ যথাক্রমে 'রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বহির্বিশ্ব' পর্যায়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। রবীন্দ্র-সংগীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীপ্রসাদ সেন, শ্রীমতী সুমিত্রা সেন ও শ্রীমতী লক্ষ্মী রায় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা।

২৭শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের ঐতিহ্য' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁর সুদীর্ঘ আলোচনায় তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিভিন্ন যুগের মনীষীর ভাবধারার ক্রমবিবর্তন এবং ঐতিহাসিকরূপে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দরভাবে বিবৃত করেন। শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস, শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দের সংগীতার্ঘ্যে এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

৭ই আগস্ট, সোমবার—বাইশে শ্রাবণের স্মৃতিভারাক্রান্ত অপরাহ্ণে একটি সভায় শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কাল' বিষয় অবলম্বনে এক হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। কবির চিন্তাদর্শন, তাঁর সমাজদর্শনের মূলসূত্রগুলি আজও কত অবহেলিত, মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন আজও কত ক্ষীণ,—তারই আলোচনা ক'রে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে কর্তব্যের সংকেত তুলে ধরেন। এই উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ২৭শে, ২৮শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর।

২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী কবির স্মৃতিচারণ করেন। অতীতের স্মৃতি পুনরুদ্ধার ক'রে তিনি কামনা জানান, "রবীন্দ্র-পরিষদের পূর্বের ঐতিহ্য যেন অম্লান থাকে। আমরা প্যাণ্ডেল বেঁধে জয়ন্তীর ঘটা করি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ দূর হতে দূরে চলে যাচ্ছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনা চাই, প্যাণ্ডেল বাঁধার আর প্রয়োজন নেই।" অনুষ্ঠানের সূচনায় সমবেত কণ্ঠে বেদগান গীত হয় এবং শেষে আবৃত্তি করেন শ্রীবিকাশ রায় (প্রাক্তন ছাত্র ও সু-পরিচিত শিল্পী) ও শ্রীযুক্ত মৈত্রেয়ী দেবী এবং রবীন্দ্রসংগীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীশ্যামলী গাঙ্গুলি (প্রাক্তন), শিবানী রায়চৌধুরী, প্রমিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

২৮শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সাহিত্য পর্যালোচনা করেন। সম্পাদক শক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন এবং শ্রীউজ্জ্বল সেন উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ডক্টর সনৎকুমার বসু।

২৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে ফাদার ফাঁলো, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্মেলনে এক আলোচনা সভা নির্ধারিত ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শেষ মুহূর্তে পরিত্যক্ত হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর—শতবার্ষিকী উৎসবের শেষ দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজে এক স্মরণীয় কবি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে, শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লোকপ্রিয় কবিগণ এই সভায় সমবেত হন এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এতজন প্রথম শ্রেণীর কবির একসঙ্গে সমাবেশ স্মরণীয়কালের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে তুলনাহীন। পরিষদ-সম্পাদক তাঁদের সাদর সম্ভাষণ জানান এবং ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্যবাদ প্রদান করেন। পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরী।

রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানে যাঁরা শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন, তাঁরা হলেন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উপ-রাষ্ট্রপতি

ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ৺চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডঃ কালিদাস নাগ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীনরেন্দ্র দেব।

উপদেশ ও সহযোগিতা দ্বারা যাঁরা আমার আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হয়েছেন—অধ্যক্ষ ডঃ সনৎকুমার বসু, অধ্যাপক তারকনাথ সেন, অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কৈলাসনাথ ভট্টাচার্য।

প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে যাঁদের সাহায্য আমার কাজের সাফল্য এনেছে, তাঁরা শ্রীবিকাশ রায় (চলচ্চিত্র শিল্পী), শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সাংবাদিকতা বিভাগ, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীনীরেন সেন (ভূগোল বিভাগ, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীঅর্কপ্রভ দেব, শ্রীঅশোকনাথ বসু, শ্রীজয়ন্তবিজয় দে, শ্রীপ্রবীর মিত্র, শ্রীশান্তনু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রদ্যোৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনবীনকৃষ্ণ নাগ, শ্রীরণপ্রিয় মৌলিক, শ্রীউষারঞ্জন রায়, শ্রীমতী মিনতি রায় প্রভৃতি। এঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।

আমার কর্মসূচীতে প্রধানতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্য, কাব্য, সংগীত ও নাটকের ধারাবাহিক আলোচনা ও সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভাকে যথাসম্ভব উপলব্ধি করবার একটা চেষ্টা করেছি; তাতে সাফল্য বিরাট না হলেও, আন্তরিকতা যে বিরাট ছিল, তা' প্রত্যক্ষদর্শীমাত্রই স্বীকার করবেন।

সমালোচকের সংখ্যাও কম নয়, এবং সমালোচনা উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য—একথা স্বীকার করি। কিন্তু এক ধরনের সমালোচনা আমাকে শুনতে হয়েছে প্রায়ই, যে এই কর্মসূচীতে বক্তৃতা বা আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী নাকি ব্যর্থ হয়েছে। এই শ্রেণীর সমালোচকদের শুধু এইটুকু জানিয়ে দিতে চাই যে, পাড়ার পাঁচমিশেলী সংস্কৃতিচক্রের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের পার্থক্য এইখানেই। সংগীত বা নাট্যানুষ্ঠান আনন্দদায়ক সন্দেহ নেই এবং তার মধ্যে মানুষের অবচেতন শিল্পী-মন বিকাশলাভের সুযোগ পায়, তাও মানা গেল, কিন্তু যখন এইগুলিকেই সর্বক্ষণের একমাত্র খোরাক বলে মেনে নিই, তখন আমাদের রবীন্দ্র-উপলব্ধির অসম্পূর্ণ রূপটাই প্রকাশ পায় না কি?

এটুকু আশা রেখে যাই যে, আমার উত্তরসূরীরা এই পরিষদের মান আরও উচ্চে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন, কোনও অর্থহীন সমালোচনার ভয়ে গভীরতা ছেড়ে ওপরের চাকচিক্যটুকুর প্রতি আকৃষ্ট হবেন না। যে কথাটি আমার কার্যকালে বারবার বলতে চেয়েছি, তা' হল, মহাযুদ্ধের ভস্মাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে সৃষ্ট এই যুগে মানুষের জীবন-দর্শনে যে বিকার প্রকট হয়ে উঠছে, এই কলেজের সংস্কৃতি-দরদীরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন, তার থেকে আমাদের সুস্থ, সুন্দর জীবনচেতনাকে রক্ষা করতে হলে রবীন্দ্র-দর্শনকে গ্রহণ করতে হবে—কর্মে, কথায়, চিন্তায় ও আচারে। এই আত্ম-উপলব্ধির আহ্বান জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি; ভবিষ্যতের রবীন্দ্র-পরিষদকে অভিবাদন জানিয়ে যাই সেইসঙ্গে।

নিবেদক—

শক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক, রবীন্দ্র-পরিষদ ও

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতি

ছাত্র-সংসদ

এবারের ছাত্র-সংসদ গতানুগতিক কার্যতালিকায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এমন দাবী আমরা করি না। কিন্তু দলাদলি কমিয়ে সব ছাত্রদের নিয়ে মিলে-মিশে আমরা কাজ করতে পেরেছি। এটি শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের দৃষ্টি এড়ায় নি। অধ্যাপকদেরও আমরা সংসদের কাজে উৎসাহী করতে পেরেছি।

প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহের ফিল্‌ম্‌-শো ছাড়াও এবারে আর একটি চলচ্চিত্র সংসদের তত্ত্বাবধানে প্রদর্শিত

হয়েছে। সেটি হল আইয়েনস্টাইনের 'ব্যাট্‌ল্‌সিপ পোটেমকিন'। ইতিপূর্বে কলেজে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন কোন ছবি প্রদর্শিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

নাট্য-সম্পাদক শ্রীপ্রবীর মিত্র পদত্যাগ করায় প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহের নাট্যানুষ্ঠানের ভার সাধারণ সম্পাদকের ওপর ন্যস্ত হয়। ১৯৬১ সালের ১৮ই জানুয়ারী বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রচিত 'পরিহাস-বিজল্পিতম্' ও সুকুমার রায়ের 'চলচিত্তচঞ্চরী' অভিনীত হয়।

মার্চ মাসের রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন দেবব্রত বিশ্বাস, পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নভেম্বর মাসের জলসায় গান গেয়েছিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বিশ্বাস। উভয় অনুষ্ঠানেই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৬১ সালের ১লা জুলাই পশ্চিম বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে পুষ্পস্তবক উপহার দিয়ে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ৪ঠা আগস্টের প্রবল বর্ষণে প্রায় সব ছাত্রছাত্রীকে কলেজের মধ্যে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাটাতে হয়। তাঁদের কষ্ট লাঘবের জন্য ইউনিয়নের পক্ষ থেকে খাদ্য-বিতরণের ব্যবস্থা হয়।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যে ছাত্রদল এসেছিলেন, ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারে আমরা তাঁদের সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম।

কলেজের জনপ্রিয় দারোয়ান বাবন সিং-এর শোচনীয় মৃত্যুর পর তার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি ফলক-নির্মাণার্থে সংসদ যে অর্থসংগ্রহ করেছিল, তা সত্বর কাজে লাগাতে আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অধ্যক্ষ বসু, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীভবতোষ দত্ত প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দের কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। ছাত্রদের মধ্যে শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅভিজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং সংস্কৃত কলেজের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকিশোর ঘোষ প্রচুর সাহায্য করেছেন।

ভবতোষ সাহা
সাধারণ সম্পাদক (১৯৬০-৬১)

বিতর্ক পরিষদ (১৯৬০-৬১)

এই বিবরণী যখন প্রকাশিত হবে, তখন আমার পরবর্তী সম্পাদকের কার্যকালও সমাপ্তপ্রায়। সুতরাং ১৯৬১ সালের বিতর্কাবলী তখন বিস্মৃত ইতিহাস।

সে-বছরে গতানুগতিকভাবে প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহের বিতর্ক দিয়ে পরিষদের কাজ শুরু হয় নি। ৭ই জানুয়ারী একটি প্রদর্শনী-বিতর্কের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিষয়: "আদর্শবাদ প্রগতির অন্তরায়"। প্রস্তাব সমর্থন করেন, শ্রীসমীর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসনৎ ভট্টাচার্য। বিপক্ষে বলেন, শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী রাণু গুহ।

প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহের বিতর্কে প্রতি বছরের মতো বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্ররা পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। "ভারতের কল্যাণার্থে দশ বছরের জন্যে একনায়কত্ব প্রয়োজন"—এই প্রস্তাবের সপক্ষে বর্তমান ছাত্রদের হয়ে বললেন শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনুপম বসু এবং শ্রীমতী রাণু গুহ। বিরোধিতা করলেন: প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ: শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসাধন গুপ্ত, শ্রীসিদ্ধার্থ রায় ও শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত। প্রাক্তন-পক্ষে এরূপ সমাবেশ ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। বক্তৃতাকক্ষে ভিড়ও হয়েছিল অভূতপূর্ব। শ্রোতারা হতাশ হয়ে ফেরেন নি। তত্ত্ব ও তথ্যের মিশ্রণে, গম্ভীর উক্তি ও চটুল প্রত্যুক্তিতে, সভাকক্ষ মুখরিত ছিল।

জানুয়ারী মাসেই স্কটিশ কলেজের আহ্বানে সেখানে তাঁদের দলের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীঅনুপম বসু, শ্রীকল্যাণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অলোকনন্দা রায় ও শ্রীপ্রবীর রায়।

বাংলা বিতর্কের প্রতি পরিষদের উদাসীনতার অপবাদ অপনয়নের বাসনায় ২৫শে মার্চ একটি বাংলা

বিতর্কের আয়োজন করি। এই বিতর্কে কলেজের বাহিরের শ্রোতাদের উপস্থিত থাকতে দেখে বাংলা বিতর্ক সম্বন্ধে উৎসাহের পরিচয় পেয়েছি। বিতর্কে বলেছিলেন শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তী, শ্রীঅর্কপ্রভ দেব, শ্রীমতী রাণু গুহ, শ্রীতীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রবীর রায় ও শ্রীসুভাষ রায়।

গ্রীষ্মাবকাশের পর 'অধ্যাপক বনাম ছাত্র' বিতর্কে অধ্যাপকদের (শ্রীনন্দলাল ঘোষ, শ্রীনির্মল সিংহ ও শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়) প্রতিপাদ্য প্রস্তাব ছিল, "অধ্যাপকদের পক্ষে নিজেদের মতামত ছাত্রদের ওপর আরোপ করা অনুচিত"। বিরোধিতা করেন শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকল্যাণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅনুপম বসু।

২৮শে জুলাই তারিখের মক্-পার্লামেণ্ট উপলক্ষে কলেজে প্রবল উদ্দীপনা জাগে। লোকসভার অধিবেশনের উদ্বোধন করেন শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়। অংশ গ্রহণ করেন: শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ); শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত (প্রধানমন্ত্রী); শ্রীসুরপ্রিয় মুখোপাধ্যায় (প্রতিরক্ষা); শ্রীঅনুপম বসু (অর্থ); শ্রীমতী রাণু গুহ (শিক্ষা); শ্রীপ্রেমেন আঢ্য (স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া); শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরিবহণ ও যোগাযোগ); শ্রীজলি কাউল, শ্রীদেবকুমার দাস ও শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (কম্যুনিস্ট দল); শ্রীসুজয় শ্রীমাল ও শ্রীকল্যাণ মুখোপাধ্যায় (পি. এস. পি.); শ্রীপ্রবীর রায় (জনসঙ্ঘ); শ্রীরামচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী উমা রায় (নির্দলীয়)। আলোচনার বিষয় ছিল 'জাতীয় সংহতি'; অংশ নিয়েছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট সভ্যত্রয়। কিন্তু শ্রোতারা বেশী আমেজে পেয়েছিলেন প্রশ্ন-ঘটিকায়।

আগস্ট মাসে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে একটি দল (শ্রীপুরুষোত্তম লাল, শ্রীহিরণ্ময় কার্লেকার, শ্রীআশিস গুপ্ত ও শ্রীনারায়ণ বিশ্বনাথন্) কলেজে আসেন বিতর্ক করতে। তাঁদের বিরুদ্ধে কলেজ-দলে ছিলেন শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তী, শ্রীঅনুপম বসু, শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আন্তঃ-কলেজ বিতর্কে দলীয় ও ব্যক্তিগত সম্মানের তালিকা স্থানাভাবে দেওয়া গেল না। সেই-সব বিতর্কে কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন আঢ্য, শ্রীঅনুপম বসু, শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী রাণু গুহ, শ্রীমতী নন্দিনী বাগচী, শ্রীমতী উমা রায়, শ্রীবিজয় লাল, শ্রীজয়ব্রত ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রবীর রায়, শ্রীঅর্কপ্রভ দেব, শ্রীবিশ্বনাথ মোর প্রভৃতি। তার্কিক-নির্বাচনে এই সত্যই উপলব্ধি করেছি যে, খুঁজতে জানলে, অপ্রত্যাশিত স্থানে দক্ষতার সন্ধান মেলে।

ধন্যবাদজ্ঞাপনের তালিকায় প্রথমেই উল্লেখ করব শ্রীরাজেন সেনগুপ্তের। তিনি কেবল একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বই করেন নি, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানসংক্রান্ত কাজে হাসিমুখে আমাদের অনেক আবদার মেনে নিয়েছেন। শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত, শ্রীসমীর গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছি। খুঁটিনাটি কাজে সহায়তা করেছেন শ্রীরামচন্দ্র রায়, শ্রীভাস্কর সেন প্রভৃতি। অক্লান্ত কর্মী শ্রীভবতোষ সাহাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে না পেলে কোন বিতর্কই পুরোপুরি সার্থক হত না।

পরমসৌভাগ্যক্রমে শ্রীনির্মল সিংহকে পেয়েছিলাম বিতর্ক-পরিষদের সভাপতিরূপে। ছাত্রদের ওপর তাঁর অটুট আস্থা সাংগঠনিকদের মনে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর উপদেশ ও পরিশ্রম বহুবার আমাদের ভরাডুবি থেকে বাঁচিয়েছে।

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, বিতর্ক-বিভাগ (১৯৬০-৬১)

ছাত্রী-বিরামাগার

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রীদের বিরামাগার পুরো একটি বছর পরিচালনা করা এবং সেই অভিজ্ঞতা সর্ব-সাধারণের জ্ঞাতার্থে লিপিবদ্ধ করা খুব একটা সুখদায়ক কাজ নয়। আমাদের বিরামাগারটি আকারে ক্ষুদ্র, প্রকারে অন্ধকার, আকর্ষণে নিঃস্ব, সর্বতোভাবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। বৃহত্তর উজ্জ্বলতর কোনও প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত করার আগে এর কোনও উন্নতিসাধন অসম্ভব যদি না-ও হয়, নিরর্থক নিশ্চয়ই। আমাদের একটি

গল্পগ্রন্থসংগ্রহ যার বই-এর সংখ্যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয়। এই বছর সেই সংগ্রহে কিছু বাংলা এবং ইংরেজী বই সংযোজিত হয়েছে। আমাদের একটি টেব্‌ল্ টেনিস টেব্‌ল্ আছে এবং কখনও কখনও মেয়েরা এইটি ব্যবহার করে থাকে। খাপছাড়া শোনাবে, কিন্তু এই বছর আমাদের কিছু নতুন চেয়ার টেবিল কিনে দেওয়া হয়েছে।

কলেজে দ্বিতীয়বার ছাত্রীরা একটি নৃত্যনাট্য উপহার দিয়েছেন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা'। পরিচালনায় যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অধ্যাপিকা কাজল বসু এবং সুমিত্রা তালুকদার, অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত এবং দিলীপ বিশ্বাস, নীপা ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ না করলে এই বিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'চিত্রাঙ্গদা'-র সাফল্যের মূলে ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছিল।

শেষে একটি বিষয়ে সকলের, বিশেষ ক'রে কর্তৃপক্ষের, মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে ইতি করছি। কলেজ য়ুনিয়নের একটি নিয়মিত বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রীদের বিরামাগারের জন্য কোনও বাজেট নেই।

উমা রায়
সম্পাদিকা

বহুবার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ও নানা অ্যাসোসিয়েশনের কার্যাবলীর বিবরণী সময়মত এসে পৌঁছায় নি। এ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ও অনেকাংশে অবহেলা, একান্তই পরিতাপের বিষয়।

বস্তুতঃ সকলের সহযোগিতা ভিন্ন কোন কাজই সুসম্পন্ন করা যেতে পারে না। আশা করি ভবিষ্যতে সকলেই এবিষয়ে মনোযোগ দেবেন।

গৌতম চক্রবর্তী
পত্রিকা সম্পাদক

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইংরেজী সেমিনার-এর প্রতিবেদন ইংরেজী অংশের ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

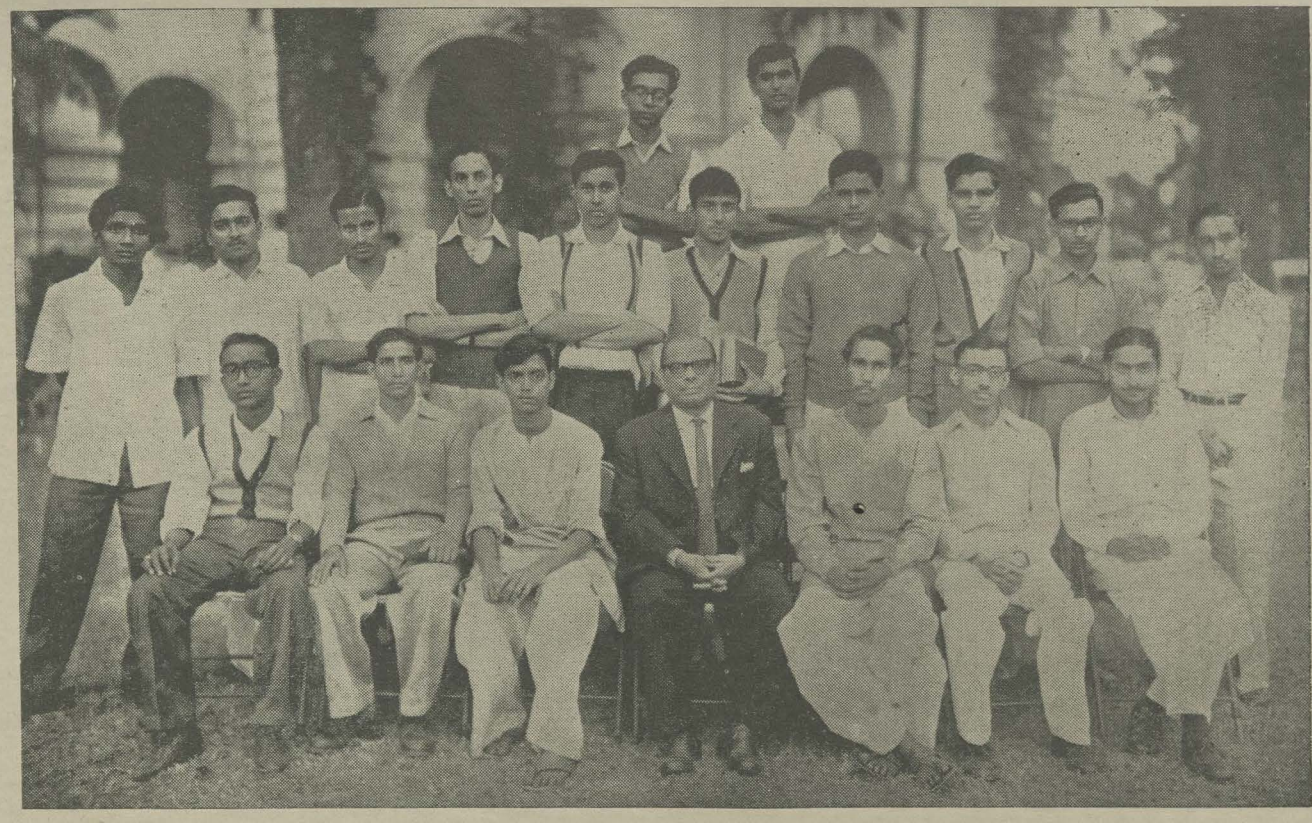

From Left to Right :

Sitting : A. Banerjee, R. Mondal (Social Service), A. Chatterjee (Publication), Dr. S. K. Basu (President), Bhabatosh Saha (General Secy.), T. Chattopadhyay (Debate), S. Mukherjee (Rabindra Parishad).

Standing : D. Basak, A. Basu, T. Dasgupta, P. Ghosh, B. Sen (Athletic Secy.), A. Gupta, R. Sen, R. Chakrabarti, R. Ghosh, A. Mitra (Common Room Secy.).

Back : K. Mukherjee, A. Bhattacharyya.

Silhouettes

".....and the floodlights
of the sun."

Silhouettes

THE
PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

VOL. 44 SEPTEMBER, 1962

Editorial

"Is there so small a range
In the present strength of manhood, that the high
Imagination cannot freely fly
As she was wont of old? prepare her steeds,
Paw up against the light, and do strange deeds
Upon the clouds? Has she not shown us all?
From the clear space of ether, to the small
Breath of new buds unfolding? From the meaning
Of Jove's large eye-brow, to the tender greening
Of April's meadows? Here her altar shone,
E'en in this (college): and who could paragon
The fervid choir that lifted up a noise
Of harmony, to where it aye will poise
Its mighty self of convoluting sound,
Huge as a planet, and like that roll round,
Eternally around a dizzy void?
Ay, in those days the Muses were nigh cloy'd
With honours; nor had any other care
Than to sing out and sooth their wavy hair."

Thus said Keats, and thus say I, restricting myself, of course, to the world of Presidency College and its students. This very magazine had given of its best in days gone by, and the pens of the students had produced stuff worthy to be taken note of by the enlightened public at large. But now, apparantly, all that is indeed gone by. To continue with Keats:

"But ye were dead
To the things ye knew not of,—were closely wed
To musty laws lined out with wretched rule
And compass vile: so that ye taught a school
Of dolts to smooth, inlay, and clip, and fit,
Till, like the certain wand of Jacob's wit,"
(Brilliantly did they in exams. only)

Although I would never use Keats's strong terms, he seems to express beautifully, if taken in a modified manner, the state of affairs in this college, as far as the magazine is concerned. It seems to me that it is a task fit for any Hercules to make the Presidency College students write interestingly and fittingly for a magazine. Not that I am claiming to be any Hercules; far from it. The students give the impression that they can write only on answer papers and nowhere else. Or, that they have prematurely got into the habit of famous writers who are proverbially tight-fisted about their writings, and have to be cajoled and bullied to honour their readers with their immemorial words. I strongly hope that our students are not labouring under the misconception that they are already famous writers.

This editorial is not a complaint. It is a mere statement, offered for all it is worth—making the world, or that part of it which is concerned in this matter, cognizant with the existence of an irrefutable fact, viz., that the Presidency College students, apparantly, cannot write in such a manner as would make their own magazine fit to be read from top to bottom by themselves. The first contribution in this section puts this fact very nicely; I wish that more could write thus on not writing.

My predecessors had been concerned with far weightier matters, and had propounded their views on students' unrest and the mode of examination with the proper academic preciseness and aloofness. Let the mantle of Elijah rest upon their worthy shoulders, but not for me any such aloofness when vital issues stare me in the eye, viz., that the Presidency students display a woeful lack of initiative and capability for their own college magazine. I intend to thrash this matter out, casting aloofness to the wind.

The college magazine should be the embodiment of the spontaneous and, one should imagine, prolific mental activity of its members. Thus, when it is discovered that a solitary issue of the magazine is fighting for its very existence for lack of suitable contributions, one has a right to feel alarmed and depressed. It indicates a stagnation of the minds of young people. Stagnation in any form is pitiable, but when it goes so far as to curdle the hot blood of youth, it is terrible indeed. And when such conditions are met with in the premier educational institution of the State, where the best students come to learn and the best teachers teach, it is lamentable to the extreme!

I am being bold, rashly or wisely, I know not as yet; and as I hope to be out of your reach by the time this magazine makes its appearance, I think that I can safely assume the role of the castigator. From the time I had joined this college for the first time, six years ago, I had always heard a set complaint about the college magazine—that it was high-brow, that it was meant for research scholars only. And, in all fairness, I would not say that the complaint was entirely unjustified. The Presidency College Magazine was a sort of show-piece; to be pointed at

with pride, but rarely to be read wholly with interest. I had watched with interest and sympathy the struggle for freeing the magazine from this stigma. And acting on the principle that failure is better than indifference, I had decided on a policy of as radical a change as would be possible under the circumstances. Most of the students, I found, were under the impression, and not uncorrectly so, that unless a piece of writing proved to be beyond the appreciation of most students, it would not be deemed worthy to be published in the magazine. I have tried to dispel this system by choosing as far as possible such articles as would interest any student, whatever may be his particular subject or class. As a result, the magazine might lose some of its prestige-value, but, I hope, will gain equally in popularity. I know it is questionable to put such an established magazine to new paces, and I beg the pardon of every one concerned for this experiment.

The college is constituted of boys and girls, of professors; they are human, and they think in the same way as other human beings do. I believe that the college magazine is the organ by means of which these human beings, the life-blood of the institution, should express their innermost thoughts and ideas, their genuine hopes and inclinations, without being clogged down by any fear of high-handed censorship from any quarters. I believe that to make the students write only one type of articles is to waste a huge amount of latent talent, and to dampen enthusiasm which is vital for the healthy growth of such an organisation as the college magazine. I believe that the thought-processes of the students cannot be made to conform to one level only; nor can the real, underlying nature of the boys and girls be suppressed by publishing such articles as will convey only a glorified and misleading impression of the college as a whole. All the Presidency College students are not enamoured of "Symmetry, Parity and Antimatter"; nor with the "Use of Radio Isotope In Medicine and Industry"; nor are they concerned with the Dialectics of Marxian Economy or the Capitalist Diplomatic System. Such subjects are specialised ones, and, I am sure, will prove to be of the greatest interest and merit in their proper fields. But the field of the college magazine, I believe, is a much commoner field, where any one should have a right to look for such articles as would be appreciated by all. And I have acted on my beliefs.

If a piece of writing bears the unmistakable stamp of sincerity and does not denote any defect of thought, it has an uncontestable right of being considered for publication. Let the outside world know our students —through the medium of the college magazine, which is ideally equipped to carry out this mission. If the bulk of the articles show a bias towards the insignificant and the jejune—let it be so. If, on the other hand, they prove to be very humanly concerned with the elemental problems that

beset nature—why, let it be so, with all its nakedness and crudity. And if they tend towards abstruse and forbidding technical subjects—still let it be so. Truth should not be sacrificed. The correct and unalloyed picture should be presented, which carries with it a vigour all its own. This has been my humble endeavour. I do not know whether I have made a mess of it all or succeeded in some small measure. It is left to the readers to judge and deliver the verdict. And if it is thumbs-up, then I would have it known that there are many to whom I owe my gratitude for help rendered, especially to the Navana Printing Works for having done an extremely quick job.

On Writing

SUKLA RAY
Fourth Year, English

An hour has passed !
Yet, why does the paper remain blank as before ?
A procession of parallel lines stretch over this
and into the next page —
Then end abruptly. A hopeless search for inky strokes,
Ends at the inevitable craggy shores of the blank mind.

A sheer drop ! And below seethes the heaving mass of vague,
unbodied, ambitious ideas.
The mad churning forming a thick foamy blanket
Of spluttering bubbles, from which no single thought
may take shape.
Break ! Break ! O Waves, against the unrelenting
barrier of the void —
Until the very rocks begin to crack and crumble and fall away.
And one single wave surmounts the other
and floods the plains above !

Meanwhile the ink dries and the tooth has
Scarred the pen into unrecognizable mutilation.
A border garlands the blank space on the paper.
Vague wanderings of a searching mind,
The scribbles show the progression from vagueness to oblivion,
From the penumbra to the umbra of the shadowy brain.
The second hour strikes !
The paper remains as before —
Blank, stark, glaring — White !

To Our Critics

RANU GUHA
Fourth Year, History

In our schools and colleges, in social gatherings, in public meetings, in newspapers and magazines—wherever our elders have a chance to express themselves—we are told that the students of today are rash, indisciplined, mean, selfish and disobedient; they do not have any high ideals or moral precepts. In a word, the society in future cannot expect anything from us, the students. We are bitterly criticized, we are laughed at, we are ridiculed!

But I would ask these severe critics to pause for a moment and hear what we have to say in this matter.

Before castigating us as "degenerate" and "worthless" please remember that we are born in a chaotic age of indecision and degradation. Our childhood days were overshadowed by the clouds of the Second World War and the gloom is growing in intensity as days go by. All the old values are crumbling down. There is economic instability everywhere, stark unemployment faces us in the future. There are too many "isms" all around us. Which God are we to follow? We fail to understand the turns and twists in world politics today. The so-called leaders in our country also are themselves swayed by love of power and love of wealth—they only lead us astray. The patriots whom we once worshipped as heroes have been found to have feet of clay. In policies, in education in our schools, colleges and universities—everywhere there is utter inefficiency and confusion.

Is it any wonder that we, who are groping in the dark, without any ideals before us and without any true leader who can lead us in the path of discipline and unity and with the monsters of want, hunger and unemployment always staring at us, shall indulge in acts of indiscipline and recklessness through sheer desperation?

I ask our elders, have they set a very good example of unity and discipline before us which we can safely follow? What right do they have to call us indisciplined when there is an utter lack of discipline in all their actions? What right have they to condemn us for lack of high ideals when they can scarcely show us any? Why brand us as selfish, mean and jealous when your selfishness, meanness and jealousy have travelled beyond the scope of even our youthful imaginations?

When our elders criticise us and paint a very rosy picture of their young days, we know it is nothing but the common human failing of nostalgic pining for the past. The past, shed of its thorns, appears in retrospect always as happy and bright. But we know that our elders when they were

students were often as boisterous and as irresponsible as sometimes we are. Are we any worse off than the students of the twenties, thirties, forties or fifties of this century when our critics themselves were students? Did not the elders in those periods decry the Young Bengal for their irreverence, irresponsibility and indiscipline? So when we hear bitter criticism against us, is it any wonder that sometimes we smile in our sleeves and recall from the pages of history what their elders said about our present elders when they were young students!

We admit we have our faults. Many of us are often swayed into acts of indiscipline, and sometimes violence, at the slightest provocation. Some of us pose as great intellectuals and in an effort to impress others belittle the truly greats over a cup of coffee. A few are even great connoisseurs of art and literature and only make themselves objects of ridicule when they step beyond their world of makebelieve.

But it must be remembered that young students cannot pause and think like mature and experienced grown-ups. They are easily swayed by their hearts, specially when there is provocation. The gloomy present and still gloomier future make young people naturally frustrated and irresponsible. This is no apology for acts of violence but let our critics pause and consider sympathetically how far the economic and social instability contributed towards the sporadic outbursts of violence in the student community. The world of makebelieve is a direct result of the natural tendency of young minds to shrink from the stark reality of today.

We ask our critics: have we nothing to be praised for at all? The students do have talents and show promise for the future. We are confident —from amongst us will spring national heroes of tomorrow. The students have always been the standard-bearers in the struggle for freedom. While the elders talk and hesitate, the students fling themselves in the midst of movements without any fear for their lives or future. They eagerly give their lives for the cause while others parley.

So we appeal to our critics: Please try to understand us and have a little consideration for our feelings. Do not judge us from your adult and mature point of view. Try to understand our problems and help us to find our way through the maze that is around us. We are ourselves aware of our failings and do not need cruel reminders at every step. Pull us up now and then by all means, but do not brand us—"for ever lost to society". Give praise where praise is due for a few words of encouragement can do miracles where canes and red eyes fail. We appeal to you—have a little more sympathy, patience and love.

The British Impact on India

RAKHAL CHANDRA NATH
Sixth Year, Arts

The impact of one civilisation over another is always a fascinating study. But the risks are here greater of running into hasty generalisations and indulging in over-simplified statements. One important consideration, therefore, we would like to point out right at the outset. This is the point of duration. In politics, as in physical science, when one body impinges upon another, the effect of the impact is determined not only by its force but to a great extent also by its duration. This is important because very often one forgets how short has been the duration of the British impact on India. The period during which British influence was paramount all over India is hardly more than about a hundred years—short by comparison with the five hundred years of Muslim rule, and a fleeting moment in the long history of India. It might then seem improbable that so brief an interruption to the general course of Indian development should have left behind it any significant and permanent result.

The improbability becomes greater when one realises the highly developed and complex civilisation with which the British came into contact. That civilisation is an amalgam of two elements: one Hindu and one Muslim. The latter is famous for its highly uncompromising character and the former's flexibility and absorptive capacity are also proverbially true. In a word, the main elements in Indian life and thought are in fact highly self-protective. It might therefore be presumed that the relatively brief impact of the British rule would have left little permanent mark. But history tells us that some of the evident effects of that rule have come to take on an appearance of permanence.

Though we orientals stigmatise European civilisation as profoundly materialistic, it is, strangely enough, in the realm of ideas that British influence on India has been strongest. The most important illustration is to be found in the development of Indian nationality and the growth of Indian nationalism. That happened through a complex process. For instance, a strong and ubiquitous Central Government, administering a uniform system of law with a degree of efficiency, relentlessly imposed an unprecedented homogeneity. The Tamil, the Bengali, and the Guzrati for the first time obeyed the same law and observed the same forms in their dealings with authority; and in the process they were insensibly drawn closer together. Secondly, the introduction of English education brought the upper middle classes under the influence of western thought at a time when nationalism

was the most vital factor in the life of Europe, while at the same time the English language provided them with a common medium of communication. The development of the Press also helped the growth of a common consciousness. Thus, one language could penetrate the vast area of India.

But the process of unification has not been wholly advantageous, for, the development of a strong Central Government has gone to undermine those village institutions in which the native political genius of India was most truly displayed. Despite protests from the wisest administrators, the East India Company steadily destroyed the political importance of the villages, and few things in British rule are more pathetic than the attempts, during the last seventy years, to recreate those village institutions. "This loss," opines Sir Percival Griffiths, "must in fairness be set against the gain which has resulted from political unity."

The new belief in the rule of law is one most important result of the British rule. The newness of this conception only means that this principle is now so deeply entrenched in Indian hearts that "even tyranny must now proceed according to the forms of law."

And it is to some extent an historical accident that these two ideas of the rule of law and the principle of nationality led to the final establishment of the parliamentary system of government in India. Discussion may be started about the suitability of this system to the political genius of the Indian people, but the truth is that in the twentieth century it would have been psychologically impossible for Britain to offer, or for India to receive, self-government in any other than the parliamentary form. It is no doubt an exotic plant; and twelve or thirteen years is too short a time in the life of a nation to form the basis of a prediction, yet at the moment the parliamentary system seems admittedly and firmly entrenched in the Indian way of life.

Although it is in the political sphere that the influence of British thought has been most spectacular, equally important has been the impact of western science. Through the medium of English, the scientific spirit, for long buried in spiritual infatuation, had been rekindled. Indian students have not infrequently outstripped their western teachers, and in the twentieth century the name of Jagadish Chandra Bose was to attest the position of India in the world of international science. The influences that brought about this mighty change were, in a sense, not British but European; but it was through British agency that they were brought to bear and they must surely be reckoned as an important aspect of the impact of the British rule.

The revolution in Indian scientific thought necessarily had its effects on all other departments of learning. Educated Indians today have completely assimilated western modes of thought and expression; and European and Indian writers on political, economic or other subjects operate almost

within the same framework of thought. The Indian mind which was cribbed, cabined and confined for centuries, became free. It had moved in the same old grooves for years; now it began to move on unchartered waters and unpathed shores.

The change had not, however, been wholly for the better, for it has given a materialistic twist to Indian thought and has introduced a worship of wealth which was not present in India of the Vedas or the Epics. But it is also plain that intellectual India has thereby received a dynamic impulse and has become once more creative. For good or for ill, western scientific thought has thus conditioned the Indian approach to all the problems of life, whether practical or speculative.

This degree of conditioning is most clear in relation to Hinduism. British influence has reacted on Hinduism principally in three ways. In the first place, it led a small but important section of highly educated Indians to abandon their traditional Hindu thoughts and feelings and to adopt a western outlook on life and philosophy. These thorough-going occidentalists were for a time very influential, but their influence gradually diminished as nationalism began to take shape.

There was then a growth of reformed sects such as Brahmo Samaj, which aimed at a synthesis of the best in Hinduism and Christianity. They too faded into the background in the twentieth century.

No less important was the reaction produced on men who feared their immemorial faith would be swept aside by new-fangled ideas and so rose stoutly to its defence. The militant orthodoxy which they developed combined readily with—and indeed inspired—the new nationalism, to produce a mighty spiritual force. Thus, without in the least intending to do so, the British revived Hinduism after its long period of stagnation and uncertainty.

The influence of this sort, however, did not so easily and successfully penetrate deep down to the villages of India. Yet the point is established beyond doubt that outside events and trends of thought press more closely upon the villager today than ever before and they are unlikely to leave his beliefs and customs unchanged. In fact, the intrusion of the outside world into the villages is one direct result of British rule.

Then turning to the British economic impact on India, it is possible to see a threefold effect. It has, first, introduced India to modern industrial and commercial methods, other developments following suit; it has vastly expanded agricultural and industrial productivity and so increased the national wealth; and it has probably made life a little more comfortable for the average man. It is scarcely, therefore, too much to say that by the end of the period of British rule India has been well equipped for rapid economic progress, not only by reason of the material developments that have taken place, but still more because she had learnt the art of modern

business and industrial management, and had been strongly imbued with the scientific and industrial spirit of the West.

Thus, there have been gains as well as losses, but there can be little doubt which way the balance lies. Considering all these, the conclusion, therefore, seems inescapable that the question of the British impact on India is no longer one of mere academic contention; it is now a fact of history, and as such it cannot be denied or ignored without impairing the cause of historical verity.

Writing History : A Revaluation

CHITTABRATA PALIT
Sixth Year, Modern History

How to write history is a problem which has drawn a wide variety of opinions from historiographers. To understand the problem, a study of the process followed in writing history and difficulties that arise at different stages should be most illuminating.

Events of the world are in a continuum, chained by cause and effect. It is impossible for a single historian to record all such events, in every necessary detail. World histories that we have today, are all general observations of the salient features of the subject. In such works, the author dominates more than facts warrant.

On this issue, modern historians feel in different ways. In our period, we find nationalistic States engaged in a battle of nerves and a race of arms. Universal brotherhood has become a myth. Under the lengthening shadow of doom, we talk of man, instead of man and of States, in preference to the world at large. It is the duty of the historians to write world histories for emotional integration of mankind and avoid emphasis on national State.

If history is to be harnessed to the cause of world peace and prosperity and if that is the pressing need in these troubled times, the plea for world history should have good grounds though such works suffer from obvious limitations. For fuller and more intensive scientific knowledge, a ramified treatment of history appears to be more desirable.

Ramification of historical knowledge, implies classification of facts under different heads. Hence, in recent times, penetrative studies of various aspects of history, i.e., economic, social, military, etc., have come out and addi-

tions are being made every now and then. These are outcome of deep research and say little beyond facts. But such specialisations have one possible shortcoming. These make one forget the totality of history.

It is not true to say that specialised study rules out the intrusion of the author's personality. In marshalling facts of even a sectional history, omission and commission according to importance are inescapable. This is because facts are numerous and confusing. There is no generally accepted yardstick for this except the one of personal preference. If the period is very short, for instance a decade at best, history of a particular country can be told in all necessary details. It may be noted that this type of research would mean tremendous labour of more than one scholar. This alone would dampen the enterprise of historians facing the history of long ages. The task is likely to be insurmountable and futile.

Thus, even at the rudimentary stage, personal choice or bias comes in, not to speak of larger histories where greater and more austere selection of facts is made, resting entirely on the author's preference. There are instances galore of palpable bias in the works of imperialist, doctrinaire, patriotic and partisan historians, which can be easily detected. But there are histories, called objective and dispassionate, which are brilliant though unsuccessful attempts to reach the target.

Leaving aside the question of bias, we may turn to another complexity of a graver nature. It is admitted that events of our world are an endless series. But records of these events are too few and these again are not linked up by cause and effect as is required in constructing history. The annals, chronicles, documents and other source-materials are often fragmentary. To trace the missing links in the chain, historians resort to working hypotheses. Here, chances of a pitfall are not slender. The research worker may be guided by his own pre-conceived notions and seek in the sources only those evidences which would go to prove his own view-point. This had been the case with Machiavelli who derived only those facts from Livy which strengthened his theory. This is a common fault with all historians who try to patternize facts in history.

While talking of the predominance of scientific processes in writing history, one must not be oblivious of the methods adopted in the field of arts. History from this standpoint, is not only presentation of facts, but also interpretation of facts. Presentation of facts alone may be called—as it was called in bygone days—a chronicle or an annal. Interpretation of facts constitutes an integral part of history. In the light of different opinions all the pros and cons of a collection of facts are revealed. A historian apparently has something more to give to the readers than a scribe. Personal opinion constitutes that original contribution of the historian to the hisorical studies. Bias it may be called, but it is wholesome. Apart from the derivations which follow from facts, the historian may throw suggestions leading to further

researches. But more of opinion and less of facts should not be given undue indulgence, for, philosophy of history and history itself are different.

Finally, a few words on the style of writing history. The problem of presentation has been hotly debated. Modern view on the subject is that history should be written in strict logical sequence, precisely, and without much rhetoric. Diction must not envelop matter. This makes history a science, which, however, is not altogether undesirable. But the champion of the opposite view. Trevelyan,[1] was of opinion that history should be written with a special effort to make it interesting and lively. Otherwise, history would lose its universal appeal and remain confined to the closet of scholars. Moreover, history deals with past experience of man. These cannot happen a second time before the present generation. A historian should try with all the rhetoric at his command to resurrect the past with all its colours, tumults and other signs of life. This done, history becomes a subject of absorbing interest where the mind, restless in the thraldom of the present, can have a full play.

Without being carried away by either view, attempts should be made to strike a synthesis between scientific analysis of facts and an enthralling diction.

[1] It is sad to refer to Trevelyan as a past authority, dead and gone, because he was alive in a real sense only a week before this essay was composed.

REF.: [1] Renier: History: its method and purpose.
[2] Trevelyan: Autobiography and other Essays.

Chopin : The Lonely Pilgrim

UMA ROY
Fourth Year, History

It is more than a century ago that Chopin lived. Today he is no more, but the music he created is still with us. Styles and fashions have changed; manners and modes of life are different today. Yet, even after a century of upheavals, Chopin's music remains constant beyond question. His place in history is small, but significant and secure; his influence on the course of musical development* was considerable. For most of his career he was a sick man, wasted by the tuberculosis that ended his life before he was forty. He lived as an exile, withdrawn and lonely in spite of those who were devoted to him. It was as if he lived for music and for music alone. He was a miniaturist, who thought in terms of the piano and knew little besides.

Chopin appeared as a harbinger of the Romantic movement. Restless minds, who were bringing the movement to birth, recognized immediately that in Chopin they had a musician who was instinctively shaping those new thoughts, and the means of expressing them, for which they, too, were searching. He put his innermost self into his music, but outwardly he gave little of his personality. There was always a great distance between Chopin the man, wearing his mask of politeness and bland reserve, and Chopin the uninhibited poet of the piano. This duality, in fact, was reflected in his music too.

At the height of his fame in Paris, Chopin seemed the epitome of aristocratic charm. The pianist's outstanding taste in clothes and innate refinement of manners in the salons caused a flutter among the Parisiènnes. His pianism added to the excitement. "He is a poet in sound," wrote Heinrich Heine, "and nothing is quite like the delights he lavishes on us when he sits at the keyboard and improvises. At such times he is neither Pole, Frenchman nor German; he betrays a far higher origin and seems to come from the land of Mozart, Raphael and Goethe"..... Yet, once the moment Heine describes so lyrically had passed, the musician withdrew into his unapproachable self; and the mask of cool politeness veiled his personality. Beneath it raged a perpetual battle of the spirit between the intense seekings of an unsatisfied imagination and the discouraged rejection of a hesitant will in relation to the world around him.

Throughout the short and increasingly painful road by which the

---

* It goes without saying that when we speak of 'music' in this essay we refer to Western music. We make the point in this muted aside to save tiresome qualifications in the text.

composer travelled from a village outside Warsaw to a grave in a Paris cemetery, his roots remained firmly grounded in his homeland. They determined the nature of his friendships as much as the character of his music, and the circumstances of his childhood shaped his complex personality. He was the son of Nicholas Chopin, a French peasant from Lorraine who had emigrated to Poland at the age of 16, had married a Polish wife and become a tutor in various noble families. Frédéric François Chopin was born in 1810. He was the third of four children; the others were all girls and they, like the boy, were unusually gifted.

Soon after the son's birth, Chopin's father was appointed professor of French at the newly-founded Lyceum at Warsaw, and the family moved from the village of Zelazowa Wola to an apartment in the centre of the town. It brought them into close contact with the social and artistic life of Warsaw, from which the boy picked up his refined manners. His father, who was pleasant and easy-going, did little to check the tendency shown by his wife and daughters to spoil his brilliant only son. Frederick became used to having his own way and thus later disappointments affected him the more intensely.

It was from his childhood that Chopin showed an extraordinary sensitivity to music. Long before he was six years old, Chopin had begun exploring the piano keyboard. And this spirit of improvisation persisted in all the music he later played and composed. Although the boy was given lessons in rudiments and theory, he was virtually a self-taught pianist. He devised his own method of performing, through a completely natural predisposition. He quickly learned to write down his musical ideas, and his first *Polonaise* was published when he was seven. Very soon after, he made his appearance at public concerts. Before entering the Warsaw Conservatoire at sixteen, Chopin's rewards for youthful virtuosity included a diamond ring from Tsar Alexander I and an inscribed gold watch from the famous opera singer Angelica Catalani.

Thus passed his childhood days. Now he was forced into contact with the realities of a world of which he knew little and thought about less, and naturally the musician found himself desperately ill-equipped to come to terms with it. He fell in love for the first time at the age of 19 with Constantia Gladkowska, the daughter of a Warsaw civic official and an attractive singer. But Chopin could not bring himself to declare it, and expressed his feelings in the *Romance* of the *E minor Piano Concerto,* the three *Nocturnes* of *Op. 9* and the *Lento con gran espressione* in *C-sharp minor.*

Before he graduated from the Conservatoire, Chopin visited Berlin, Prague, Teplitz and Dresden, but his first major public acclaim came with the three Warsaw Concerts he gave in 1830, which were destined to be his last appearances in his homeland. The part of Poland where the Chopins lived was at this time under Russia and national feeling against Russian

sovereignty was rising in Warsaw. It burst into open and abortive revolt soon after Chopin had left Poland for the last time.

From Warsaw, Chopin came to Vienna. To win fame as a pianist, Chopin knew that he must conquer Vienna, the culture capital of the Hapsburgs. But his dreams were shattered. In Vienna he met with a succession of disappointments and set-backs. Vienna accepted his social graces but, in the matter of professional concert givng, it left him to shift for himself; and, when he did so, refused to succumb. To crown these disappointments, came the reports of the failing revolution at home. Chopin was at a loss: he could not go back nor could he afford to stay were he was. The only possible answer was Paris. And the puzzled composer drifted again.

It was during the early autumn of 1831 that Chopin reached Paris, and at once the city worked its own fascination. For a while, the pianist was again at ease with himself. His modest apartment overlooked an equally modest boulevard, the Boulevard Poissonière, yet for Chopin it was "the most beautiful view in the world."

Paris was then enjoying its newly-won liberty after the Second Revolution. Romanticism was in full flood. Here Chopin found a galaxy of young literary and artistic talent. Among the writers were Hugo, Balzac, Dumas and Lamartine; Delacroix, Ingres and Delaroche were infusing a new spirit into the pictorial arts; while Berlioz and Liszt were feeling their way towards a revolution in music. They welcomed the Polish visitor with spontaneous cordiality; and he, in his turn, rejoiced, if only temporarily, at the splendour around him. Chopin's conquest of the salons was rapid, and one result was a stream of invitations to give lessons to the daughters of noble families.

Yet it was not simply his ability to divert aristocratic minds that earned for Chopin a place among the immortals: the music rather than the man ensured his prestige then as it does now. By the time he reached Paris, he had already composed a considerable number of works. Most famous were the early *Polonaises* and *Mazurkas*—the first kind derived from a sophisticated dance of the Polish nobility and the second from a naïve peasant dance. Others were works intended for virtuoso concerts: the two *Piano Concertos,* some *Fantasias* on Polish tunes and the *Variations* on *Là ci darem* from Mozart's *Don Giovanne,* which earned from Schumann on its publication in Germany the famous critical accolade, "Hats off, gentlemen, a genius!" Apart from these relatively conventional forms, Chopin had also given expression to some of his deeper thoughts in the lyrical, elegiac pieces he called *Nocturnes;* he had invested the *Waltz* with rich imaginative content, and had begun to demonstrate his new conception of keyboard technique in the first set of studies.

In spite of all the fame that Chopin had achieved, his dreams were never

fulfilled. The bliss he glimpsed in his music was beyond his reach in life. The results were a settled melancholy, a morose introspecton and unsettling bursts of temper. Out of this restlessness came his extravagant and unexpected eight years' liaison with the novelist George Sand. The story of their strange and rewarding union has been told often enough in biographies of the composer and by George Sand herself. They fled to Majorca in the autumn of 1838, and lived there until, three years before the composer's death. They lived in solitude and in happiness. George spent the nights writing, and during the day she walked or was busy with the children, while Chopin composed some of his most romantic pieces. The agony which he was supposed to have felt, one stormy night, at not seeing George come in, has been claimed to be the origin of the *Prelude* "the rain-drop."

Chopin's declining health was seriously affected by the disastrous winter spent with Sand in Majorca. Sand, however, nursed him devotedly, and continued to protect him from material worries even after their return home. In such circumstances Chopin's genius found itself during the final phase as a composer. He completed the set of *Preludes,* which he had begun in Majorca. He renewed his study of academic musical treatises, and broadened his style to encompass the wider-ranging scope and depth of expression in the *Ballades,* the last *Impromptus, Nocturnes* and *Mazurkas,* and especially the *B-flat minor Scherzo, the F-minor Fantasia* and the *B-minor Sonata.* These were the works that influenced the mainstream of musical development from Liszt to Wagner and beyond. But as always with this tormented man the fulfilment in music was not reflected in life. On October 17, 1849 he died attended by a devoted English disciple, a daughter of George Sand and his sister Louise. Thus ended Chopin's career leaving behind for the listener a music constant in its power to delight each succeeding generation. The complete Chopin, as far as we can reach back to him now, is illuminated through the later masterpieces, like the *F-minor Ballade* and the *Fantasia,* with their controlled sadness and savage outbursts in sudden changes of mood. He was truly a pilgrim. "I have conquered the erudite and the sensitive. That will be something to talk about," he wrote. He made no other prophecy, needed no other credentials.

Thoughts from Abroad

ASHIS GUPTA
Ex-Student

One of my particularly irresistible friends back home has just written to me. His letter itself would have been an object of sufficient interest as far as I am concerned. Evidently he is not one of those individuals who would unnecessarily stir themselves to write a purposeless letter. When you consider that I am excessively prone to a feeling of pampered smugness every time I hear from a friend in India you will perhaps understand why I have been mugged into spending this lovely night in front of this machine when I could legitimately have wandered off to the beach for some welcome exercise -muscular, respiratory, and ocular. The letter had me almost choking with self-congratulation—to think that people still remembered me, to think that my name could still be sneaking into sparkling Coffee House conversations through a haze of blue Char Minar smoke. Believe me, it was a delicious feeling; my friend had reduced me to a helplessly, delightedly twitching mass of sheer joy by the time I had come to the closing words of his letter. "..... I expect it by the 10th of July. The magazine will be going to press by the 12th. Best wishes! Yours....." I think it is utterly unfair to deliver such a fatal thrust at an unguarded moment.

So here I am, bashing away at this dear Olivetti not knowing whether my words will find their way to the gossip columns of the Sunday paper, the pensive pages of some highbrow magazine, or the lurid pages of some illustrated periodical. Even the sketchiest of notions of what this magazine is all about would have helped me immensely to tune my thoughts to the correct pitch of propriety and picturesqueness. As it is, I have hardly a clue as to the level of intelligence to which I am expected to rise, and the inherent density of that which I must penetrate. But I am devoting too much time to thought, and asking too many questions. Ever since I have set foot in this land the futility of asking questions has been driven home to me time and time again.

People hardly stop to think in New Zealand. That is perhaps why they are so unbelievably happy here. Like so many of us in India the New Zealander does not spend sleepless hours contemplating nebulous ideas of freedom. He has hardly any time for abstract polemics accompanied by the jejune intoxication of black coffee and cigarettes. Freedom is something tangible, concrete, and not at all uncommon in this country. It comes in the shape of an automobile, a frigidaire, an electric cooking range,

a prefabricated home, a vacuum cleaner, and plenty of grog. Whether it be money, gambling or sex there is an uninhibited directness in people's approach to these things that starts by shocking the foreigner like me, and ends up by eliciting a silent admiration. Of course, the people could not care less whether or not they secured the alien's approval. Children grow up conditioned to these symbols and find absolutely no necessity to search for anything beyond the symbols themselves. Naturally, there is little or no incentive for most people to pursue an education beyond the school-certificate level. Even at the age of sixteen or seventeen a boy or a girl can select a job which will pay £5 each week. If he is robust and not given to squeamishness he might even choose to become a labourer. It is an ironical fact here that the filthier a job the higher the salaries it commands. Thus, I know of a twenty-five-year-old youth who chops carcasses in one of the big freezing-works; he earns a clean twenty-nine pounds each week and drives around in a flashy Jaguar. But it is also true that qualified teachers could not hope to start with such a high remuneration, although senior University professors could certainly look forward to £2,200 per annum by the time they are forty or so. Despite all this there is a crying shortage of teachers in New Zealand. But it is understandable when you realize that, after a high school education which has been paid for by the government right from the start (even text-books are supplied free of cost), an University education becomes an unprofitable proposition. Besides, parents receive a weekly allowance of fifteen shillings per child until the boy or girl leaves school. What a tremendous provocation to increase and multiply. Let Milton and Chaucer gather the dust of oblivion. At sixteen there is the prospect of a decent salary, and the inevitable independence. There is a widespread belief that only exceedingly brilliant minds and no-hopers flock to the four University towns of Auckland, Wellington, Christchurch, and Dunedin. But that is not necessarily the case. University life is hard for many, but it is charming as soon as one learns to recognise the cross-currents that often lend an aura of unreality over such a life. The basic characteristics remind me powerfully of Colin Wilson's portrayal of life in Notting Hill. But the undimmed squalor is certainly unimaginable in any of these University towns, except Christchurch perhaps.

It would be uncomfortably dull if this freedom was a prerogative of men only. Women aspire for and cherish this freedom as avidly as men. It is not considered vulgar for young men and women to discuss sex with a pathological disinterestedness that is startling. Of course, one may run into this particular type of discussion in India as well, but the motives are very much open to suspicion and the uninhibitedness collapses after only a few negligible hurdles. It is different here. Whatever be the nature of the love that animates an individual he will never lose his or her faith

in its physical manifestation. It is a rare and unusual man who does not look upon the physical as the touchstone of love. But do not confuse the physical with the animal, for there is rarely anything clandestine or surreptitous in what one is confronted with here. Under the circumstances, happiness is easy to come by. One can lose it easily as well.

I often think of Khajuraho and Konarak and wonder what stage of history it was when our nation started to turn into prudes. The flesh may be weak, but its motions are always influenced by the relentless dictates of the mind. It is disastrous for us in India to ape the 'enlightened' while we continue to blush inwardly at sight of those astonishing friezes of Khajuraho and Konarak which are the prize photographic trophies of so many leering visitors. It is silly to try and regain overnight the innocence and candour which we have lost for centuries. It is a price a nation pays for political subjugation which engagingly annihilates the spirit as well. The New Zealand way of life is not a rarity. It is merely an untramelled refinement of attitudes one encounters perhaps in many other countries.

I have had the enviable opportunity of participating in this life over the past four months and I feel quite enthralled by the earthy sensuousness of this experience. Like their unfortunate brethren in the East these people are born in freedom too. Unlike us, however, they refuse to bemoan the chains that they find everywhere. There is an acceptance of the base in man, but rather than be passive it is an acceptance that actually glorifies this baseness. It is for thinkers and individual convictions to repudiate or confirm this attitude. Undoubtedly, this is apt to leave existence and the passions extremely vulnerable, but at the same time it manages to reduce life to an evident transparency which will not elude even the most ignorant of men.

One tires of hearing the lame cliches on American democracy while segregationists blow up schools. It will be a time before America catches up with the "Kiwi" brand of a democratic welfare state. When they think of Maoris I would like my friends to rid themselves of visions of grass skirts and attractive expanses of flesh. The Maori is a proud and irrepressible figure in this democracy. He shares a very real sense of equality with the white man. What is more, he is the most likeable of persons. There is none of your glaring and widespread disparity of incomes, and, once outside the sphere of daily work, even the janitor can swap dirty stories over a glass of beer with the affluent landlord.

The New Zealand pub is indeed a great leveller. The cross-section of the normal attendance in practically any pub will reveal a curious assortment of bumptious department-store managers, timid bank clerks, neatly dressed travellers and foul-mouthed butchers. From about five (when offices close) to six (when pubs and bars close) in the evening these establishments light up with a throbbing feverishness. This is strictly a

man's hour into which no woman would dream of intruding. Even presuming that she did muster up within her enough audacity to venture into a pub, she would most likely be contemptuously ignored. It is seriously doubtful whether any woman could possibly match the fine and heady flavour of New Zealand's beer. An eight ounce glass costs only ten pence or eight pence depending on whether you are in a private or a public bar. It is usually a very dim-witted creature who fails to wash down an eight-ounce glass every five minutes. The average "Kiwi" admits unabashedly that the uninitiated foreigner would possibly find it surprising how "so many of us stand round and simply drink like pigs". "But they might as well send me to Siberia if Mum ever demands that I forego that little drop each evening". Whatever be her feelings on the subject, hardly any woman would be heartless enough to pose as an obstacle between her husband and the 'boozer'. After all, she has reason to believe that her husband will come straight home for dinner after a session at the pub. It is only a moron like me who comes and sits before a typewriter.

African Music

DOUGLAS KADENHE
Fourth Year, Economics

In case somebody comes under the mistaken impression that I am going to attempt a general survey of African music as a whole, I want to make it clear at the very outset that all I am going to try to do is to write about a particular type of music found in a particular part of the continent of Africa.

"TSABA-TSABA"—the very sound suggests a fiery rhythm. This is the music that has made the biggest noise in Southern Rhodesia for the last half century. Tsaba-tsaba is just as much a dance as it is drama and music. It is a form of spontaneous self-expression and complete abundance. It is essentially an art of improvisation—a kind of uninstigated combustion produced by the mood of the moment. The tsaba music caught on the tape or on the gramophone record is, at the best, a mere suggestion of the whole, a shadow of the reality. Any reproduction of it outside its atmospheric context is vaguely sacrilegious to the spirit of the real thing.

Though tsaba-tsaba has an affinity to the noise that seems to be the

main constituents of the notorious rock-'n-roll music, it is, in fact, distinct and unique. Even when tsaba-tsaba is adapted for performance on the modern stage, it is essential that it retains the element of impromptu and naturalness.

As it is a product of the particular moment, it is almost impossible to recapture any same impulse twice in succession. It has proved to be an infuriatingly elusive affair to reportray it once the momentary source has run dry its gamut. Such music that originates from the delicate nuances of the human mood from time to time is difficult to define except in practical demonstration, and words seem to be poorly equipped to carry over a picture that can be remotely adequate. In this respect the cinema is the only medium which can do justice to the nature of the thing.

For the evocation of the ideal mood that will produce the most enjoyable strain of the music, nothing else is so well-suited than the clear, open sky with the moon reigning in sole splendour.

The magic of tsaba-tsaba relies to a great extent upon the vibrant notes of the drum. The drum is the agent of provocation—the spark that ignites the latent urge of the dancers and releases the seething emotion that awaits expression. The rhythm penetrates the night, rises skywards and incites the dancers to sing and dance as if in response to a heavenly call.

The dancers sway and writhe, stamp and whirl, never touching each other unnecessarily. Although the dancers are paired off, still each is allowed maximum freedom of expression—interpreting the music into action according to the dancer's individual imagination and inclination. Freedom of emotional expression is a fundamental right of the tsaba-tsaba. The principle is that people dance because the urge is natural and irresistible. Dancers are not artificial beings at the dictates of art, but natural mortals revelling in the unalloyed joy of dancing and expressing themselves spontaneously instead of being restricted by the formulas of art. In tsaba-tsaba art follows nature.

There is innumerable variety in tsaba-tsaba. Every performer has his own steps and his own movements, and the audience would have nothing else. This abundant variety and constant change of style and tempo is quite in keeping with the proverbial mercurial character of the Rhodesians who cannot stand monotony. But at the bottom of the seeming chaos and profusion of movements is an underlying uniformity, provided mainly by the background rhythm.

Always towards the end the tempo increases gradually. The drum which had up to this moment mingled in euphony with the other instruments, now booms above the conglomerate sound, voicing its claim to supremacy. The dancers now sway lazily and rhythmically like branches of a tree in a gentle breeze. The couples pair up unconsciously and

separate again. The beat quickens unmistakably; the dancers get intoxicated with the music, and transfigured by their own prowess, their facial expression alters from strange concentration to frenzied obsession. Instead of merely enjoying the vivid animation one becomes sucked into the spirit of tsaba-tsaba, mysteriously becoming a part of it. Now the pennywhistle pierces above the overall sound, and all the other instruments join in harmony, concocting the delirious music of pipes and drums. The tsaba-tsaba has now assumed chaotic confusion, as sinuous bodies writhe and glisten in serpentine convolutions. By this time the music has risen to its final cyclonic crescendo that seems no longer of this world. The distinction between the dancers is lost in the blur of revolving bodies until they all emerge as mere forms and shapes caught up in the whirligig of the raging rhythm of tsaba-tsaba.

A Bus Journey

SAJNI KRIPALANI
Second Year, English

It was about 11.30 a.m. when I boarded the bus. It was reasonably empty and as I had a long way to go, I climbed the stairs to the upper deck and settled down with a book. But I had read just one paragraph when I heard a gentle voice say in Bengali: "Ma, couldn't we go upstairs?" The next minute I saw the owner as she came bounding in and sat down beside me.

She was a little girl—about six or seven years old, I should think, and not extraordinarily pretty—at the first glance, that is. Then I noticed her eyes. This may be regarded as a vain effort to be poetic—but they *did* remind me of the melting eyes of a deer. We were friends in a matter of minutes and what followed was the most interesting half-hour I have spent in my life.

We had just reached Esplanade. The bus was due to stop there for about five minutes. First, the little girl turned to the left and said—"You know, at night the tram lines are deserted, and they look like a lot of snakes. Not the kind that kill human beings, of course. These are very friendly ones." Then she said, "Can you see the teapot and cups up there?" "Yes," I answered. "Any idea who they're for?"

"At night," she replied, "you can see them being filled—that's the time the fairies come out. They like drinking from those big cups."

On we went, and this time she pointed out the Kassel's fan advertisement, which whirrs around at night. Said she—"Isn't it silly? During the day when it's so hot and the people need it, the fan stays still, and at night it goes round and round." I tried to explain in my broken Bengali, that the fan was not a real one, but just an advertisement. She nodded politely, but remained unconvinced.

She had just been learning to tell the time. She peered at my watch for several minutes, and then after counting around the dial, she solemnly announced that it was fifty-five minutes past eleven o'clock. I tried to teach her to count backwards and say that it was five minutes to twelve o'clock. But by the time I had summoned up enough words to speak in Bengali, it was twelve noon, and the lesson went overboard.

All this time her mother had remained quitely in the background, now and then smiling at me with all the pride of a fond mamma. We had just reached Dalhousie Square and I wondered what would be the next objects of her little stories. But she stared silently towards Writers' Buildings with its big iron gates. Then she turned around and said seriously—"That must be the jail where my father is a prisoner!" Her mother turned on her in great anger and slapped her across her face. The little one looked towards me and those beautiful eyes were now full of tears. I could not do or say much. I just put one arm around her while her mother told me very loudly that it was not true—that the little girl was a liar.

The rest of the journey was in silence. I tried to go back to the book—but I could not read it, and soon we reached college. As I got up to go, I said goodbye to my little friend. She gave me a shy little smile but said nothing.

I often take the same route and the Lipton's advertisement always brings back the childish voice, the fairies and the melting eyes, but the Writers' Buildings bring back a nagging question—who was speaking the Truth?

Insomnic Nights

MIHIR RANJAN BHATTACHARYA
Fifth Year, English

I and my friend, the ageing poet, were enjoying the quick gathering of the dusk over our big, bustling city, reclined on the overstuffed chairs he kept near the spacious southern window of his private sitting-room. It was a sparsely-furnished, big, high-ceilinged room, distempered a fading ivory and hung near the corners with pale, old, scarlet tapestry. The white afternoon light which the window-panes filtered in looked paler against the walls. Shadows were gathering in the corners, presaging the quick, hurried evening of our tropical winter, which would give the empty room a miraculous pallor, till the lights were turned on and night formally settled in.

I felt my friend was in a communicative mood, for a little earlier I had confided to him my secret trouble, the emotional imbalance which resulted from an inability to decide, and the long bouts of sleeplessness spent over feverish cerebration. I had ceased talking for some time, and was now watching the evening transform his face, which was dissipated but wise and kind, so that he looked almost handsome from certain angles. Gentle whirls of bluish aromatic smoke glided halfway to the ceiling and faded into the soft shadows—he smoked a slender and beautiful Egyptian brand—and I knew he was choosing words for his sermon. It always thrilled me to listen to his rich, well-modulated voice and his excellently chosen phrases, accompanied now by a superb shrug, then by a majestic wave of his hand, the long, pale fingers delicately holding the cigar. There was a touch of studied grace about his gestures, but it was almost his natural self; as he laughingly put it, everything about him must be an improvement upon nature and a step towards the kingdom of intellect and independence.

"I am glad, my dear young friend," he began, "that you experience some of the delectable tortures that imagination creates for the privileged, for you *are* one of the privileged. It does not consist in being in love, no, not at all, for, if you don't mind a little cheap humour, even my boy-servant is in love with a film-star. And if you look dispassionately at your own enchantment you would notice no vital difference between the two. You know all the clichés about being actually in love with one's favourite image, don't you? And though I would like to bring something new to every established notion, I find my honesty double-crossing my intellect here. We artists must be basically truthful. You look within yourself and see whether you are not creating enjoyable sensations to feed your avid heart, for you must be avid for experience, for life, for love; and life, I tell

you as the experienced elder, is your privilege. You are half in love, you imagine yourself fully immerged, you suffer, you spend sleepless nights, and when you think the great moment is nearing, you discover that you have not been sufficiently honest to your feelings. This is pathetic, but not laughable. One never laughs at genuine suffering, whatever its origin. You suffer because you are hungry for life, you are insomnic because you suffer.

"I see I flatter you, and that is as it should be. I remember the days when I was your age and was passing through a time as intense as I hope yours is now. And from my experience I was waiting for you to tell me that you are insomnic and have taken an intense liking to Baudelaire and Thomas Mann. Do I amuse you? Ah, I see you can appreciate a joke about yourself. Not many people can. I have high hopes of you.

"You said you were disturbed about yourself. I quite see the reason. You are not certain of your own feelings, you do not know whether your suffering, your sleeplessness is the genuine article (pardon a vulgarism) or just a product of a too active imagination. I should say it is, but not entirely. Your imagination requires a base, and your love, which is yet only half-formed, has provided the base on which you build your superstructure of suffering.

"Now let me assure you that this is not at all immoral. At your age morality is a thing of the instinct, and you are morally disturbed when you realise that your actions are not conforming to your real emotions. I would not go into the validity of such a moral code, but I dare say you are basically an honest man, and an honest artist, for an artist must grasp a truth emotionally. No, you needn't protest, my boy. It is quite obvious that you are preparing for an artist's career, although I would not hazard to guess what you actually write. And after all, a man can have the mind and the morality of an artist without actually writing or painting. Being an artist is basically having a particular state of mind, a particular view of things, being able to observe and dissect mercilessly, even oneself, even one's love.

"I see I am digressng. You are not bored with my harangue, are you? Well, I believe that I understand many things that happen in man—that's my vocation, you know—but I can never determine at what point I begin boring my audience. It is miserable, specially with people who are clever at concealing these petty feelings. No, no, my friend, you needn't voice your protest. I see you are interested; what I say must concern you vitally.

"Well, our intention was to discuss the morality of being insomnic. (Sounds catchy, doesn't it?) Sleep, you know, is something animal, and it comes to us naturally, we need it, because we *are* animal. And look at love from the point of view of the animal in man. I don't mean any disparagement of the body, and certainly I do not suggest the sort of image of man which Zola had popularised. I point only to an aspect of love which ties up with man's status as an animal. Of course I don't want to

shock you with saying that what you feel towards your girl is essentially a biological urge; but the fact that love, at least some of its ardour, is often dependent upon age (which is a thing of the body) does prove that a good part of the feeling is physiological. Hence, it stands to reason—doesn't it? —that love should not interfere with your sleep, it must be as normal as any other bodily need and its satisfaction. Why should you then spend half your night in tortured waking, why should nature disturb her own workings? Because it is not entirely nature, because there is in your love that element which defies your inherent animality. You love, or better, you are disturbed because you don't love sufficiently—and it is a feeling which your sensitivity, your intellect, your emotion and your imagination have slowly created for you. The real man is never satisfied with his ability to accept life at its fullest and most intense; satisfaction is animal, physical, vulgar, and with your discontent, your melancholy, you enter the company of the divine. The loss of sleep and satisfaction is actually the triumph of the spirit over nature. Rejoice, man, rejoice, for you are a privileged soul, one of God's elect. Only," here my friend suddenly turned to face me and said in an agitated, warning tone, "only if you want to be happy and to live in peace, love like a raving idiot, love like a child, and forget all I have said."

This talk took place about fifteen years ago, and it is only now that I realise in my heart what my mentor meant. He is an old man now, living a retired life in the countryside. As an occasional visitor, I am in a position to know that the wild rumours about his perversity have their basis in truth. Yet he is an honourable man, quite lovable and still devilishly intelligent. The way of the spirit and the intellect, I realise now, is but man's solitary effort to create a new life, to taste of an intensity which nature denies him. Only one realises that happiness does not come through intensity; happiness is harmony, and the intellect can only crave after what the body instinctively creates. Although I would not change my place for any other's —I have now come to believe that I was made for it—still sometimes there comes a yearning to know whether I have been honest with my first love, whether the new life I craved was not a delusion, whether I have not lost a happiness that could have been mine. For I am now close on thirty-five and the long, insomnic nights are rather lonely.

On "The Ode to a Nightingale"

MEENAKSHI MITRA
Fifth Year, English

"It's this modern intellectual stuff that's working havoc with my company," said the producer. "Two years ago, a chap came to me with some stupid story in which the twiddling of a dog's ear is Man's mind! Faugh! I rejected it. And look at the Amalgamated Kinematic people. They made a film out of it which is selling like hot cakes. So I told my assistant to bring some stuff like that and make a list. Well, I've finished off the first one. It's with the Censor people now."

"Er, the story..." I began, but a snort stopped me.

"It's not a story, it's a poem. My assistant copied it out from some school book; said it was recommended by some University fellow. I never had a more rotten scenario to work on. No story, no, nothing, but I put it together and put some pep into it."

"But, do you think...?"

"No, I don't. And neither did the author. He starts off with a fellow, and this fellow (not the author), has a grouch about something, and there's the bird singing songs. How the bird comes in, I don't know —quite unnecessary. And then the fellow gets yearning about wine and harvest fields."

"My heart aches and a drowsy numbness—" I quoted in distressed apprehension.

"That's right," interrupted the Producer. "Fancy you knowing it! Well, it's a rotten piece of work and I wanted the author to put in some details in the script. But I heard that the fellow, the chap who wrote it, that is, died some while ago. ANY one would, after writing such stuff."

I fidgeted and scratched my ear.

He looked at me reproachfully. "Think I couldn't make anything of it? It's first class stuff NOW, and now I'll be able to buy my wife her twenty-fifth rope of pearls.

"But how did you show the...?"

"Well, I did and much more too," he sucked reflectively at his cigar. "I started off with a picnic. The fellow and the girl sitting under a tree listening to a transistor set—it's in the poem." He dived into a drawer and brought out a much-scribbled script and read:

"In some melodious plot...

(Music for 3½ minutes.)"

"But why a girl?" I asked, scandalised.

In an uncle-reprimanding-nephew manner he explained, "You have to have psychological insights or helicopter stunts, and where do you think I could have put in stunts?"

A couple of asterisks shot off my brain.

"Well," continued the Producer, "then I got in a close-up of the bird on the tree. The men filled up their glasses and their was a flash-back of the vintage scene. I got in a fabulous scene there with Guido and his Gimlets doing the Greek rock'n'roll. Then back to the picnic scene and the man and girl going for a stroll. 'And with thee fade away into the forest dim' ", he read. "Then I got in a good scene in 'Not charioted by Bacchus and his pards'. I thought 'pards' meant 'friends', you know. But my assistant said it meant leopards in Latin, and THAT after I'd finished filming it. Well, I let it stand—it's a grand Chariot race (*Ben-Hur,* you know,) but I also put in a close-up of a tiger. Then there is a good song the girl sings in a garden. Close-ups with 'white hawthorn and violets' etc. Then off to Ruth standing by, now where is it, ah, "magic casements" and the man comes and rescues her. I featured Nona Nonce as Ruth—good box office hit. Close-up of Nona crying, with her face buried in the soft fur of a persian cat."

"Then I finished up with the reunited couple singing a song and the bird on the branch doing the soprano portion. It's poor, thin stuff, but no one can say I didn't do my best."

"What about 'Thou wast not born for death, immortal bird!", I asked, after some deep thought on my part.

The producer blinked at me. It was hot day. "Oh, that," he murmured, "it was kind of dragged in and would not print well in Super Color. So I threw it out. You have got to cut down in some places and expand in others. Can you give me an idea for the title? 'Ode to a Nightingle' would look silly on a poster. Weak, not enough pull on the public; you want something stronger."

"The next film is 'The Charge of the Light Brigade'. I have not read it as yet, but I am keeping Nona for the female lead."

"I should very much like to know what you do with it," I said, trying my best to keep the quaver out of my voice.

He lit another cigar. "You bet," he said, "I can make a story out of a plate of sandwiches. Yes, sir!"

* * * * *

The film about the picnic has been passed by the Censors and is now coming to town under the attractive title of 'MY HEART ACHES'. The poster shows a close-up of Miss Nonce and the persian cat. You should not miss it for anything.

A Mere Interlude ?

INDU ROY
Sixth Year, English

The clouds that had been darkening the sky-line all day finally gave way—and the rain came down that night on a tired city about to seek the oblivion of the night. The faint corner street light glimmered through the downpour, adding a touch of vitality to the oncoming gloom. The water splattered off the roofs and ran down the roadside, dragging with it all the accumulated filth of the street, and depositing it in a choking heap at the sewer-mouth.

Malti put the last few dung-cakes into the basket, covered it with gunny-sack and pushed it back as far as possible into the corner of the leaking shed, hoping that it would not get too wet. From the adjoining room she could hear the sharply-raised voice of her sister-in-law, "... abroad about at night; cannot stay in for a minute. Whose attention does she wish to draw now! Nice daughter-in-law you have! Do you know what Rampyari was saying....." The voice sank to a conspiratorial whisper, and Malti flushed with anger. Shanti took a malicious pleasure in disparaging her, and was ever instigating trouble for her.

A child's cry tore through the settled calm of the night, jolting Malti back to the present from her apathetic reverie. Wrapping her sari-pallav tightly over her bare shoulders she hurried across the narrow lane to her room in the derelict building facing her mother-in-law's shack. The wind and rain stung her—the invidious cold bit through her feet and then seemed to travel up her spine... she shivered. She entered the darkened room and saw her five-year-old Pathak trying to soothe his baby-sister. Soothe! Could love and sweet words soothe a child's hunger? Could mere hope fulfil the gnawing pain deep down inside? She picked up the child and cuddled it; .... she looked in the cup; even the flour that she used to mix with water to serve as a substitute for milk had finished. She took some water and fed it to the baby .... yet after a few minutes the little mite began to whimper. She let her suckle her breast, even if there was no nourishment. At least the child quietened down. Pathak huddled against his mother to extract as much warmth as was possible, in a vain attempt to keep warm. And as Malti sat there in the dark with her two children, an utterable weariness slowly crept up her whole body, giving her the queer feeling of being bodiless.

.... I dreant of him last night again. He stood there; very dim it was. He beckoned to me ... or didn't he? Even then they say it bodes ill to

dream of the dead. But that was so long ago. I was so young then; well, there is Pathak. Very like his father. And this little thing? Wonder if she will live! Misery! To bring them into this world: and for what?

Yes, for what? That afternoon's scene came vividly back to her mind, and with it she felt her bruises again. Her mother-in-law and Shanti shaking their fists in her face; Pathak crying pitiably, clutching her sari. It had started like the other quarrels—with her husband. He was being berated for being a useless, base, unscrupulous creature; not caring for his family, not working, but caging on his old parents. What did he think them to be? Gold mines? From this day he could do what he pleased. He was not getting anything out of them any more. And then they had turned upon her. "You could sell your silver bangles instead of hiding them; what are you saving them for?" The bangles! Her husband had sold them long ago; so long, that she would have forgotten had she not been constantly reminded this way. "Or you can go and steal some more food.... Steal or beg—go on—become a beggar, ask the neighbours. God help me! Such a daughter-in-law! No wonder her people wanted to be rid of her ...." And the usual lamentation went on.

Chandan, her husband's son by the first wife, was standing by Shanti, sucking a banana. Pathak was running around in circles, when he suddenly bumped against Chandan and the banana went spinning down the dirt. Chandan screamed and hit out at Pathak. Shanti had seen what happened, but she grabbed Pathak and started thrashing him with unmentionable epithets accompanying each blow. Malti had gone forward to ward off the blows when her mother-in-law pushed her off. "Like mother, like son, both thieves. Imagine stealing from his own brother. You wait ... I'll teach you ..." Malti protested, for the first time, "but it was an accident. Pathak lost his balance; he did not mean to bump against Chandan." "What! dare you call me a liar! Me? your mother-in-law? Did I not see it with my own eyes? Did not all these people see it?" For by now many of the neighbours were looking out.....

The baby started crying again, and Malti began rocking her in her arms, and held her close to herself. What had followed had left its marks. Her husband had been told of how she had dared to talk back to her mother-in-law, and he, in a righteous temper had beaten her—till even Shanti and her mother had come in to intervene; to ease their conscience?

Yet, this was nothing new. As long as she could remember it had been like this. Widowed at an young age, she had been sent back to her parents .... from where she thought she was lucky to escape when they had given her in marriage for the second time. And now? How could she escape from here? They had tried to send her back to her parents. Some of her villagers had come to try to settle the dispute, but who could spend the money to send her back; so they had quarrelled some more, and here she was.

Tears rolled down her cheeks at these thoughts. Her heart filled with dismay, she clutched the baby tightly to her. She could not see things improving in the future. She could feel herself being inexorably choked to death by the dark and heavy future. She could do nothing to ease or stop it.

The quiet of the night was again broken by the noise of somebody stumbling and cursing outside, and then the tattered cloth that served for a covering was roughly thrown aside to reveal the coarse, drunken face of her husband. He stalked in, and then stood swaying, trying to peer into the dark. She quickly placed the exhausted children on the cot and got up, withdrawing into the shelter of the dark. Ramanand staggered forward, and stretched out his hands.

"Give it to me. Hurry up", he growled.

"Give what?" she whispered, apprehensively.

"What? You won't give it?" he roared, stepping forward and raising his hand. She instinctively put up her hand and retreated still further till she was brought up against the walls.

"Ha," he laughed derisively. "Who will save you now? Where will you run?" He reached out and clutched her sari and gave it a tug. The already tattered cloth was rent still more and it came off. He let out a profane laugh and then trying to get nearer he tripped over her sari and fell heavily against the wall. He cursed and yelled and lunged at her, "Give me the bangles immediately. I want them".

"You have already sold them. Don't you remember?"

"You liar, you have hidden them"; he hit out at her and continued to hit and kick, till she lost consciousness, and did not feel the blows any more.....

Malti raised herself from the floor. She was cold and stiff and soon her body began to ache and throb. She found clotted blood caked on her face and shoulders. She picked up what was left of her sari and wrapped it around her. The faint, ghostly light of early dawn filtered in through the door, and she could see the children cuddled up together. The night had passed, but nothing else had.

Malti's throat constricted; she wanted to scream. She wanted to lodge a protest. But to whom? Who could hear her? Who would hear her? God? Where was he? What had she been born for? To suffer, and suffer more and more? She gazed dully at nothing and swayed slightly to and fro. Suddenly her gaze intensified. There he was again. There in the corner. He was beckoning; very gently calling her on. No one had called her before. No one had wanted her before. She had always been thrown about and had been unwanted. This was the only time that any one had called her in such a manner. Was it not better to answer that call—even if it proved to be an illusion? Would it not be far better than sticking to this 'reality'?

Malti stood stunned. Then she moved convulsively and started acting very hastily, as if there was no time to lose. She quickly picked up the two children and put them in the passage; then she hurried to the shed and brought back the bottle of kerosene oil and shut the crooked, old door. She shut herself in.....

Shanti heard the child cry. Let it. The mother cannot even take care of the children. Then she heard Pathak's voice raised in a frightened quaver —"Mami, open." Shanti opened the door and pushed the child away and told him to go back to his mother. But the child only stood there, mutely pointing towards the adjoining shack. Then she saw the smoke and the fleeting glimpse of tongues of flames. She ran forward and shouted to her mother to wake up and come and see what her daughter-in-law has done.....

After the body had been taken away, they started talking. "Why should she have done a thing like that? She was healthy and it was'nt that she was unhappy, after all."

"Yes! There was no call for her to have acted thus. I hope she will rest peacefully now. She was so quiet and peaceful and we treated her quite normally. No one can blame us for her end".....

Already they had started forgetting her. Her life was no more than an interlude, and it was being treated as one. Who remembers a mere interlude?

"A Fool Looks at Relativity"

KALYAN MUKHERJEA
Fourth Year, Physics

I ask my readers not to be scared away by the word "relativity". Relativity is a concept understood to a greater or lesser extent by all modern scientists but over which there exist many misconceptions ("superstition" would be a stronger and more appropriate word) among the so-called laymen. Being a layman myself, and a very foolish one at that, (this is evident since I dare to write an essay on relativity) I tried to rid myself of superstition and found to my surprise that the ideas involved in the theory of relativity are not so mysterious provided of course you do not try to understand the mathematics involved. All that I have tried to do in what follows, is to present the basic ideas of the theory for fellow laymen who for some reason or the other never tried to acquire any knowledge regarding this wonderful triumph of the human intellect.

Dr. Einstein, according to Dale Carnegie, once said that the fundamental idea of relativity may be imagined from the familiar fact that when one sits on a hot stove the minutes seem to drag like hours but when one sits with a beautiful girl, the hours flash by like minutes! So readers of Mr. Carnegie's works came to have the idea that the theory of relativity deals with the velocity with which time flows according as whether one sits near a hot stove or a hot "something else"! Generalising on this principle and riding one's own imagination, the layman concludes that the theory of relativity (as the name suggests) makes everything relative to something else and dispels with the notion of the "absolute". But, in fact, the theory of relativity seeks to do the very opposite! It seeks to find out those laws of the universe which have an absolute significance, retain them, and reject all the rest.

But hold the line a minute—please! Let's go back a little and study for ourselves the background of Einstein's theory. In the 19th century, it had been definitely established that light was a kind of wave. But as you know, all waves—whether they are the tumultuous waves of the seas or the beautiful waves of someone's soft, brown hair—must be waves of something or in other words, for a wave to exist, there must be a "medium" (the medium in the above instances are water and hair respectively). But then the question arose as to how light reaches us from the sun and stars since there are millions and millions of miles of vacuum—an utter void—between the earth and the heavenly bodies. The 19th century physicists solved this by postulating the existence of an all-pervading and undetectable medium

—the ether—whose undulations we perceived as light. This satisfied everyone and there the matter rested.

Trouble arose, however, in 1881, when an American scientist named Michelson (with his colleague, Morley) got the bright idea of measuring the velocity of the earth relative to the ether, which was supposed to be stationary. He argued that since light waves were undulations of the ether, their velocity, as observed in an experiment, should be affected by the relative motion of the earth with respect to the ether. The effect, he realised, was small, but he devised an instrument sufficiently accurate to measure even 1/10 of the value of the predicted effect. But when the experiment was performed, Michelson found to his surprise that the earth was stationary with respect to the ether! A great controversy arose! Some held that there was no ether, others were even prepared to believe that the earth was stationary, rather than dispel with the concept of the ether. Then two scientists of good repute (and even better ingenuity) suggested a startling explanation. They held that due to the motion of the earth, certain portions of Michelson's instrument contracted thus hiding the effect of earth's relative motion! They even extended this by asserting that the dimensions of all bodies at rest contracted when they moved with a finite velocity. This idea, first suggested by Fitzgerald, was not taken very seriously until Lorentz proved theoretically, that this contraction actually occurs in an electron—one of the fundamental particles of which all matter is constituted. After some debate, the Fitzgerald-Lorentz contraction hypothesis was accepted as the "official" explanation of the Michelson-Morley experiment. But everyone realised that the position was rather difficult and unhappy.

The difficulties were cleared up by Einstein's special or restricted theory of relativity. He argued that the fundamental laws of the universe must be the same for all observers, provided of course one accounted for their different positions and states of motion. The problem which confronted physicists was how to account for the motion of observers.

If A is walking at 3 mph. and B walks past him at 4 mph. then A thinks that B is travelling at 1 mph. or that the relative velocity of B with respect to A is 1 mph. The simple case illustrates the classical or Galilean law of transformation of velocities. Yet this law seemed to be incorrect.

It had been shown as a deduction from the result of the Michelson-Morley experiment that the velocity of light is constant for all observers. This could not be so if the Galilean law of transformation was correct. So Einstein assumed as his first postulate, that the velocity of light is constant for all observers. He then sought a transformation law which would satisfy this condition. When he deduced this transformation, he found to his amazement that mass, length, time—hitherto referred to as absolute constants—were in fact dependent on the velocity with which a body or an observer moved. The Fitzgerald contraction was shown to be a property of

all bodies and the theory gave a simple explanation of this effect. According to this theory space around a moving body contracts (this is a property of space itself) and hence the body itself appears to contract. It should be appreciated, however, that the Fitzgerald contraction cannot be measured since the measuring device used also moves with the body we desire to measure and contracts to the same extent as the latter body. Its existence, however, can be deduced from the observations and results of various experiments—the Michelson-Morley experiment being a special case.

Einstein's theory showed also that mass depends on velocity and that mass and energy are inter-convertible. Thus all matter contained by virtue of its mass a tremendous amount of energy and this is the fundamental idea behind nuclear weapons. Lastly, the restricted theory showed, the faster one moves the slower time seems to flow. If one moves with the velocity of light time would cease to flow and for speeds exceeding the velocity of light time flows backwards—

"There was a young lady—Miss Bright,
Who could travel much faster than light;
She departed one day—
In an Einsteinian way
And returned on the previous night!"

But unfortunately (for ageing beauties, especially) the theory of relativity rules out the possibility of attaining velocities greater than light.

In his general theory, which is too abstruse to be discussed in detail, Einstein held that "space" and "time" were not separate entities but that our universe exists in a "space-time continuum"—the so-called four-dimensional universe. In this paper he rejected Newton's law of gravitation (he formulated his own and more correct law) and held as illusion, the time-honoured idea of "force". He held that force was an illusion arising out of a misinterpretation of the distortions of space (or rather space-time) due to moving bodies. Such distortions were shown to be an inherent property of space-time.

Though these ideas may seem crazy to the uninitiated they have explained all known phenomena and predicted results which have been verified by experiment. So it seems that Einstein's theory is, at least in our present state of knowledge, unchallengeable.

Rabindranath Tagore : Explorations

SAMIR BANDYOPADHYAYA
Ex-Student

A Point of View

Great men have always had their detractors. But while Shakespeare has had a Tolstoi for a detractor, Dante a Nietzsche, and Shelley a T. S. Eliot, Tagore has had a host of immature charlatans and funny old men. The Centenary year has seen the antics of some of these denigrators.—pseudo-intellectuals, too clever to be wise, though brilliant at inventing the most fatuous theories. (Mr. Nirad C. Chaudhury would prefer to call them "just ill-bred and ignorant".) Yet he dominates our thought, our culture—in a way no one else has ever done.

Born in 1861, Tagore saw in his early teens the ignominious lingering death of our Renaissance. The second and third quarters of the nineteenth century were years of glory in Bengal. Those years saw the only genuine and living cultural movement we have had so far. It would be wrong to compare it with the Elizabethan Renaissance. It would be unfair to place the first real impact of the West on a country labouring under colonial rule and the valiant efforts of a noble watch-maker, a young Eurasian poet, and their young Indian friends beside the impact of the Classical Revival, the Reformation, the Discoveries, and the upsurge that followed. Yet the changes and reforms that these brave few initiated remain a part of our life and culture, and no insignificnat part at that. Despite its Western inspiration, complexion and spirit, our nineteenth-century culture was not servilely imitative of the West. What it took from the West it adapted, acclimatized, and finally assimilated. The finest thing about the illuminati of this age was their social conscience. Their moral integrity was only a part of this social conscience.

It was colourful age. Young men, forced to enter a temple, would recite Homer before the image of the goddess. Rammohan Roy, returning from the *upasana mandir* in his own post-chaise, would ask the coachman to drive on, as stones bruised his face and mud stained his clothes. Both Ramgopal Ghose and Maharshi Debendranath refused to cheat their creditors. Rasik Krishna Mallik refused to take his oath on the traditional *tama-tulsi-gangajal,* and declared, "I do not believe in the sacredness of the Ganges". Not one of them would ever go against his principles. Even Raja Radhakanta Deb, the arch conservative of the age, was different. In his opposition to the Young Bengal, he was sincere and serious. He

was no out and out reactionary. In fact, he was one of the sponsors of the Hindu College and one of the greatest advocates of women's education in this country.

As Keshabchandra Sen posed as a prophet and was carried away in his mysticism, the younger generation protested. The break came in 1877, when Keshabchandra allowed his own minor daughter to marry the Raja of Cooch Behar under the old rites defying the new marriage conventions growing up within the church at his own instance. Keshabchandra's apostasy was a reflection of the decay that had already set in. As Keshabchandra with his followers leaned more heavily towards emotionalism, Ramkrishna's occultism marked the road back to darkness, to unreason, and to ignorance.

Rabindranath matured under the shadow of the decadence. The sensuality of *Kadi o Komal* was a surrender to these times. But then it is a long uphill rise. He captured the finer values of the Renaissance, dead by then, in his *Gora,* and in his later poems. In fact, the direction of the novel *Gora* is towards an illumination, a reawakening, renaissance. And thus Rabindranath is certainly the supreme literary product of the modern Indian culture based on the synthesis of the East and West, and he stands as a symbol of that synthesis. He felt the urgency of his times, and threw himself into action. He refused to accept the isolation of the so-called 'poet's life', and gave himself up to the world.

Re-interpreting the Christian myth ?

Can it be suggested that Tagore was re-interpreting the Christ myth in *The Child* or the *Shishu Tirtha* ?

The story behind its composition is well known. In 1930 Tagore attended the famous Passion Play at Oberammergau, a village in Bavaria. This play which portrays the suffering of Christ is performed by the villagers once in every ten years in fulfilment of a vow. Tagore was greatly impressed by this play, and when he was asked by a German film company for a script dealing with Indian life he composed this poem in one night in Berlin. Round about the same time, Rabindranath had shown his interest in the story of the Christ and his teachings, in a number of poems like *Manabaputra, Tirthajatri* (a rendering of Eliot's *Journey of the Magi*), *Badodin, Pujalayer Antarey o Bahirey,* in his letters and in his annual Christmas lectures at Shantiniketan.

A deliverer, sent down from the heavens to show mankind the way to salvation, suffers and dies, and the salvation of mankind rests on a recognition and understanding of the value of that suffering and that defect. This is the Christian myth. And, naturally, the Cross, which is a symbol of torture and suffering, is the favourite symbol of the Christian religion

—O crux! Ave unica spera. In Indian mythology, the deliverer has never had to endure such unrelieved suffering. In our mythology, the deliverers triumph over their enemies. All the ten avataras kill their enemies. But Jesus is killed. "We have accepted only the *rasaleela* of Love, we do not see its tragedy" (*Pather Sanchay*).

The light that surrounds the Christ's life on earth throws into relief the world of sin lying around him. To understand the nature of sin, you have to see it through the eyes of Jesus Christ. "The cruelties, the narrowness, and the sins of the people around him are elements in his character: as the lotus adds a significance to the marshes in which it grows, so Jesus has shown the evils of existence in their true significance" (*Shantiniketan*). Jesus and the Man of faith share the same failures, the same sufferings, and a similar death.

The first section of *The Child* builds up the vision of a *manvantar* (lit. a change of times). The prophecies of Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel re-live in this picture of doom. Isaiah had heard, "The noise of a multitude in the mountains,/Like as of a great people!/The noise of a tumult/Of the kingdoms of the nations gathered together!" Tagore, in his *Shishu Tirtha,* hears: "A sudden shattering din! Is it the crumbling of caves at the rush of a torrent? Is it the groaning of a forest in flames? Through that terrific clamour flows an undertone, as lava through a volcano's ravings, and voices of hate and jealousy, come to mingle in the evil stream". A still closer parallel from Isaiah would be the Doom Song, "Ah, the uproar of many peoples,/Which roar like the rearing of the seas;/And the rushing of nations,/That rush like the rushing of mighty waters!"

Isaiah prophesies, "The earth shall stagger like a drunken man, and shall be moved to and fro like a hut". And Tagore notices, "Things are deliriously wild,/they are a noise whose grammar is a groan,/and words smothered out of shape and sense" (*The Child*). Isaiah addresses "the women that are at ease": "Rise up, ye women that are at ease, and hear my voice; ye careless daughters, give ear unto my speech. For days beyond a year shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the ingathering shall not come. Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins". Tagore, in his turn, shows the woman at ease: "But another woman, naked and shameless, sways with laughter and cries, Nothing in the world matters even a little bit" (*Shishu Tirtha*).

Tagore describes the desolation as "the broken turrets of irresponsible power; bridges of a lost river: ruins of a snake-infested shrine" (*Shishu Tirtha*). Ezekiel lays similar charges against "the bloody city": "And the word of the Lord came unto me, saying: Son of man, say unto her, Thou art a land that is not cleansed, nor rained upon in the day of

indignation.....Her princes in the midst thereof are like wolves ravening the prey; to shed blood, and to destroy souls, that they may get dishonest gain. And her prophets have daubed for them with untempered mortar, seeing vanity, and divining lies unto them, saying, Thus saith the Lord God, where the Lord hath not spoken. The people of the land have used oppression, and exercised robbery; yea, they have vexed the poor and needy, and have oppressed the stranger wrongfully". Thus "irresponsible power" or "prodigal pride" is the sin that brings the doom down upon the city. It is "the pride of your power", says Ezekiel.

Jeremiah speaks of "the mourning women", and Tagore hears: "The women weep and wail, they cry that their children are lost in a wilderness/of contrary paths with confusion at the end" Jeremiah's "mourning women" weep, "For death is come up into our windows,/It is entered into our palaces;/To cut off the children from without,/And the young men from the streets".

In the second section of *The Child,* "There on the crest of the hill/stands the Man of faith amid the snow-white silence, He scans the sky for some signal of light". In the Gospel of St. Luke, "And it came to pass about eight days after these sayings, he took with him Peter and John and James, and went up into the mountain to pray. And as he was praying, the fashion of his countenance was altered, and his raiment became white and dazzling." In *The Child,* "When the clouds thicken and the nightbirds/scream as they fly,/he cries, Brothers, despair not, for Man is great". In *Luke,* the Voice comes when the clouds thicken: "And while he said these things, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud. And a voice came out of the cloud, saying, This is my Son, my chosen: hear ye him".

The mad mob in *The Child* argue "that men are ever condemned to fight for phantoms/in an interminable desert of mutual menace" ("Man will battle for ever to annex to his domain—even that which is but a mirage", *Shishu Tirtha*). James tells the twelve tribes: "Whence come wars and whence come fightings among you? come they not hence, even of your pleasures that war in your members? Ye lust, and have not: ye kill, and covet, and cannot obtain: ye fight and war; ye have not, because ye ask not. Ye ask, and receive not, because ye ask amiss..." (*James* 4).

In the sixth section of *The Child,* when the Man of faith is killed, "They cannot see his face, but fall upon him in a fury of destruction". Before his last trial, "the men that held Jesus mocked him, and beat him. And they blindfolded him". In the *Shishu Tirtha,* "Then a man rises and strikes the leader. Others rise to strike him. His face cannot be seen in the dark." In *Matthew,* "They answered and said, He is worthy of death. Then did they spit in his face and buffet him: and some smote him with the palms of their hands".

In his resurrection, Jesus tells his disciples, "Thus it is written that the Christ should suffer, and rise again from the dead the third day and that repentance and remission of sins should be preached in his name unto all the nations". It is thus the Victim that shows the way to salvation. It is the sense of sin committed that brings the people back to the Christ. In The Child, "A few try to slink away unnoticed,/but their crime keeps them chained to their victim./They ask each other in bewilderment,/Who will show us the path?/The old man from the East bends his head and says:/The Victim".

The Christ and the Man of faith share a habit in common. "How far yet? they ask angrily. The devotee only sings a hymn and does not answer." Jesus speaks in parables. The Christ tells his disciples, "Lo, I am with you alway, even unto the end of the world". The Man of faith tells his followers, "I am by your side".

In *The Child* or *The Shishu Tirtha,* it is the old man from the East, who follows the sign of the Star, and leads the people on to the birthplace of the Child. "Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, Wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? for we saw his star in the east, and are come to worship him" (*Matthew* 2).

Yet *The Child* or *The Shishu Tirtha* is not the Bible story retold. The Child symbolizes the finest values of the human situation; it symbolizes Good Sense. It is Good Sense that suffers, when men build up a new economics with self-interest for its basic principle. It is these men that kill Good Sense. And yet like a Phoenix, Good Sense emerges again. "He is Eternal, He is Newly-Born".

The greatness of Man is realized in "the current of daily life", far away from "the King's castle, the mine of gold, the secret book of magic" (standing for the power of the State, the power of money, and a distorted religion). The new social conscience thus enters into the scheme of the Bible story.

The spirit of the *Kumarasambhab,* the *Buddhajataka,* and the *Vishnupurana* lies behind the conception of the significant Birth. "From the very beginnings, mankind has been moving towards the *tirtha* of a New Birth. Buddha had once appeared as a child, had brought something New into being. Man keeps on looking at the Child" (*Shishu Tirtha*: the play). Some time later Tagore would translate T. S. Eliot: "This Birth was/Hard and bitter agony for us, like Death, our Death". The birth of the Child is a birth beyond death, a birth out of suffering.

The conception of a death as a guiding star to fulfilment seems to be an idea that Tagore borrowed from the Bible story. But as a whole *The Child* remains his original work, and may be at best called a re-interpretation of the Christ myth.

"What a shape you have!"

In the story *Shey*(He), the hero comes to meet the poet, and the poet feels, "I could see something has come into the room. But I couldn't see who it was, what it was, what species it was. My heart was beating fast, and yet I roared aloud, 'Who are you? Shall I call the police?'

"The strange thing spoke out in a voice, which strangely seemed as if coming out of a clay bowl, 'Can't you recognize me, my big brother? I am the *Shey* you have created for Pupeydidi. I had an invitation here'.

"I said, 'You speak nonsense. What a shape you have!'

"He said, 'I have lost the shape I had.'"

Shey was written in 1937. And Tagore had already fallen in love with "the beloved of his old age"—Painting. Strange shapes are very common in his drawings and paintings. There are distortions of prehistoric animals, monstrosities made of limbs: "I have searched out the cave of the primitive in my mind with its etchings of animals" (*Chitralipi* I). There are masks and distortions of the human face. And there are strange animals in the action of crying out (Tagore explains at least one of these crying animals: "Life chained to an imperfect mind sends its agonised cry", *Chitralipi* I). This large crowd of grotesque shapes seems to suggest that some great upheaval must have sent the world into a chaos, and the men are broken into pieces, life thrown into an uncertainty.

The world itself seems to have lost its shape: and so has life. Tagore in his poems of the time conjures up a host of mythical grotesques, the *nagini,* the *hadgila,* and other strange shapes, all symbolizing the forces of destruction roaming over the world. In his later paintings, he makes for himself a new colour—a red, which gives you the sense of both blood and fire. In one of these paintings, a black girl throws out her hands in supplication, as if crying for a release from the strange red that envelops her (Plate 29, the Centenary album). In Plate 14, a cruel face brings out the significance of that red. In Plate 29, a host of monstrous shapes placed in that cruel red, heightens its cruelty.

Tagore seems to capture in his grotesques, his strange red tints, and in his crying animals, an image of the world he saw in his last days. In *Kalantar* (1933), he wrote: "Civilization appears today to be shedding the responsibility of proving its gentility. Inhuman cruelty boasts publicly of its might...The Europe which had at one time dubbed Turkey as barbaric, becomes itself the unashamed venue of fascism's unscrupulous diabolism". In 1936 he issued a statement on the Spanish Civil War:

[1] The translations from *Shishu Tirtha* are from Bhabani Bhattacharya's rendering. For *The Child,* the text followed is that given in *Rabindranath Tagore in Germany* (Max Mueller Bhavan, 1961). The translation of an extract from *Kalantar* is by Hiren Mukherjee. The other translations are by the present writer himself. The single quotation from *Shishu Tirtha* (the play) is a translation from the text given in Shantideva Ghose's *Rabindra-Sangeet.*

"In this hour of supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscience of humanity, help the people's front in Spain, help the government of the people, cry in a million of voices, 'halt to reaction'. Come in your millions to the aid of democracy, to the success of civilization and culture".

The world Tagore saw was a world in which Fascism was raising its ugly head, and the beast in man was being granted a new lease of life. There was a crisis in civilization. And the barbaric beast becomes for Tagore a symbol, in the same way as the minotaur becomes for Picasso a symbol of war and destruction (One can trace the development of the minotaur image from the *Minotaurus and the lady* of the early thirties to the War and Peace series of the fifties, and see the wonderful use Picasso makes of the image in his famous *Guernica,* 1937). The shapeless shapes also seem to express the sense of frustration and helplessness in the face of Power. Power itself is a monstrosity which can neither be grasped nor given a recognizable shape.

A Jest with Life

ANURANJAN SINGH
Second Year, Economics

I

Pannalal Girdhrilal sat there behind his highly polished desk in the building which Girdhrilal & Sons, import and export merchants, occupied, in the business area of Calcutta. It had been built recently to house the firm's growing establishment. It rose 18 stories high, two hundred and fifty feet of concrete and glass. On the eighteenth storey was the suite of the Managing Director. Lakshminarian Girdhrilal had died just before the completion of the new building, so, the only occupant that this suite had known was the son, Pannalal Girdhrilal, who now sat behind that imposing mahogany table.

Everything about this man was remarkable. He was tall and broad shouldered with a narrow waist and hips. His clothes were elegant yet comfortable, and the brown brogues which now rested on the table were of the most impeccable calf leather. He was about to turn thirty and he

looked neither younger nor older. The predominant feature in his face were his eyes. And these showed clearly his most obvious characteristic, his intelligence which, when canalized in its own field, business, crossed the border into the realm of genius. They also betrayed the coldness of his over-analytical mind.

This son of a wealthy merchant first showed his difference from others when, after finishing school, instead of joining the business and keeping three sets of books as most young men in his position might have done, he insisted that he be sent abroad for a college career. While in Cambridge he presented a paper on the relation and interaction between Philosophy and Mathematics which received a whole column of comment in the journal of the Royal Society. By the time he had taken his degree in Pure Mathematics he had also done examinations in Chartered Accountancy, Commercial Law, Business Management and Interior Decoration. When he came back home at 24 he found the business in rack and ruin owing to the advanced age of his father and the utter inefficiency of his brothers. The brothers were pensioned off, so to speak, and the business again flourished under Pannalal. Miraculously the figures from the debit side started moving over to the credit side of the books. The new Girdhrilal & Sons outstripped the old one by miles. The old one had been one of many flourishing business houses. The new one strode the business world like a colossus.

Sitting there behind his desk he looked lean and bronzed. He had just returned from his latest trip, a six weeks' journey into the Andes to find a certain tribe, apparantely extinct now. As the door at the other end swung open silently to admit another young man of about the same age, Pannalal swung his legs off the table and rose to meet him, hand outstretched in a single fluid movement that spoke of perfect co-ordination that somehow reminded one of a lynx. They clasped each other's hands in a hand shake that lesser men might not have been able to endure, slapping each other on the back.

"It's good to see you, Panna, me boy. Had a great time, eh?"

"Yes. I did. I'll tell you all about it. Sit down and light yourself a cigar. I got them at Havana."

There were a few moments of silence as each was intent on lighting his cigar. Each thought of their college days in Cambridge. They both came from the same college as could be seen from the ties they wore. Pannalal was a business magnate now. George Trancy was a Tea-Taster in one of the tea firms. As the first aromatic wisps rose, George spoke first.

"What makes you do things like this. First it was a safari in Africa. Then you disappeared and were found in a Tibetan Monastery. You threw a party and it is estimated that six hours of fun and frolic cost you a cool ten lakhs. Then you tried something diametrically opposite and spent a month in the slums. Now finally it is trying to locate some goddamned

tribe in the American Andes. Man, you must be mad. How else can one explain your behaviour." Pannalal sat there—silent. Slowly he took a pull on the cigar, his eyes on the ankle-deep carpeting and he exhaled the smoke unhurriedly. When he looked up his eyes held his friend's without hesitation or doubt. He spoke slowly, taking great care of what he said.

"George, the trouble is that our lives are so short and the part of the world that they embrace is so small that our experiences are extremely limited. To me experiences are what make a full life. New, varied, numerous experiences. A new experience is worth anything you have, because anything you have is already an old experience and it should be exchanged for a new experience. I spent 10 lakhs in an evening on that party of mine because that 10 lakhs which I had was already an old experience. I gave it away in exchange of a new experience. I was the gainer. Every time I do this sort of thing I feel as if I have succeeded in getting a bargain out of life. I wish that I could live the lives of a hundred men so that I could have all their experiences in life. No experience is too small for me or too big. I wish I were able to take in every human experience from the time this world started spinning. As it is, I must be content with what I myself can do or buy."

Here George broke in, in a high, agitated pitch of voice, "But damn it all, man, how long will you carry on like this?" Pannalal's eyes narrowed into slits and he spoke softly and slowly.

"Not much longer, George. Don't you worry about me. I feel my journey into the realm of experiences is coming to an end. There is only one more experience left for me to taste. Soon even that will be over."

The two men talked of various things and then George left. Pannalal sat upright in the chair with lacklustre eyes, gazing into the middle distance.

II

Ramu sat in a little room hardly ten feet by ten, which he shared with his old and widowed mother and three sisters in the bustee area behind Tangra. His mother put an enamel bowl, the only one they had, in front of him as he sat on the floor. In the bowl was some rice and two green chillies were stuck in the middle of the heap to add flavour to the soggy, boiled rice. Ramu looked at the rice and pushed the bowl away. "Mother," he said, "I am tired of eating this plain rice with only some green chillies as flavouring. Tomorrow I promise you we shall have vegetable and fish with it." Saying this he got up and walked out of the low door of the hut. His mother called out to him from the doorway, "When will you come back?" But Ramu did not answer. His mind was fixed on the work he had to do that night.

III

It was about nine o'clock, and the sun was already making itself felt. George Trancy was in his office, a modest little air-conditioned room where he wrote out his reports about the quality of the various teas. He was just blotting the ink of his last report when Pannalal opened the door and walked in. George Trancy rose to meet him with an exclamation of joy on his lips. But there was something so dangerous and compelling about the man who stood there before him that George remained transfixed in his chair half risen, and the words died on his lips, half born. Pannalal looked absolutely fatigued; his clothes had been thrown on in a hurry and were now rumpled. His whole demeanour was that of a man who has been under a terrible strain and can hardly bear it. But his eyes told another story. They were so bright, almost incandescent. He let his face repose itself into a half-mocking smile and spoke.

"Well, George, it is all over now. That last experience. I've had it. Now I am a complete man."

George dumbly nodded his head and Pannalal continued. "I had never seen human suffering. I knew I would never be satisfied unless I experienced the feeling of being the author of the most profound of all human suffering—death. When you came to see me yesterday, the stage had been set. My Secretary Ranganathan, faithful old codger, had contacted a certain small king of the underworld, you know, the kind that deals in burglaries and petty larceny, and told him what we wanted. Ranganathan was told that it could be done for five hundred rupees. But you know Ranganatham, he beat him down to three hundred and fifty. My requirements were very rigorous. It had to be some one young and innocent. The kind that you would never dream of hurting. It had to be an act of madness and complete horror to be consummated." George sat there in his chair head thrown back and eyes unseeing. Pannalal carried on with a deep flush on his face and voice choking with triumph.

"It was decided that it would be a clear case of shooting an armed burglar. I hear this morning that they had a hell of a time convincing the boy that he should carry a knife. Obviously the lad did not know much about these things. All he knew was that he was entering a house, which was emtpy, to pinch any knick-knacks that he could lay his hands on.

I sat in the arm-chair, you know, the one at the far end opposite the window, with the lights off. About two in the morning I saw the grey of the window silhouette a dark form. He walked softly to my bed and saw it empty; but this was in accordance with his knowledge that the house was empty. He turned round and was about to walk to the Dressing Table when I reached behind me and switched on the lights. He spun around and faced me. Oh! you should have seen the expression on his face. I

drank in every detail. This would have to last me a lifetime. I saw the fearful frenzy in his eyes. I saw the hollow gauntness of his cheeks. I saw his forehead pasty with cold sweats; his torn shirt flapping in the gentle breeze through the window. I will remember that moment every minute of my life. I reached into my dressing gown pocket and drew out the automatic. I had stripped and oiled it that evening. I think he knew then, because he reached into his shirt pocket at the side and whipped out his knife—more of a pen knife actually, and took one step towards me. Now this was my hour of culmination. I took in his eyes one last time I lowered the pistol square on his stomach and I squeezed, ever so gently, the trigger. The night was shattered with flame and noise. I can't explain to you how I felt when that slug tore through his frail body." George sat there in his chair, loathing in his eyes, the entire aspect of his face was twisted into a tortured expression of hate. Pannalal's eyes were fixed on the distance and he spoke as if in a trance. His voice said, "Don't think that I am a sadist. I am not. If I had been, so clean a way would not have satisfied me. I am an intellectual. This to me was an intellectual experience. I had to take a human life, an innocent human life, to see what such a responsibility can mean. I had to. Don't you see George, I had to. I simply had to."

George neither saw nor heard nor felt. A weary numbness began to overtake him and his eyes closed as his head fell back.

"The police came in an hour. As far as they are concerned it is an open and shut case of shooting an armed burglar in self-defence. I don't regret it. It was a great experience, though I would not go through it again. The emotional drain was terrific."

IV

A week after Ramu's body had been returned to her after the post-mortem, Ramu's mother found a plain envelop with three hundred-rupee notes and five ten-rupee notes in it pushed under the door of their hut. She held the notes to her breast and said with her eyes closed, "It must be some benefactor of ours who realises our condition at this time of great sorrow and bereavement." That evening Ramu's mother and three sisters ate vegetables and fish with rice.

"Alpha, Beta, Gamma, Delta . . . ."

SYED TANWEER MURSHED
Ex-student

Ten years in the history of human culture are nothing. And social, cultural and behaviour patterns can hardly be expected to change in that infinitesimal period of time. Which, as far as the present writer is concerned, is a hell of a nuisance. For, having addressed himself to the unenviable task of writing a thesis on the way the youth of 1961 utilizes its leisure hours, intending therein to institute a comparison with the modus operandi of the youth of 1951, he finds that there is hardly any scope for caparison, as Mrs. Malaprop would have said. And, carrying this chain of brilliant ratiocination to its logical extremes, if there is no scope for comparison|caparison, how the blankety-blank can the present writer write his thesis? Anyhow, as the bishop said to the actress, there's no harm trying. Bung ho, then, to hoss and away.

According to the 1961 census the consensus—which is not the same thing as census—of opinion among those who collectively constitute the Commission is that the people of India can be safely divided into two broad categories, male and female. And, that these males and females can be further divided into those who are dead and those who, unfortunately, are not. And further, that of those who are not dead, some are old and others who say that they are young. The conclusion to be drawn from the above analysis is that in the year 1961 we have young males and young females. Which, collectively, is youth. Strangely enough, that was the precise conclusion arrived at by the worthies in charge of the 1951 census. No material for a thesis so far. But to proceed.

It has been observed that the soi-disant youth of 1961 is susceptible of classification—in so far as its "leisure hour" activities are concerned—under several heads, to be referred to for the sake of brevity as Head Alpha, Head Beta, Head Gamma, Head Delta and so on.

Head Alpha consists of those youths who spend their leisure hours in erudite lucubrations which means (for those whose knowledge of English is not as extensive as that of the author) that they carry on at home the process started in the class-room, that is, they study. Silly, but there it is.

Head Beta comprises others who have this in common with their more zealously intellectual coevals that they too carry on in their spare time (the author refuses to use the expression "leisure hours") the process set into motion in the class-room, but here the similarity ends. For the process set into motion in the class-room by the latter is the singularly exhilarating one

of exchanging lurid pleasantries and the concerted performance of verbal analysis of matters of universal appeal, such as what Miss Humpty said to Miss Dumpty about Master Jack and Miss Jill, or the merits and demerits of Mr. Anthony Perkins the noted American film-star, or the aesthetic virtues of Mlle. B. Bardot who is alleged to have been created by God, a contention which is often debated, or the nature of the Marxian concept of dialectical materialism, and so forth.

Head Gamma, according to this historic census, accounts for those who are less verbally inclined and of a somewhat methodical disposition and who occupy themselves assiduously with the task of pinching other people's letters, not so much for the sake of reading them (which they do as an after-thought) as for that of abstracting the super-imposed postage stamps. For these belong to ancient race of stamp-collectors. The census, of course, does not discuss the motives behind the phenomenon of stamp-collecting, and very rightly so, since that would be tantamount to an incursion into the sacred realms of recondite metaphysics, with which it has nothing to do.

Head Delta is a psychological curiosity, inasmuch as it contains youths with a decided penchant for speculation who spend their leisure hours in discussing what they will do in their leisure hours, as a result of which they do nothing in their leisure hours.

We now choose to go back against the current of what is facetiously termed the Stream of Time and come to 1951.

We notice that in perfect anticipation of the '61 trends, they had their own Head A, corresponding to our Head Alpha, and consisting of young people who evinced a marked predilection for imbibing the multifarious learning contained in voluminous tomes—which is the same thing as books —a partiality which they indulged within the college premises and without.

And they had Head B. People coming under this head had, likewise, for their favourite past-time the discussion of current affairs. (The author regrets his inability to mention any particular affair as he was then not sufficiently grown up—to use a plebeian expression—to take any interest in such mawkish things). In passing, it may be observed that this habit of protracted academic discussions is often castigated as a morbid preference for gossiping. Whether it is in reality laudable or reprehensible is for the moralist to determine, and is not the concern of an unprejudiced chronicler like the present writer, who must be content to state that Head B discussed current affairs, and that "current affairs" even in those days often meant current or contemporary political and international affairs.

And they had their Head C, which, like Head Gamma of 1961, consisted of ardent philatelists, the noble letter-pinchers. Of course, this head must not be construed too narrowly as referring solely to letter-pinchers, but should be taken as representative of the class or tribe of collectors generally: for collectors then, as now, collected not merely other people's

letters but also other people's books; and today (who knows?) the same collectors may have burgeoned into collectors of other people's wives. This, however, is a provocative digression which need not detain us.

The point to be observed at this point—the second point must not be confused with the first point—is that our original observation, that things have not really changed much in the last decade, will be seen to have been abundantly borne out by the above masterly analysis, almost point for point. (There are far too many points in this sentence). It would appear, therefore, that the thesis to which reference has been made at the very outset is not scheduled to see the light of day. Which is not, as Hamlet would say were he asked to hold forth a similar disquisition and were he in similar trouble, a consummation devoutly to be wish'd. Hell and damnation, there must be some streak of originality in us! And—c-r-r-ash! ! Lo! There is a blinding flash of lightning, and a shattering thunder-clap, and the Finger of God (capital F, because It belongs to God) writes, and the author in true Biblical fashion gains inspired understanding. For "Boys will be boys". This vulgar platitude is claimed by its inventor to be of universal application, a generalization without exception. Let us see. We have analysed, on the basis of the statistics supplied by the 1951 census, the behaviour pattern of the youth of that year, and we have no qualms about saying that, roughly, the boys of 1951 were boys. But, ladies and gentleman, the dictum falls in the year of Our Lord Nineteen Hundred and Sixty-one. For there is one thing we notice about this present year of Our Lord and that is that there is a well-defined section of youth—the thrice-noble Head Sigma —which consists of girls who are girls and of boys who are girls. Young people qualified for admission into this esoteric category have removed with great and utter disdain the superfluous, the cumbrous distinction between male and female, the distinction which formed the basis of the two censuses—or is it censii?—under discussion, and, in an endeavour to bring about some kind of National Integration, have succeeded in the incredible task of extinguishing the primordial distinction betweeu Adam and Eve. (Three Cheers).

We begin, like another well-known author, Thomas Carlyle, with clothes. In this department is the above approximation of the sexes the most noticeable. For the thing in vogue to-day among boys coming under this devastating head is tight-pants (Ugh!). And the pants are so tight that one really wonders how they manage to insinuate their limbs into them. And, which is more marvellous, how they manage to extricate themselves. The problem, however, was solved by a friend of the author's who —the friend, not the author—happens to be well versed in the technique of interior-decoration and who suggested that these gentlemen of the Order of the Tight Pant, whenever they require a change of their nether garments, merely take a piece of cloth to the tailor and have it sewed on to them on

top of the one already existing, on the classic analogy of wall-papers. This, however, is a technical detail, a mere minutia, which is rather beside the point. What is of interest to us is the fact that these sartorial capillary tubes are almost identical with the narrow "shalwars" affected by the female counterparts of the Most Excellent Knights of the Order of the Drain Pipe. One leaves the obvious conclusion to the astute reader.

We now come to point number two, the exact anatomical situation of which is the uppermost region of the human body—the reference is to the human hair. It has been generally accepted that one of the many things girls fool around with in their commendable but futile efforts to enhance their non-existent physical charms is their hair. Some are of opinion that wearing their hair long maximizes their beauty, while others champion the cause of the abbreviated hair. Some like their hair straight and others billowy. Some again are fond of changing (without attracting attention) the colour of their hair at regular intervals, while others, the female descendants of Job, are more steadfast and stick to the shade granted by the Almighty. Our quarrel is with none of these. But when boys, ye Gods! boys invade this acceptedly feminine province and begin to develop distinctive styles in respect of their hair, well, I mean to say, dash it, what?

We now approach this explosive state of affairs from the purely aesthetic point of view, and what do we see? Behold on the horizon a pair of tight pants of the most stygian blackness, contrasted by a shirt of the most bloody, awe-inspiring scarlet, set off by a cravat of a yellow beside which the sun with all its blazing splendour would be forced to take embarrassed shelter behind protective clouds, and topped by an expanse of long, wavy, glutinous, brilliantined hair which immediately conjures up visions of swaying palms beside a billowy sea, and the liquid strains of the "Danube Waves" wafted across. Such a nerve-racking display of colours was never seen on one, single, solitary masculine torso, not even in 1951.

And it is by virtue of this category—Head Sigma—that we triumph over and completely annihilate, our predecessors. For never before in the chequered annals of human civilization were such sights seen as we have the dubious pleasure of seeing to-day—the sight of millions of youthful human bi-peds cramped inside a microscopic restaurant, swaying vertiginously to the throb of beating drums, or languorously, even lackadaisically, strolling along the more sophisticated avenues, and generally having a hell of a good time, completely anonymous, in so far as their gender is concerned, in conveniently noncommittal attire, and armed with a weapon capable of beating off the most persistent attacks of such persons as are foolishly determined upon discovering their sex—a dazzling medley of colours, the most deadly weapon that human ingenuity can devise. It is the past-times and frolics of this illustrious—one uses the word advisedly—clan that give the youth of 1961 that peculiar air of distinction. Peculiar, indeed!

The Scientific Attitude

SIDDHARTHA SEN
Sixth Year, Pure Physics

The progress of science has behind it a certain attitude of mind which slowly emerged in the seventeenth century. It may briefly be described as a tendency to accept empiricism as the basis of scientific speculation. It is anti-Aristotelian, non-authoritarian, and is connected with an individual's thought processes stimulated by observations of the external world. The progress did not come from the effort of a few solitary men answering the call of their superior talent, but was the outcome of a nation-wide enthusiasm. The causes of this enthusiasm and interest in the seventeenth century are speculative and cannot be definitively stated. It is interesting to know that although science took a very important stride in the seventeenth century its votaries had to wait for more than a hundred years before the happy accident on the part of a Cambridge don produced the name by which they are now known. The word 'scientist' was used for the first time by Whewell in 1840.[1]

What is the scientific attitude? The empirical nature of the attitude had already been noticed. In general we may say that it always seeks a sufficient cause for a phenomenon and refuses to frame any hypothesis when such cause cannot be discovered. It will not fail to notice the degrees that divide the possible from the probable and the probable from the certain. In actual life we are always inclined to act under an impulse and we then accept a prejudice as an established fact. We have seen how often this happens. When, for example, a country is passing through an election fever, candidates with whom we are out of sympathy will be painted as black as our imaginations permit us to paint them on the basis of allegations not one of which can be proved. In ordinary circumstances, too, superstitious ideas frequently influence our judgment and create in our mind horrors for which there is not the least justification. An anxious mother, for example, will not let her husband shoot a bird. When he disobeys and the baby falls ill the poor mother imagines that the law of retribution is at work. A rational scientific attitude is difficult to cultivate and the greatest vigilance is necessary for a period of years before we are able to achieve it in significant measure. Scientists themselves often fail to give evidence of such an attitude when they are faced by the daily problems of life. They

[1] "We need very much a name to describe a cultivator of science in general. I should incline to call him a 'scientist'" Whewell—Philosophy of the Inductive Sciences. Vol. I. Introduction.

show themseves on such occasions as illogical and irrational as most men governed by a passion.

In our times science is taking big strides and it might be felt that the scientific attitude should therefore have a stronger hold upon us than at any time in the past. But scientists themselves seem to think that in the end there is no cause to explain phenomena. Several reputable scientists, mostly physicists, have expressed this view and Jung[2] in recent years has formulated his theory of synchronicity. He has not pretended that the synchronisms of which he speaks are causally related but their inevitable association does produce in the average mind the feeling that when one thing happens, the other will inevitably follow. A case mentioned by Jung to indicate his point is of interest and merits quotation: 'The wife of one of my patients, a man in his fifties, once told me in conversation that, at the death of her mother and her grandmother, a number of birds gathered outside the windows of the death chamber.... When her husband's treatment was nearing its end, his neurosis having been removed, he developed some apparently quite innocuous symptoms which seemed to me, however, to be those of heart-disease. I sent him along to a specialist, who after examining him told me in writing that he could find no cause for anxiety. On the way back from this consultation (with the medical report in his pocket) my patient collapsed in the street. As he was brought home dying, his wife was already in a state of great anxiety because, soon after her husband had gone to the doctor, a whole block of birds alighted on their house. She naturally remembered the similar incidents that had happened at the death of her own relatives, and feared the worst."[3]

This new theory does not dissipate the superstitious atmosphere and make it fit for the reception of scientifically valid truth. We have, therefore, to contend not only against superstition but against scientists themselves when we wish to acquire the truly rational attitude.

The sufficient cause of which we have spoken should always be a main quest for all of us and the next will be a purely objective approach uninfluenced by any personal feelings. Once we know a fact with complete thoroughness our business will be to communicate it with perfect accuracy. Precision of statement is therefore another important element in the attitude.

To sum up, the scientific attitude is based upon an investigation of a true and adequate cause for the explanation of every circumstance and a careful attempt to express the results of our investigations with precision. For this we have to be impartial in the enquiry and to fix our eyes on the

[2] C. G. Jung—Synchronicity, An Acausal Connecting Principle, being the first essay in the book 'The Interpretation of Nature and the Psyche.' (Boelinger Series L1, 1955)

[3] C. G. Jung—Synchronicity, An Acausal Principle, p. 31.

object of investigation so that our attention is not disturbed by any circumstance foreign to it.[4] When we can do this habitually and effortlessly we shall feel that our labours in the cause have been well rewarded.

Destination—"Base-Camp"

ARUN CHAKRABARTI
Ex-student

On the 15th of last April one of my cherished dreams came true. I got a letter asking me to join the 15th Basic Course at the Himalayan Mountaineering Institute, with its headquarters in Darjeeling. At last I was to brave the wild ranges of the Himalayas—of which I had read so much about. I also looked forward to the joys and excitements of camp-life, although I had been thoroughly made to understand that there were hardships as well.

I reached Darjeeling and found that the Institute buildings were situated in an ideal spot, with the magnificent ranges of the Kanchanjunga forming an ever-reminding back-ground. There were twenty-four of us in the batch. There were men and women, boys and girls from all over India and from all paths of life. Barriers of language, manner and dress all proved insignificant in face of our common bond of the love of mountaineering.

The life at the institute was not at all one of regimentation, as we had feared, but we were given complete freedom. We were taught the importance of self-discipline rather than enforced rule and command. Mountaineering is a form of exhilarating sport where material gain is negligible. The greatest benefit is derived from the impact of mighty mountains on the mind of the mountaineer. The mountaineer's achievement lies in the feeling that he is rising higher and higher, surmounting all the hazards and obstacles that come in the way. There an individual can really feel "victory without pride, and defeat without despair."

The joy and benefit of mountaineering has been eloquently put by Frank Smythe, a great mountaineer, who writes—"To climb on the highest

---

[4] 'Factors foreign to an enquiry' are decided, according to Dingle, by the requirement that there should exist simple relations between the results of our measurements. See Dingle, British Journal for the Philosophy of Science (1950), p. 5.

hills is to realise a kinship with Nature. Penalties and pains may attend such a realisation, but these make the eventual consummation all the more vital and joyful, for it is the immutable law of the Universe that only through striving and suffering shall man learn to realise himself, to gain in awareness, to enlarge his moral stature, to discover truth and enjoy."

The first part of our course included all theoretical knowledge abount mountains and mountaineering. This included knowledge of high altitude vegetation and animal life, principles of Geology, mountaineering techniques etc. We were taught how to use oxygen cylinders and how to live with the peculiarities of high altitude. The various equipments necessary for such operations were explained to us.

Before leaving for the Base Camp in Western Sikkim, we were given an address by the Governor of West Bengal. She gave us her blessings and impressed upon us the virtue of self-reliance, sacrifice and comradeship.

It was on the 3rd May, 1961, that we started for the Base Camp at last. It was a misty morning. A large number of porters lifted our luggage and all of us started on our trek of seventy-five miles to our camp-site in Western Sikkim.

At Majhitar, we pitched our first camp and lay out our sleeping-bags. This would be our first experience of sleeping-bags and we were doubtful of how it would feel. We got into them, amidst much laughter and comments, but the interior of the bags proved to be nice and cosy.

We got up very early the next morning. The "duty officer", a post which we took in turn, saw to the supply of early refreshments. Later we had some porridge and packed some chapatti, bread, biscuit, chocolate etc., into a lunch packet which we carried in our rucksacks. On the way we met the simple folks of the mountains who looked really happy and contented. These were truly idyllic days. We always halted near a stream, in which we bathed and refreshed after the day's trek. Thus, marching through the maize fields skirting round hills and crossing beautiful waterfalls we gained height. On the way we halted at Rohtak, Leigship, Tashiding and at last reached Yulesam, a beautiful and important valley of Sikkim. The first king of Sikkim was crowned in a monastery here. It was here that we had our first view of the snow-capped mountains. We were thrilled to have a glimpse of our destination, although the clouds soon covered them from our view.

We halted for a short period at Yulesam and took this opportunity to visit the people of the valley in their homes. We were really pleased to meet the poor but contented people of the place living in their crudely built houses. The needs of these people are few and the valley meets all of them. They are not ambitious. Their deep faith in Lord Buddha helps them to face the hardships of life cheerfully.

We pressed on towards our destination through thick forests; and, at one place, we had to construct our own bridge with bamboos and indigenous forest materials. When we used to feel homesick amidst the wild and faraway environment, we wrote letters which were carried off by messengers.

Our next halt was at Dzongri which is situated at the critical height of 13,200 ft. It is no exaggeration to say that for the lover of Nature this place was heavenly. On all sides there was a riot of colourful rhododendrons interspersed with the mountainous green of the vegetation. As we marched out of this halt, altitude had started its effect and three girls had to be carried down to lower heights in order to recuperate.

In this manner we pushed on, making the rocks our lecture halls and gaining practical experience of mountaineering methods. As we travelled higher and higher the cold became intense and piercing. The vista changed and slowly the snow dominated the view. All through the journey the rain dogged our footsteps. Up to an altitude of 14,000 ft. plastic raincoats were not insufficient to keep us tolerably dry, but as we gained height the rains changed into snow which became thicker and stronger. We often had to stay inside our tents to escape the sleet. At times the tents seemed near collapsing with the weight of the accumulated snow.

On the 14th of May, we stepped onto the site that was to be our base camp. Our joy in having successfully completed an arduous and long climb was really very great. After covering a distance of more than 80 miles, we reached our Base Camp situated at a height of over 20,000 ft. The unusually high altitude began to make itself felt in no small measure, and the accompanying physician had his hands quite full. By luck and good fortune I escaped all ill effects and was able to finish the complete course of our journey up to the peak of the "Fry Peak". Mr. Tensing was always solicitious about our well-being and our esteemed Principal, Mr. Gyan Singh, was most careful about our safety.

Our day started with morning exercises to quicken up our sleepy muscles. Then we were taught the various teachniques of rock-climbing. After a couple of days we went to the Rohtang glacier. Mr. Tensing, the Director of Field Training, taught us how to cut steps in the ice and how to secure hand-holds. We learnt how to rappel down a wall with the help of a rope.

All these experiences were really elevating and exhilarating. The words of our Principal, "feel the nearness of God when living with Nature in the raw" we were able to appreciate and understand fully.

It is in the mountains only that real tranquillity and contentment can come upon a person. The vast and massive ranges strip us of our ego. They help us to attune our souls to that of the Infinite. "Mountains make me pray" Sir Edmund Hillary had said.

Our downward journey was started on the 19th, and dreaming of the 'Base Camp' we reached Darjeeling on the 25th, where, two days later we were declared as *being graduates* of mountaineering.

To Solitude

PROTIMA MITTER
Sixth Year, English

O hushed reliever of my perturbed mind,
Come over with thy gift of calm severity,
And me with thy restful balm softly bind;
And so let me repose till Eternity.
O quiet solitude! thy mantle spread
O'er the place where I shall abide;
And so remain, till I from earth have fled.
When I do flee, turn away, softly glide,
Relieve me or I shall be engulfed
In further worries ere the day is o'er
Give me thy peace—the music in the trees,
The sigh of leaves, the sight of blossoms fair . . .
Give me thy sounds—the murmuring of bees—
Thus will I know that God is always near.

A college is known by its traditions, and last year the heavy hand of Death took away a living tradition of the Presidency College. Our beloved Darwanji—Babban Singh—died on the 11th of November, 1961.

He was a staunch member of the Old Guard and he lived and died like one. His integrity and forthrightness had carved him a place of respect and love in the hearts of all those who came to know him, through the long years that he had been a part of this college. He never tired of advising the errant students and his penetrating albeit humourous comments commanded invariable attention.

His sense of duty was unfaltering, and he performed it with commendable zeal, even unto his last breath

May his soul rest in peace.

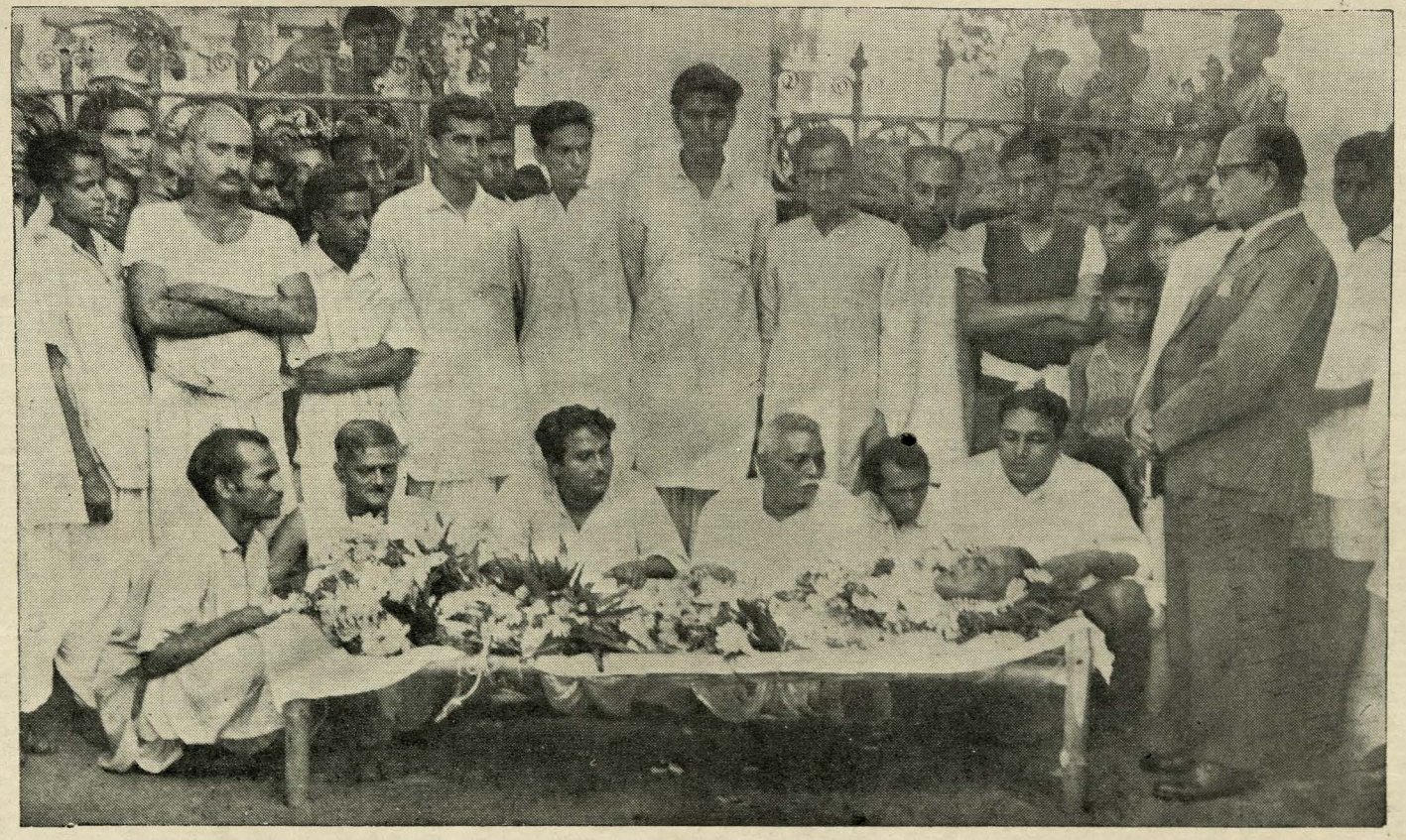

The last sleep

Results and Prizes

The students of the Presidency College, as usual, have put up a most commendable performance in the various University Examinations. A list of names is being appended in this connexion:—

The last issue having been solely devoted to the centenery celebration of Rabindranath Tagore, this list was left out.

At the Intermediate stage the percentage of passing was 90.65 in I.A., and 96.5 in I.Sc. In the latter, out of 173 examinees, 167 were placed in the First Division, 9 of them being in the first ten. In I.A. 40 got First Divisions from among 53 examinees, 2 of them securing places within the first ten.

In 1960 the college placed 113 more Science Graduates and 95 Arts Graduates, all with honours of course, on the field of life. Among them 38 got First Classes.

This year, as usual, the percentage of successful candidates in examinations aspire closely to the cent per cent mark. In I.A. it is 95.4. In I.Sc.—97.14. In the former 35 out of 44 got first divisions, and in the latter 159 out of 175. The Arts students seem to have been almost wholly edged out the honours' positions—only one being within the first ten. This is compensated in the science section—9 out of 10 being from our college.

In the first Pre-University results the percentage is unbelievably high—98.91.

This year seven Graduates got First Divisions in B.A., and 38 in B.Sc. The total number of Honours Gradutes were 102 in B.A. and 130 in B.Sc.

Medals, Prizes and Scholarships awarded by the University M.A. and M.Sc. Examinations, 1959

M.A.

Tirthankar Basu	(a) Silver Medal and Prize of Rs. 200. (b) Upendranath Mitra Scholarship.
Paragkesar Bhattacharyya ..	Gold Medal and Prize of Rs. 200.
Asoksanjay Guha	Silver Medal and Prize of Rs. 100.
Bibhasranjan De	Gold Medal and Prize of Rs. 200.
Lata Roy	(a) Prize of Rs. 100 only. (b) Sudhir Roy Gold Medal.
Sitansusekhar Mitra	(a) Gold Medal and Prize of Rs. 200. (b) Kshentamani Nagendralal Gold Medal. (c) Kesablal Mallik Gold Medal (a gold-rimmed silver medal out of the value of the medal).
Rina Datta	Bankobehary Banerjee Gold Medal.

M.Sc.

Sakuntala Gupta	Gold Medal and Prize of Rs. 200.
Sukhendumohan Mukhopadhyay ..	Prize of Rs. 100.

Dhrubajyoti Mukhopadhyay ..	(a) Gold Medal and Prize of Rs. 200. (b) Brahmamohan Mallik Gold Medal. (c) Matilal Mallik Gold Medal (a gold-rimmed silver medal out of the value of the medal).
Sugata Sengupta	Silver Medal and Prize of Rs. 100.
Ajay Kumar Ray	Gold Medal and Prize of Rs. 200.
Debendranath Bandyopadhyay ..	Silver Medal and Prize of Rs. 100.
Rabindranath Bhattacharyya ..	Silver Medal and Prize of Rs. 100.
Subrata Sengupta	Gold Medal and Prize of Rs. 200.

B.A. and B.Sc. Examinations, 1960

B.A.

Pranabsankar Mukhopadhyay ..	Satishchandra Ghosh Prize in Bengali.
Amit Bhaduri	Quinlan Memorial Silver Medal.
Bimal Nayan Jalan	(a) N. N. Ghosh Gold Medal (a gold-rimmed silver medal out of the value of the medal). (b) Shamacharan Gangualy Prize (B.A.).
Mrinal Miri	Philip Samuel Smith Prize.
Tapan Kumar Chakrabarti ..	Ramtanu Lahiri Gold Medal.
Sujashnilay Ghosh	Krishnakumar Dutt Silver Medal.
Ashish Gupta	(a) Manackjee Rustomjee Gold Medal. (b) Abinashchandra Gold Medal. (c) Dwarkanath Banerjee Silver Medal. (d) Preonath Ghosh and Gagantara Dasi Silver Medal. (e) Tawney Memorial Prize. (f) Rai L. M. Chatterjee Bahadur Prize.
Pinaki Prasad Mitra	(a) Bankimbihari Sen Gold Medal. (b) Sarveswara and Purnachandra Gold Medal (a gold-rimmed silver medal out of the value of the medal).
Sulekha Dey	(a) Surendra-Nalini Gold Medal (a gold-rimmed silver medal out of the value of the medal). (b) Santirani Basuraychaudhuri Gold-rimmed Silver Medal. (c) Sujata Devi Gold-rimmed Silver Medal (a silver medal out of the value of the medal). (d) Ksheroda Sundari Silver Medal. (e) Sarada Sundari Gupta Silver Medal. No. I in Indian Vernacular.
Anuradha Basu	Nagendra Gold Medal.
Renu Basu	Clint Memorial Prize.
Patralekha Bhattacharyya ..	(a) Thakurdas Kerr Gold Medal. (b) Adharchandra Mookerjee Commemoration Prize. (c) Bipinbihari Memorial Prize.

B.Sc.

Gaurchandra Sinharay	..	McCann Silver Medal.
Pratipkumar Chaudhuri	..	(a) Mohinimohan Roy Memorial Gold-rimmed Silver Medal (a silver medal out of the value of the medal). (b) Shamacharan Ganguly Prize (B.Sc.).
Brajamohan Mandal ..	..	Gangaprasad Gold Medal.
Sujitkumar Majumdar	..	Hemchandra Dasgupta Silver Medal.
Harindranath Sur ..	..	(a) Subhendusekhar Bose Gold Medal. (b) Manmathanath Bhattacharyya Gold Medal (a gold-rimmed silver medal out of the value of the medal).
Pushpa Golechha ..	..	G. D. Majumdar Silver Medal.

ENGLISH SEMINAR

Two meetings of the Eng. Seminar have been held since the re-opening of the College after the summer vacation. On the 28th July, Sm. Jyotsna Bhattacharya, M.A., Lecturer in English, Jadavpur University (ex-student), read a paper on *Atalanta in Calydon*. On the 25th August, Shri Asokekumar Mukherji, B.A. (Oxon.), Asstt. Professor of Eng., Maulana Azad College (ex-student), read a paper on 'Dr. Johnson as a Literary Critic'. Both the papers were highly appreciated. We wish to record here our grateful thanks to Sm. Bhattacharya and Shri Mukherji.

MIHIRRANJAN BHATTACHARYA, *Secretary.*

Awarded by the Presidency College

Awards on the results of the I.A. and I.Sc. Examinations of the University in 1960

Name of the Prize	Name of winner	Condition of award.
1. Scindia Gold (Centered) Medal and Gwalior Prize ..	Shri Sujit Sankar Chatterjee ..	Highest marks from the College in the I.Sc. Examination.
2. Scindia Gold (Centered) Medal and Gwalior Prize ..	Shri Pratap Mukherjee ..	Highest marks from the College in the I.A. Examinations.
3. Arund Sarker Memorial Medal	Shri Prabir Ray	Highest marks in Bengali in I.A. and I.Sc. Examinations among the students of the College.
4. Harish Chandra Kaviratna Prize	Shri Amritananda Das	Highest marks in Sanskrit in I.A. and I.Sc. Examinations among the students of the College.
5. Chandra Nath Moitra Medal	Shri Asoke Basak	Highest marks in Geology in I.Sc. Examination among the students of the College.
6. Sir Charu Chandra Ghosh Memorial Prize	Shri Indra Nath Guha	Highest marks in English in I.A. and I.Sc. Examinations among the students of 3rd Year English Hons. Class of the College.
7. College Prize	Shri Sanat Kumar Ghose ..	Highest marks in Geography at I.A. and I.Sc. Examinations obtained by a student of this College who has been admitted in the 3rd Year Class.
8. Rai Bahadur Devender Chander Ghosh Prize	Shri Pratap Mukherjee	Highest marks in History at I.A. Examination obtained by a student of this College who has been admitted in the 3rd Year Class.

Awards on the results of the Annual Examination of the College in 1960

9. Kunja Behari Basack Medal ..	Shri Jayanta Biswas	Highest marks in Practical Chemistry among the students of 3rd Year Pass and Hons. Class of the College.

Awards on the results of B.A. and B.Sc. Examinations of the University in 1960

Name of the Prize	Name of winner	Condition of award.
10. Cunningham Memorial Prize	Shri Brojomohan Mandal ..	Highest marks in Chemistry Hons. in B.Sc. Examination among the students of the College.
11. College Prize	Shri Asoke Chandra Ghosh ..	Highest marks in Chemistry Hons. among the 5th Year students of this College.
12. J. C. Nag Memorial Medal ..	Shri Puspa Golecha	Highest marks in Botany in B.Sc. Hons. Examination among the students of the College.
13. J. C. Sinha Economics Prize	Shri Bimal Nayan Jalan ..	Highest marks in Economics Hons. in B.A. Examination among the students of this College.

Awards on the results of M.A. and M.Sc. Examinations of the University in 1959

14. Chandranarayan Gold (Centered) Medal	Shri Sabyasachee Bhattacharyya ..	Highest marks in History among the students of the College.
15. Cunningham Memorial Prize	Shri Ashish Kr. Ghosh ..	Highest marks in Chemistry among the students of the College.

Awards on the results of 4th Year Arts Test Examination, 1960

16. H. R. James Prize—By Shri K. P. Khaitan	Shri Ashis Gupta	Highest marks in English Hons. among the 4th Year students of the College.
17. H. M. Percival Memorial Prize —By Shri K. P. Khaitan ..	Shri Bimal Nayan Jalan ..	Highest marks in Economics Hons. among the 4th Year students of the College.

Awards on the results of I.A. and I.Sc. Test Examinations, 1960

18. Ashutosh Mukherjee Prize ..	Shri Rajanish Kumar Jain ..	Highest marks in 2nd Year Science Test Examination.
19. Ashutosh Mukherjee Prize ..	Shri Biswanath Banerjee ..	Highest marks in 2nd Year Arts Test Examination.
20. Nistarini Dasi Prize ..	Shri Dipak Ghosh	Best Laboratory Note-book in Physics among the 2nd Year Science (Hindu) students of the College.

M.A. and M.Sc. Examinations, 1960

Names of students obtaining first class
(Merit in order of the University)

M.A.

Economics

Ramgopal Agarwala	1st
Pranab Kr. Bardhan	2nd

History

Sumit Sarkar	2nd

Pali

Dipak Kr. Barua	1st

Applied Mathematics

Rabindranath Chatterjee	3rd
Narayan Ch. Burman	11th

M.Sc.

Physics

Salil Ranjan Roy	2nd
Amit Goswami	8th
Mihir Kanti Ghosh	12th

Geology

Sudhir Bh. Basu Mallick	1st
Subimal Sinha Roy	2nd
Akhilesh Choudhuri	3rd
Sanjoy Ch. Chandra	3rd
Amaljyoti Sengupta	5th
Rajat Kanti Kar	6th
Cecil Laha	9th
Utpal Bose	10th
Sankar Prosad Ghosh	12th
Manindra Nath Coomar	14th

Geography

Saroj Kumar Pal	1st
Mrinal Kanti Datta	2nd
Manjari Roy	3rd
Santana Pal	4th

Zoology

Samir Kr. Banerjee	1st
Jyotiprokash Choudhury	3rd
Sudhangsu Kr. Ghosal	7th
Kamala P. Kripalani	9th

Physiology

Shibani Banerjee	10th

Botany

Subimal Roy	9th
Deepali Dey	10th

Intermediate Examinations, 1960

Names of students placed among the first ten

I.Sc.

Sujit Sankar Chattopadhyay	1st
Asoke Kumar Basu	2nd
Prabir Roy	3rd
Asoke Basak	4th
Arkaprabha Deb	5th
Pradip Mukhopadhyay	6th
Manoranjan Saha	8th
Nabendralal Basak	9th
Susanta Kumar Mukhopadhyay	10th

I.A.

Pratap Mukhopadhyaya	5th
Amritananda Das	6th

B.A. and B.Sc. Examinations, 1960

Names of students obtaining first class

B.A.

Economics

Bimal Narayan Jalan	1st
Amit Bhaduri	1st

Philosophy

Tapan Chakrabarty	1st

Mathematics

Pinaki Prosad Mitra	1st

B.Sc.

Physics

Ramendra Prasad Roy	1st
Amal Kumar Bhattacharya	1st
Subrata Datta	1st
Tamohar Krishna Roy Dastidar	1st
Pratip Kr. Choudhuri	1st
Kanti Bhusan Datta	1st
Asoke Kumar Mukherji	1st
Netai Charan Mukherji	1st
Biswok Bhattacharya	1st
Triptesh Kumar De	1st
Sailajananda Mukherjee	1st

Statistics

Debabrata Roy	1st
Alok Nath Bhattacharya	1st
Someswar Nath Choudhuri	1st

Harendra Nath Sur	.. .. ..	1st
Rajat Gupta ..	.. .. ..	1st
Bijoy Kumar Dhar	.. .. ..	1st
	Chemistry	
Brojo Mohan Mandal	.. .. ..	1st
	Physiology	
Shyamal Kumar Datta	.. .. ..	1st
Nina Ghosh ..	.. .. ..	1st
	Geology	
Pulak Kumar Raha	.. .. ..	1st
Sujit Kumar Majumdar	.. .. ..	1st
Asoke Kumar Talapatra	.. .. ..	1st
Amitabha Mukherjee	.. .. ..	1st
	Mathematics	
Gaur Ch. Sinha Roy	.. .. ..	1st
Sukdeb Mukherjee	.. .. ..	1st
Arabinda Roy ..	.. .. ..	1st
Dipak Neogi ..	.. .. ..	1st

Medals, Prizes and Scholarships awarded by the University

M.A. and M.Sc. Examinations, 1960

M.A.

Dipak Kr. Barua ..	.. Gold Medal and Prize of Rs. 200.
Sumit Sarkar ..	.. Silver Medal and Prize of Rs. 100.
Ramgopal Agarwala ..	.. Gold Medal and Prize of Rs. 200.
Pranab Kr. Bardhan ..	.. Silver Medal and Prize of Rs. 100.
Jyotsna Bhattacharyya ..	.. Kshetra Mohan Chatterjee Gold Medal (a gold-rimmed silver medal out of the value of the medal).
Sanjoy Majumdar ..	.. Jadunath Mahalakshmi Silver Medal (a silver medal of half the value out of the value of the medal).

M.Sc.

Salil Ranjan Roy ..	.. Silver Medal and Prize of Rs. 100.
Sudhir Bh. Basu Mallick ..	.. Gold Medal and Prize of Rs. 200.
Subimal Sinha Roy ..	.. Silver Medal and Prize of Rs. 100.
Samir Kr. Banerjee ..	.. Gold Medal and Prize of Rs. 200.
Saroj Kr. Pal ..	.. Prize of Rs. 200.
Mrinal Kanti Datta ..	.. Silver Medal and Prize of Rs. 100.

B.A. and B.Sc. Examinations, 1961

B.A.

Sobhakar Gangopadhyay ..	.. Bankimbihari Sen Gold Medal.
Dilip Kumar Gangopadhyay	.. Pramathanath Banerjee Prize (B.A.) (a prize of half the value).

Siddhartha Ray ..	.. Pramathanath Banerjee Prize (B.A.) (a prize of half the value).
Dilip Kumar Acharya ..	.. (a) N. N. Ghosh Gold Medal (a gold-rimmed silver medal out of the value of the medal). (b) Shamacharan Ganguly Prize (B.A.).
Gautam Chakrabarty ..	.. (a) Manackjee Rustomjee Gold Medal. (b) Sarveswara and Purnachandra Gold Medal (a gold-rimmed silver medal out of the value of the medal). (c) Preonath Ghosh and Gagantara Dasi Silver Medal. (d) Tawney Memorial Prize. (e) Rai L. M. Chatterjee Bahadur Prize.
Naresh Kumar Arora ..	.. (a) Thakurdas Kerr Gold Medal. (b) Adharchandra Mookerjee Commemoration Prize. (c) Bipinbihari Memorial Prize.
Debjani Das ..	.. Quinlan Memorial Silver Medal.
Jamuna Daschaudhuri ..	.. W. C. Ghose Silver Medal.

B.Sc.

Utpalkumar Bandyopadhyay	.. Mc. Cann Silver Medal.
Debkumar Dasgupta ..	.. Hemchandra Dasgupta Silver Medal.
Bidyendumohan Deb ..	.. Ramanimohan Majumdar Gold Medal (a gold-rimmed silver medal out of the value of the medal).
Partha Niyogi ..	.. Mohinimohan Rai Memorial Gold-rimmed Silver Medal (a silver medal out of the value of the medal).
Debaprasad Majumder ..	.. (a) Gangaprasad Gold Medal. (b) Tripundeswar Mitra Gold Medal. (c) Shamacharan Ganguly Prize (B.Sc.)
Suhita Guha ..	.. G. P. Majumder Silver Medal.
Enid Shaw ..	.. Basanti Das Gold-rimmed Silver Medal (a silver medal out of the value of the medal).

M.A. and M.Sc. Examinations, 1961

Names of students obtaining first class

(Merit in order of the University)

M.A.

Economics

Prabir Basu ..	..	..	..	1st

Philosophy

Jaysankarlal Shaw	..	..	..	1st

Geography

Dipika Chakrabarti	..	..	..	1st

M.Sc.

Physics

Sibaprosad Sen Gupta	..	..	..	4th
Nirmal Kumar Misra	..	..	..	7th

Chemistry

Ram Gopal Bhattacharya	..	..	..	1st
Arabinda Mukherjee	..	..	..	2nd
Jayanta Kumar Bagchi	..	..	..	6th

Geology

Anil Kumar Ghosh	..	..	..	1st
Susil Kumar Roy Choudhuri	..	..	..	4th
Tarun Kumar Bannerjee	..	..	..	5th
Anjan Kumar Chatterjee	..	..	..	6th
Malay Bhusan Chakravartty	..	..	..	6th
Priyabrata Ghosh Dastidar	..	..	..	14th

Zoology

Tapan Kumar Bhattacharya	..	..	..	1st
Samarendra Nath Chatterjee	..	..	..	2nd
Madhuri Khan ..	..	..	..	4th
Ram Kanta Chakrabarti	..	..	..	6th
Nibha Thakui ..	..	..	..	12th

Physiology

Arabinda Kumar Sinha	..	..	..	14th

Intermediate Examinations, 1961

I.A.

Biswanath Banerjee	..	..	..	8th

I.Sc.

Bhaskaryoti Mukherjee	..	..	..	1st
Shyamal Kr. Mitra	..	..	..	2nd
Subhendu Chakravarty	..	..	..	3rd
Rajnish Kr. Jain	..	..	..	5th
Asoke Kr. Ghosh ..	..	..	..	6th
Udoy Sankar Bosak	..	..	..	7th
Kumar Sankar Majumdar	..	..	..	8th
Prabir Kr. Ghosh	..	..	..	9th
Kamal Ranjan Acharyya	..	..	..	10th

B.A. and B.Sc. Examinations, 1961

Names of students obtaining first class

B.A.

English

Gautam Chakravarty

Economics

Dilip Kumar Acharyya

History

Naresh Kr. Arora
Khorsheed B. Bhathena
Aparna Banerjee
Chittabrata Palit

Statistics

Brojeswar Chakravorty

B.Sc.

Physics

Debaprasad Majumdar
Prabhu Doyal Agarwal
Partha Neogi
Debiprosad Sarkar
Mihir Kumar Datta
Amarnath Datta
Badal Kr. Betal
Rabinda Tahilram Darianani
Malay Kanti Chakravorty
Sambhunath Ghosh
Rajat Chanda
Subhendu Kr. Deb
Siddhartha Sen
Aloke Kr. Sen
Subhendu Guha
Pranab Kr. Roy Choudhuri
Partha Sarathi Ghosh

Chemistry

Bidyendu Mohan Deb
Goura Dujari
Ratna Ghosh

Mathematics

Utpal Kumar Banerjee

Physiology

Enid Prabha Shaw
Usha Bhargava
Ajoy Kr. Chatterjee
Narayan Prosad Maheswari
Nandita Sen
Shyama Prosad Mukherjee

Geology

Deb Kumar Dasgupta
Suhash Ch. Talukdar
Santosh Kr. Ghosh
Debasish Chatterjee
Bijoy Prasanna Bhattacharyya
Nirmal Chattopadhyay

Zoology

Santigopal Pal
Ashim Kr. Chakravorty

Botany

Suhita Guha

Statistics

Pijush Dasgupta
Chandan Kr. Basu

Awarded by the Presidency College, Calcutta
Awarded on the results of the I.A. and I.Sc. Examinations of the University in 1961

Name of the Prize	Name of winner	Condition of award
1. Scindia Gold (Centered) Medal and Gawalior Prize ..	Shri Bhaskarjyoti Mukherjee ..	.. Highest marks from the College in the I.Sc. Examination.
2. Scindia Gold (centered) Medal and Gawalior Prize ..	Shri Biswa Nath Banerjee	Highest marks from the college in the I.A. Examination.
3. Arun Sarkar Memorial Medal ..	(1) Shri Ranjit Kr. Chakravarty (2) Shri Dipendu Chakravarty. ..	Highest marks in Bengali in I.A. and I.Sc. Examination among the students of the college.
4. Harish Chandra Kaviratna Prize ..	Shri Ranjit Kr. Chakravarty ..	Highest marks in Sanskrit in I.A. and I.Sc. Examinations among the students of the college.
5. Chandra Nath Moitra Medal ..	Shri Manish Kr. Banerjee	Highest marks in Geology in I.Sc. Examination among the students of the college.
6. Sir Charu Chandra Ghosh Memorial Prize ..	Sm. Srabana Mukherjee	Highest marks in English in the I.A. and I.Sc. Examinations among the students of Third Year English Honours class of the college.
7. College Prize	Shri Pradip Kr. Mukhopadhayay ..	Highest marks in Geography at the I.A. and I.Sc. Examinations obtained by a student of this college who has been admitted in the Third Year class.
8. Rai Bahadur Devender Chander Ghosh Prize ..	This award is suspended this year as there is no suitable candidate fulfilling the requirements. ..	
9. Cunningham Memorial Prize ..	Shri Bidyendu Mohan Deb	Highest marks in Chemistry Honours in B.Sc. Examination among the students of the college.

Awards on the results of B.A. and B.Sc. Examinations of the University in 1961

Name of the Prize	Name of winner	Condition of award
10. College Prize ..	.. Shri Sudhir Ch. Dhara ..	.. Highest marks in Chemistry Honours, among the Fifth Year students of this college.
11. J. C. Nag Memorial Medal ..	Sm. Suhita Guha ..	.. Highest marks in Botany in B.Sc. Honours Examination among the students of this college.
12. J. C. Sinha Economics Prize ..	Shri Dilip Kumar Acharja ..	.. Highest marks in Economics Honours in B.A. Examination among the students of this college.

Awards on the results of M.A. and M.Sc. Examinations of the University in 1960

13. Chandranarayan Gold (Centered) Medal ..	Shri Sumit Sarkar ..	.. Highest marks in History among the students of the college.
14. Cunningham Memorial Prize ..	Shri Anil Kumar Kundu ..	.. Highest marks in Chemistry among the students of the college.

Awards on the results of the Annual Examination of the College in 1961

Name of the Prize	Name of winner	Condition of award
15. Ashutosh Mukherjee Prize ..	Shri Tapan Kumar Das ..	.. Highest marks in First Year Degree Science Examination.
16. Ashutosh Mukherjee Prize ..	Shri Pradip Banerjee ..	.. Highest marks in First Year Degree Arts Examination.
17. Kunja Behari Basak Medal ..	Shri Monojit Acharyya Chaudhury	.. Highest marks in Practical Chemistry among the students of Third Year Pass and Honours class of the college.
18. Nistarini Dasi Prize	Shri Subir Dutta ..	.. Best Laboratory Note-book in Physics among the Second Year Degree Science (Physics Honours) students of the college.

Awards on the results of the Fourth year Arts Test Examination, 1961

19. H. R. James Memorial Prize by Sri K. P. Khaitan	Shri Gautam Chakravarty ..	.. Highest marks in English Honours among the Fourth Year students of the college.
20. H. M. Percival Memorial Prize by Shri K. P. Khaitan	Sm. Debjani Das ..	.. Highest marks in Economics Honours among the Fourth Year students of the college.

The results of this year's B.A. & B.Sc. examinations having come out just in time to catch the magazine while going to press, a list of those who have secured First Class honours is given below, as far as I know in order of merit. Any mistake is regretted.

B.A

English

Aditya Kumar Bhattacharya	1st
Indra Nath Guha	2nd

History

Saurindra Nath Roy	2nd
Ranu Guha	4th
Pratap Mukherji	5th
Uma Roy	6th
Sadhan Kumar Mukherji	7th

Economics

Asoke Kumar Basu	1st
Badal Mukherji	1st
Swapna Roychoudhuri	3rd

Geography

Abhijit Gupta	1st
Indira Ganguly	2nd
Arabinda Biswas	3rd

Sanskrit

Mrinal Kanti Ganguly	1st

Statistics

Malay Ghosh

B Sc.

Physics

Susanta Kumar Mukherji
Santosh Kumar Samaddar
Aloke Kumar Majumdar
Prabir Roy
Arkaprabha Deb
Monoranjan Saha
Samarendra Nath Biswas
Dwijadas Chakravartty
Pradip Mukherji
Asit Ranjan Das
Susanta Ranjan Bagchi
Dhiranjan Roy

Chemistry

Samir Kumar Chatterji
Mandira Ganguly
Ramananda Bhaduri

Physiology

Asoka Bhattacharya .. .. ..
Illora Chaudhuri .. .. ..
Lalit K. Gokuldas Barai .. .. ..
Aparna Bannerji .. .. ..
Asis Kumar Basu Mallick .. .. ..
Debaki Set .. .. ..
Sabita Dey .. .. ..
Sukla Nandy .. .. ..

Geology

Asoke Basak .. .. ..
Nabendra Lal Basak .. .. ..
Monoj Kumar Nandi .. .. ..
Dilip Kumar Biswas .. .. ..
Phoolan Prasad .. .. ..
Sudarshan Senapati .. .. ..

Statement about ownership and other particulars of the Presidency College Magazine:—

1. Place of publication	..	Calcutta.
2. Periodicity of publication	..	Yearly.
3. Printer's Name	..	Principal, Presidency College.
Nationality	..	Indian.
Address	..	86|1, College Street, Calcutta-12.
4. Publisher's Name	..	Principal, Presidency College.
Nationality	..	Indian.
Address	..	86|1, College Street, Calcutta-12.
5. Editor's Name	..	Shri Gautam Chakravartty.
Nationality	..	Indian.
Address	..	25|A, South End Park, Calcutta-29.
6. Names and Addresses of the individuals who own the newspaper or publication	..	Presidency College.

I, Gautam Chakravartty, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/. GAUTAM CHAKRAVARTY,
Editor,
Presidency College Magazine.

The magazine is printed and published in the official capacity of the Principal. The name of the present Principal is Dr. Sanat Kumar Basu.

Secretaries :

1914-15	Jogesh Chandra Chakravarti, B.A.
1915-17	Prafulla Kumar Sircar, B.A.
1917-18	Rama Prasad Mukhopadhyay, B.A.
1918-19	Mahmood Hasan, B.A.
1919-20	Paran Chandra Gangooli, B.A.
1920-21	Syama Prasad Mookerjee
1921-22	Bimal Kumar Bhattacharyya
1921-22	Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Akshay Kumar Sircar
1923-24	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Bijoy Lal Lahiri
1926-27	Lokes Chandra Guha Roy
1927-28	Sunit Kumar Indra
1928-29	Syed Mahbub Murshed
1929-31	Ajit Nath Roy
1931-33	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Provat Kumar Sircar
1936-37	Arun Kumar Chandra
1937-38	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Abu Sayeed Chowdhury
1939-40	Bimal Chandra Datta, B.A.
1940-41	Prabhat Prasun Modak, B.A.
1941-42	Golam Karim
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1946-47	Jibanlal Dev
1947-48	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Sourindramohan Chakravarty
1950-51	Manas Mukutmani
1951-52	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Jyotirmoy Pal Chaudhury
1953-54	Pradip Kumar Das
1954-55	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Devendra Nath Bannerjee
1956-57	Subal Das Gupta
1957-58	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Rupendu Majumdar
1960-61	Ashim Chatterjee
1961-62	Ajoy Kumar Banerjee

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors:

1914-15	Pramatha Nath Banerjee, B.A.
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta, B.A.
1917-18	Saroj Kumar Das, B.A.
1918-19	Amiya Kumar Sen, B.A.
1919-20	Mahmood Hasan, B.A.
1920-21	Phiroze E. Dastoor, B.A.
1921-22	Syama Prasad Mookerjee, B.A.
1921-22	Brajakanta Guha, B.A.
1922-23	Uma Prasad Mookerjee
1923-25	Subodh Chandra Sen Gupta, B.A.
1925-26	Asit Krishna Mukherjee, B.A.
1926-27	Humayun Z. A. Kabir, B.A.
1927-28	Hirendra Nath Mukherjee, B.A.
1928-29	Sunit Kumar Indra, B.A.
1929-30	Taraknath Sen, B.A.
1930-31	Bhabatosh Dutta, B.A.
1931-32	Ajit Nath Roy, B.A.
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar, B.A.
1933-34	Nikhilnath Chakravarty, B.A.
1934-35	Ardhendu Baksi, B.A.
1935-36	Kalidas Lahiri, B.A.
1936-37	Asok Mitra, B.A.
1937-38	Bimal Chandra Sinha, B.A.
1938-39	Pratap Chandra Sen, B.A.
1938-39	Nirmal Chandra Sen Gupta, B.A.
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin, B.A.
1940-41	Manilal Banerjee, B.A.
1941-42	Arun Banerjee, B.A.
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1947-48	Sudhindranath Gupta, B.A.
1948-49	Subir Kumar Sen, B.A.
1949-50	Dilip Kumar Kar, B.A.
1950-51	Kamal Kumar Ghatak, B.A.
1951-52	Sipra Sarkar, B.A.
1952-53	Arun Kumar Das Gupta, B.A.
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta, B.A.
1954-55	Sukhamoy Chakravarty, B.A.
1955-56	Amiya Kumar Sen, B.A.
1956-57	Asoke Kumar Chatterjee, B.A.
1957-58	Asoke Sanjay Guha, B.A.
1958-59	Ketaki Kushari, B.A.
1959-60	Gayatri Chakravorty, B.A.
1960-61	Tapan Kumar Chakrabarti, B.A.
1961-62	Gautam Chakravartty, B.A.

নাভানা—কলিকাতা